# ভাসানবাড়ি

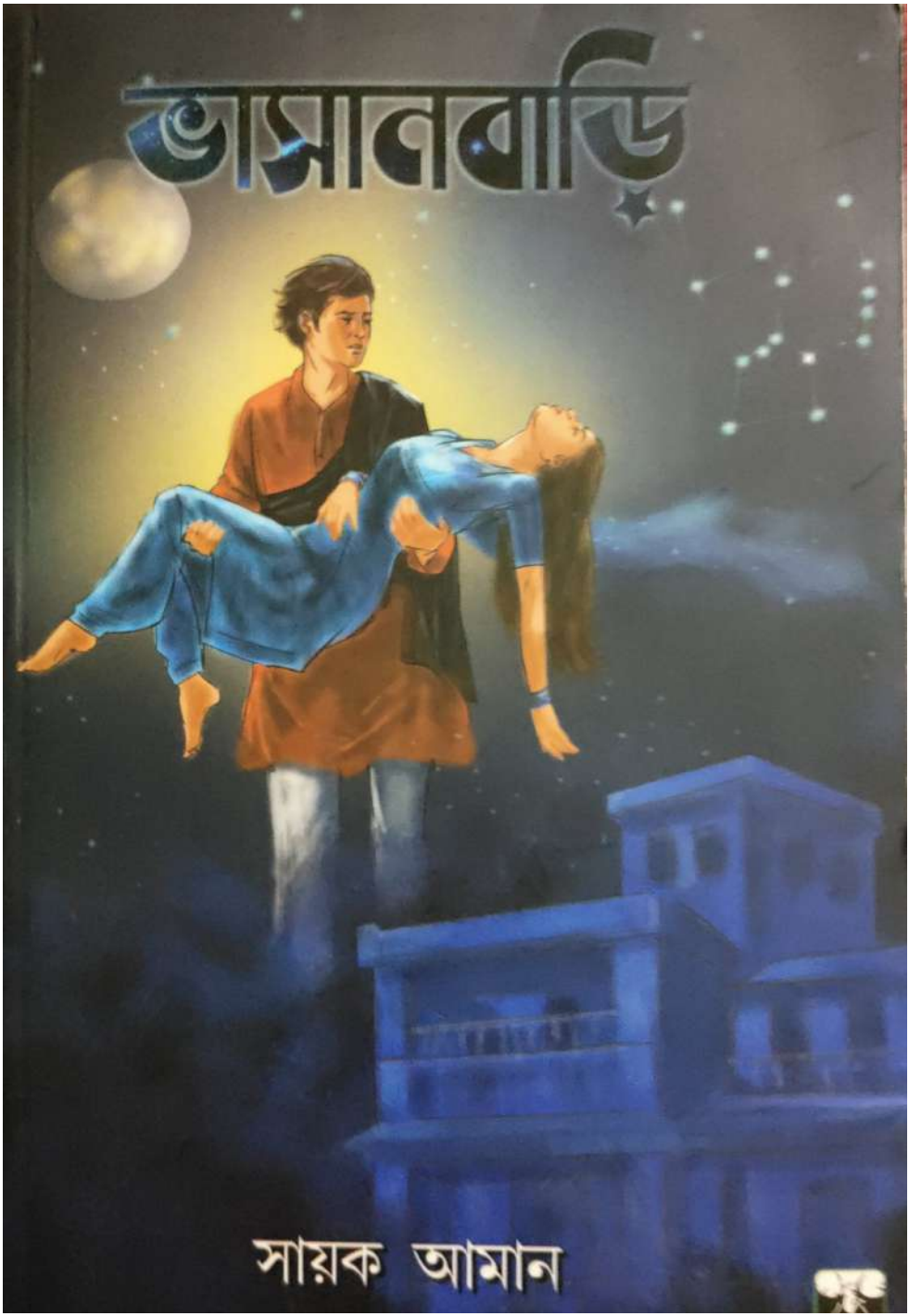

সায়ক আমান

# ভূমিকা

শুনুন, চুপি চুপি একটা কথা বলছি। কাটতি বাড়াতে এই বইটাকে আমরা সাইন্স ফিকশান থ্রিলার-টিলার কিছু একটা বলে চালানোর চেষ্টা করব। আপনি কান দেবেন না। ভাসানবাড়ি আদ্যপান্ত প্রেমের গল্প। তবে প্রেম তো-ত্রিকোণ, সরলরেখা, বিন্দু নানা রকমের হয়। এই বইতে যে প্রেমের কথা বলা আছে তা আসলে বৃত্তাকার। অতয়েব বৃত্তের ঠাঁটবাট, রুচিমর্জি না জানলে প্রেমটা ঠিক খোলসা হবে না। তাই সাইন্সের অবতারণা।

তবে চটকদার বিজ্ঞাপন, বাহারি প্রচ্ছদ কিংবা লেখকের নাম দেখে বইটা যদি একান্ত কিনেই ফেলেন তাহলেও দেওয়ালে মাথা কুটবেন না প্লিজ। বাজারচলতি চিপসের প্যাকেটে যেমন চিপস থাকে তেমন এ বইতে রহস্য-টহস্য খানিক আছে, কিন্তু ওটা কেবলমাত্র আপনাকে অন্য একটা গল্প শোনানোর অছিলা। ভিতরের সেই গল্পটা আসলে বিসর্জনের।

এবার এই বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে একটু মনে করুন, শেষ যে মানুষটাকে ভাসান দিয়ে এসেছেন আপনি... অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সবটুকু দিয়েও ধরে রাখতে পারেননি তাকে, কোনও নদীর ঘাটে, রেলস্টেশানে, চেনা রাস্তার কিংবা ইলেকট্রিক চুল্লিতে রেখে চলে আসতে হয়েছে... জলে ফেলে দেওয়া প্রতিমার মতো তারাও সময়রেখা বেয়ে চলে গেছে দিগন্তের দিকে। তারপর আর অপেক্ষা করেননি তার জন্য। ভেবেছেন, আর কিছু তো নেই...

আছে কী নেই বিশ্বাস করুন, আমিও জানি না। তবে এই পৃথিবীর মানুষদের কারও কারও বুকের ভিতরে নিশ্চয়ই একটা ভাসানবাড়ি আছে। এমন একটা বাড়ি যেখানে বছরের পর বছর ভাঙা দালান, শুকনো পাতার ছেয়ে যাওয়া ছাদ আর ঝুলন্ত কড়িকাঠের পাঁজরে কেউ অপেক্ষা করতে থাকে আপনার জন্য। অন্ততকাল ধরে...

'আরিন টু' লেখার জন্য প্রকাশক ও পাঠক যা চাপ দিচ্ছেন তেমন চাপ জয়েন্টের আগে দিলে এতদিনে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলত। তার ফাঁক গলে এমন একটা কিছু নামাতে পেরেছি বলে নিজের একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য। বিভা প্রকাশনাকেও ধন্যবাদ। উত্তরপত্রে 'মঙ্গলগ্রহের বিবরণ নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত' লেখা ছেলেও নয় নয় করে তিনটে নভেল হাঁকিয়ে দিল।

মিডনাইট হরর স্টেশানের লক্ষাধিক শ্রোতা, এ বই পড়ুন ছাই না পড়ুন, আপনাদের জন্য রইল আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

ভাসানবাড়ি আপাতত ফাঁকা, আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গেছে সমস্তটা, ক'দিন পরেই হয়তো ভাঙা পড়বে। তাও এর পোড়া দেওয়ালে কান রাখলে গল্প শুনতে পাবেন। অশ্বিনী আর হৈমন্তীর গল্প... সময়ের গল্প...

...শুনে নিন। আমি দরজা খোলা রেখে গেলাম।

সায়ক আমান

কলকাতা

পয়লা জানুয়ারি, ২০২০

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar

# প্রথম অধ্যায়

— "দাদা, পাষাণবাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন?"

গুমটি দোকানের ভেতর থেকে আধুনিক বাংলা গানের সুর ভেসে আসছিল। আধুনিক বলতে অতিআধুনিক, শুনতে না চাওয়া হৈমন্তীর কানের পর্দায় শিরিষ কাগজ ঘষে দিয়ে গেল সেই সুর। ভেতর থেকে প্রায় ডিমের আকৃতির মতো মাথা এবং সিদ্ধ ডিমের কুসুম রঙের চামড়ার একটা লোক বেরিয়ে এল, — "কোন বাড়ি বললেন?"

হৈমন্তীর দুটো হাতে সুটকেস, চশমাটা খানিক আগেই নাক বরাবর অনেকটা নেমে এসেছে। এখন সে খেয়াল করল ট্রেনের ঠেলাঠেলিতে শার্টের উপরের দিকের একটা বোতাম খুলে গেছে। কুসুমের দুটো খুদে চোখ এখন সেখানে পছন্দমতো কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে,

— "পাষাণ বাড়ি। ওই নামে একটা বাড়ি আছে এখানে..."

— "তাই নাকি! কই, আমি তো শুনিনি।"

হৈমন্তী আর কিছু না বলে এগোতে যাচ্ছিল। এইসময় গুমটি দোকানের ভেতর থেকে আর একটা গলা ভেসে আসে, "পাষাণ না ভাসান? ভালো করে জেনে আসুন। ভাসানবাড়ি বলে একটা বাড়ি আছে, তবে সেখানে লোকজন আসে বলে তো শুনিনি... আপনি হঠাৎ..."

— "হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাসানই হবে, আসলে আমার চশমাটা..."

বিকেল হয়ে এসেছে। দুপুরের আলোর মুখে বার্ধক্য কাঁচা হলুদের রং টেনেছে। কনে দেখা আলো ভারী হিসেবি। কখন আসে আর কখন শেষ হয়ে যায় বোঝাই যায় না। হৈমন্তীর বাইফোকাল লেন্সের বেশিরভাগটাই চোখের আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। ফলে চিরকুটে লেখা ঠিকানাটা ভালো করে

দেখতে পায়নি সে। দুটো স্যুটকেস মাটির উপর নামিয়ে রেখে জামার বোতামটা আটকে, চশমাটা সিংহাসনে ফিরিয়ে আনে সে।

— "ভাসানবাড়ি কী করে যাব বলুন তো? ম্যাপে তো দেখছি না।" ফোনটা তুলে দেখায় হৈমন্তী।

— "কেন যাবেন?" আটকানো বোতামটার দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে ডিমের কুসুম দরজা থেকে সরে যায়। দরজা ফাঁক হয়ে পুরোটা খুলে যায়। একটা মাঝবয়সী লোক উৎসুক মুখ বাড়িয়ে দেন সেখান থেকে, "হঠাৎ ওখানে যাবেন যে, খবরের কাগজ থেকে নাকি?"

— "আগে না আমি একটু লেখালেখি করি..."

— "অঃ! ভাসানবাড়ি নিয়ে গল্প লিখতে এসেছেন? আগেও কতজন এল, তবে গল্প-টল্প তেমন লিখতে পেরেছে বলে তো মনে হয় না।" লোকটার গলায় আক্ষেপ না ব্যঙ্গ তা ঠিক বোঝা গেল না।

— "আমি গল্প লিখতে আসিনি, একটা নন ফিকশন..." বাকি কথাটা শেষ করে না সে, "বাকিরা লিখতে পারেনি কেন?"

— "লেখার মতো আর কী আছে?" চকচক করে জিভে বিরক্তিকর একটা শব্দ করে লোকটা, "আছে তো একটা আক্কুরে কেয়ারটেকার, ও বাড়ির ইতিহাসের সে না জানে আগা না জানে মুড়ো। কেবল একাকুম্ভ হয়ে গোঁ ধরে বসে আছে। বাড়ি বেচতে দেবে না, তার উপরে লোকটা সুবিধের নয় শুনেছি...

— "কক্!" করে একটা আওয়াজ করে কথার মাঝেই থেমে গেল লোকটা। হৈমন্তী বুঝল পেছন থেকে তাকে খোঁচা মেরেছে কেউ। প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে বলল, "তা আপনি একাই থাকবেন ওখানে?"

— "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

— "কতদিন?"

— "এই ধরুন সপ্তাদুয়েক।"

— "তা বিয়ে করেছেন?"

একটু গলা খাঁকারি দেয় হৈমন্তী। লোকটা অনর্থক কৌতূহল দেখাতে শুরু

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



করেছে।

— "না, কেন বলুন তো? আপনি করেননি?"

লোকটা প্রশ্নটা গায়ে মাখে না, চোখের কৌতূহল মেটেনি যখন মনের কৌতূহলটাই এগিয়ে ধরে সে, "মেয়েছেলে... একা একা থাকবেন এখানে!"

একজন কেয়ারটেকার ও একটি সুন্দরী মেয়ে এক নির্জন বাড়িতে থাকবে ভেবেই হয়তো লোকটার কল্পনার ডানায় ঝড় ওঠে। হৈমন্তী বলে, "একটা ছেলে দেখে দিন, বিয়ে করে নেব না হয়। আপাতত ডিরেকশন'টা দিন প্লিজ।"

কিছু যেন বিড়বিড় করে লোকটা। বোধহয় নারীজাতির অধঃপতনে মর্মাহত হল। হাত তুলে সামনে ফাঁকা রাস্তা দেখিয়ে দেয়, "সিধে গেলে একটা ভাঙা কালিমন্দির পড়বে, সেখান থেকে ডান দিকে একটু হেঁটে যে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন একনাথের ঝিল কোথায়? ঝিলটা পেরোতে অবশ্য বোট লাগবে। ঝিলের ওপারেই ভাসানবাড়ি।"

আর কোনও কথা না বলে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে হৈমন্তী, কনুইয়ের কাছ থেকে শার্টের হাতাটা গুটিয়ে উপরে তুলে নেয়। তার মিস্টিক ডেভিল ট্যাটুটা বেরিয়ে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে আরেকবার থতমত খায় লোকটা।

হৈমন্তী এবার ফোনটা বের করে অস্মিতার নম্বরটা ডায়াল করে।

— "হ্যাঁরে পৌঁছে গেছিস?"

— "যাইনি, তবে যাব। দুটো লোকের থেকে ডিরেকশন'টা নিলাম।"

— "কোন্ লোক?"

— "মিস্টার পার্ভার্ট আর মিস্টার মিসোজিনিস্ট।"

— "ওয়েলকাম টু বিরাজপুর। ওখানে ওই দুটো ক্যাটাগরির লোকই আছে।

— "তুই সব বলে রেখেছিস তো?"

— "বলার কী আছে আবার? চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। নিবারণ কাকা একটু অর্থোডক্স টাইপের। মোবাইল ফোন-টোন ইউজ করতে চায় না।"

— "নিবারণ কেয়ারটেকার? লোকটা শুনছিলাম নাকি কোট-আনকোট 'সুবিধের নয়'।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "অসুবিধের কী আছে? একটু উইয়ার্ড বটে। বাড়িটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ছোটবেলায় আমি যতবারই ও বাড়িতে গেছি নিবারণকাকাই আদর-আপ্যায়ন করেছে।"

— "আদর! কী রকম আদর?"

— "আঃ! সবকিছুই নোংরা অ্যাঙ্গেলে দেখিস কেন বলতো? স্নেহ করতেন বলতে চেয়েছি।"

— "অ্যাঙ্গেলের আর দোষ কী বল? তুই বললি দু'রকম ক্যাটাগরির লোক থাকে এখানে..."

ওপাশ থেকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল অস্মিতা। ঘরঘর করে শব্দ হয়। কান থেকে ফোন সরিয়ে হৈমন্তী দেখে ফোন কেটে গেছে।

হৈমন্তী ঘোষের বয়স তিরিশের আশেপাশে। পাতলা, ছিপছিপে চেহারা। দেখতে একেবারেই প্রথাগত বাঙালি মেয়েদের মতো নয়। বছর পাঁচেক আগে একবার বিয়ে করেছিল কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সে বিয়ে টেকেনি। কলেজ জীবনে ফিজিক্সের ছাত্রী ছিল, পরে জার্নালিজমে আগ্রহ জন্মায়। বিয়ে ভেঙে যেতে একটা গভর্মেন্ট স্পন্সরড হেরিটেজ রিসার্চ সোসাইটিতে যোগ দেয়।

পরের পাঁচবছরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সিঁড়ি ভেঙে বেশ খানিকটা উপরে পৌঁছেছে।

মাসখানেক আগে এক সোর্সের মাধ্যমে সোসাইটির অফিসে একটা চিঠি এসে পৌঁছায়। তাতে লেখা ছিল বিরাজপুর নামের একটা গ্রামে একটি ভগ্নপ্রায় হেরিটেজ বিল্ডিং আছে। প্রাইভেট ওনারশিপ। অন্তত দুশো বছরের পুরনো সেই বাড়ি, অথচ যত্নের অভাবে ভেঙে পড়ছে। বাড়ির উত্তরপুরুষদের বেশিরভাগই দেশছাড়া।

খোঁজখবর নিয়ে হৈমন্তী জানতে পারে যে এন্সেস্টারদের মধ্যে একটি মাত্র পরিবার কলকাতায় থাকে এবং সে পরিবারের একমাত্র মেয়ে অস্মিতা গোস্বামী থাকে কলকাতার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



অস্মিতা গোস্বামীর সঙ্গে গায়ে পড়ে যোগাযোগ করে নাথপরিবার সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারে হৈমন্তী। মেয়ে নাকি কচিবয়সে বার তিনেক গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল, তবে আপাতত সেখানে স্থানীয় এক কেয়ারটেকার ছাড়া আর কেউই থাকে না। অফিসে বসের কাছ থেকে কন্সেন্ট লেটার আদায় করে হৈমন্তী নিজেই ঠিক করে সেখানে গিয়ে নাথ পরিবারের ইতিহাস উদ্ধার করে আনবে। সেই নিয়ে একটু প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে। সেই সূত্রেই আজ দুপুরের দিকে এই গ্রামে এসে পৌঁছেছে সে।

ঝিলের কাছে এসে দাঁড়াতে মন'টা হালকা হয়ে যায় হৈমন্তীর। এমন স্বচ্ছ জলের ঝিল কলকাতার বুকে দেখা যায় না। টলটলে জলের উপরে ঝুঁকে পড়া গাছের কচি সবুজ পাতা ভেসে রয়েছে। তার তলা দিয়ে কুচোমাছ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। এখন বিকেলের আলো প্রায় ফুরিয়ে আসতে চলেছে, ডুবন্ত সূর্যের গৈরিক রঙ ঝিলের জলে যেন শরবৎ গুলে গেছে।

পুকুরের ধারে একটা ভেলা বাঁধা আছে। তার উপরে পা রেখে বাকি দেহ মাটির উপর দিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা গ্রাম্য লোক। পরণে কেবল একটা গামছা। পাশে একটা ছিপও যেন লোকটাকে নকল করেই ঘুমানোর ভান করছে। হৈমন্তী এগিয়ে গেল।

— "দাদা, দাদা শুনছেন?"

ধীরে ধীরে চোখ খুলল লোকটা। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে খানিকটা অবাক হল। সম্ভবত এমন শহুরে জামাকাপড় পরে বড় একটা কেউ এদিকে আসে না। মুখের উপর হাত চালিয়ে লোকটা বলল, "পাঁচটাকা, রাজি তো উঠে পড়েন..."

— "দশটাকা দেব। আমাকে ভাসানবাড়ি দেখিয়ে দিতে হবে।"

— "ভাসানবাড়ি..." বিড়বিড় করে লোকটা। সম্ভবত কিছু একটা প্রশ্ন করতে চাইছিল, কিন্তু থেমে যায়। বৈঠা জলের ভেতর ডুবিয়ে দেয়, "আসেন।"

ভেলায় চড়ার অভ্যাস নেই হৈমন্তীর। কোনওরকমে জিনসটা গুটিয়ে উঠে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বসে। শক্ত হাতে দাঁড় বেয়ে জলের উপর বেশ কিছুদূর এগিয়ে যায় লোকটা। মিনিট দশেকের মধ্যেই ঝিলের উলটোদিকের পাড়ে এসে ধাক্কা খায় ভেলাটা। সেটা বেঁধে রেখে পাড়ে উঠে আসে লোকটা। পিছন পিছন হৈমন্তীও। মনে হয় লোকটা অনেকক্ষণ থেকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাইছে তাকে, কিন্তু সাহস করে উঠতে পারছে না। সে নিজেও আর কথা বাড়ায় না। সারাদিনের জার্নিতে শরীর ক্লান্ত হয়ে আছে। বাড়িতে পৌঁছেই একটা বড়সড় ঘুম দরকার।

খানিকটা হেঁটে আসতেই ভাসানবাড়ি চোখে পড়ে হৈমন্তীর। বাড়িটা তেমন বড় নয়। দোতলা। তবে দু'পাশে বেশ খানিকটা ছড়ান। একেবারে মাথায় ছাদের উপরে একটা ত্রিশূল, আর তার গায়ে লাল রঙের পতাকা ঝুলছে। তার নিচে খানিকটা অংশ ইট সিমেন্টের চাদর ফাটিয়ে উঁকি দিচ্ছে বাতাসে।

বাড়ির চারপাশ জুড়ে পোর্টিকোর মতো বারান্দা করা আছে। বারান্দার রেলিং-এর কয়েকটা গারদ উধাও। একতলার সামনে একটা ছোট বাগিচা, তাতে টব করে কিছু ফুল গাছ চাষ করা হয়েছিল। এখন তারা মরে গেছে। বোঝা যায় বয়সের কারণেই আগের মতো দেখাশোনা করতে পারে না নিবারণ।

টাকাটা হাতে নিয়ে চলে গেল লোকটা। হৈমন্তী স্যুটকেসগুলো মাটিতে রেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ফাঁকা খয়েরি রঙ লাগা ঝুল বারান্দাটার দিকে। বাড়িটা পুরনো তাতে সন্দেহ নেই।

বড়বাড়িতে মানুষ কম থাকলে কেমন একটা বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে বাড়িময়। ভাসানবাড়িও যেন সেই বিষণ্ণতার অন্ধকারে ঢেকে আছে। হৈমন্তী মনে মনে ভাবে এই বাড়ির দোতলায় একটা পুরনো তাঁতের শাড়ি, একটা ছিটকাপড়ের ফুল প্যান্ট যদি শুকাতো তাহলে এই ভাঙা বাড়িটাকেও এত থমথমে দেখাতো না।

পা চালিয়ে আরও কাছে এগিয়ে এল সে। বাগানের সামনে একটা ছোট দরজা করা আছে। তাতে আপাতত তালা ঝুলছে না। ভিতরে ঢুকে সে বাগানের মাঝখান টায় এসে দাঁড়াল। গলা তুলে দোতালার বারান্দাটার দিকে চেয়ে কয়েকবার ডাকাডাকি করল, "কেউ শুনছেন? নিবারণ বাবু..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বারতিনেক ডাকাডাকি করার পর হৈমন্তীর মনে হল ছাদের দিকে কার যেন ছায়া পড়েছে। একটু পিছিয়ে এসে মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করল সে, আর সঙ্গে সঙ্গে গা'টা শিউরে উঠল তার। পিছিয়ে আসার সময় পিছনে কী আছে দেখেনি, অবশ্যও একটু আগেই কিছু ছিল না। তাই দেখার দরকারও পড়েনি। এখন শক্ত কিছুর ছোঁয়া লাগল তার পিঠে। বুক? একটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তার ঠিক পিছনে।

ঘুরে তাকিয়ে আগন্তুককে দেখতে পেল হৈমন্তী। তারপর অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক।

— "বাবা নেই, আমি শুনছি। বলুন কী বলবেন?"

— "আ... আমি হৈমন্তী ঘোষ... আজ আসার কথা..."

ছেলেটার মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে, "আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আসুন আমার সঙ্গে..."

গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলে নিয়ে ঘরের ভিতরের দিকে পা বাড়াল সে। হৈমন্তী খানিক থতমত খেয়ে তাকে অনুসরণ করে।

বয়সে ছেলেটা তার থেকে বছর দুয়েকের ছোটই হবে। তবে লম্বায় ফুটখানেক বেশি। মাংসল চেহারার। একটা কালচে সবুজ কাশ্মীরি শাল আর পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আছে সে। কাটা কাটা মুখ। দীর্ঘ সময় ধরে কম্পিত হতে থাকা তানপুরার তারের মতো গম্ভীর অথচ সুরেলা গলা।

— "আপনার নামটা তো ঠিক..."

— "অশ্বিনী। নিবারণবাবু আমার বাবা হন।" হৈমন্তীর দিকে না তাকিয়েই বলল ছেলেটা।

— "উনি কি গেছেন কোথাও?"

— "বাবা একটু অসুস্থ, বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না ক'দিন।"

— "এ বাবা! কী হয়েছে ওনার?"

— "পক্ষাঘাত, সম্ভবত বাঁচবেন না বেশিদিন।"

হৈমন্তী থমকায়। ছেলেটার গলার স্বরে ভাবলেশের কোনও চিহ্ন নেই।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বাপের সঙ্গে কি সম্পর্ক ভালো নয় ছেলেটার?

এতক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করেছে দু'জনে। অশ্বিনী এর মধ্যে একবারও ফিরে তাকায়নি ওর দিকে। বারদুয়েক কাঁধ থেকে সরে আসা শালটা ঠিক করেছে শুধু।

— "তিনতলার একটা ঘর বাবা আপনার জন্য পরিষ্কার করে রেখেছে, এতদিন ও ঘরে যিনি থাকতেন তিনি কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে চাইছিলেন না। অগত্যা বাসিন্দাটিকে কাল সকালেই বাগানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হল।"

হৈমন্তীর বুক কেঁপে ওঠে, "কী বলছেন এসব! কে থাকত ওখানে?"

— "একটা সাপ। চন্দ্রবোড়া, বাবা পুড়িয়ে ফেলেছে।"

হৈমন্তী আর কিছু উত্তর দিতে পারল না। তেতলার সিঁড়ি পেরিয়ে প্যাসেজের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জনে। অশ্বিনী ডানদিকটা দেখিয়ে বলল, "ওপাশের বারান্দার রেলিং নেই। ন্যাড়া হয়ে আছে। যাবেন না, আপনার ঘরটা বাঁদিকে... আসুন।"

— "এই বাড়িটার নাম এমন অদ্ভুত কেন বলুন তো?"

— "কেমন?"

— "এই যে ভাসানবাড়ি।"

— "হুম।" ছেলেটা যেন আগে থেকেই জানত প্রশ্নটা করবে হৈমন্তী,

— "জানেন নিশ্চয়, আজ থেকে দু'শো বছর আগে এ বাড়ি তৈরি হয়। তার আগে একটা পুকুর ছিল এখানে। গোটা গ্রামের লোক ঠাকুর বিসর্জন দিত সেখানে। সেটাকে বলা হত ভাসানপুকুর, সেখান থেকে ভাসানবাড়ি। আসুন..."

ঘরের দরজা খুলে ভিতরের দিকে হাত দেখিয়ে ইশারা করল অশ্বিনী। হৈমন্তী ঢুকে এল ভিতরে।

— "কিছু যদি মনে না করেন..." একটু ইতস্তত করল হৈমন্তী, "আপনার ফোন'টা একটু ব্যবহার করতে পারি? আমারটা আসলে নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না।"

— "আমার কাছে নেই। ফোন আমি ব্যবহার করি না।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হৈমন্তী এসে থেকে লক্ষ্য করছে অশ্বিনীর বয়সের তুলনায় তার আচার আচরণ বেশ গম্ভীর গোছের। পাট করে আঁচড়ানো মাথার চুল। একটা চুলেরও যেন সিঁথির এপাশ থেকে ওপাশে হেলে পড়ার অনুমতি নেই। ওজন করে কথা বলে। মুখের উপরে যে অভিব্যক্তি খেলে সেগুলোও যেন আগে থেকে যেন নিখুঁতভাবে মাপা হয়ে আছে।

— "আপনি আপাতত বিশ্রাম করুন, আমি একটু পরে এসে..."

— "তুমি হয়তো আমার থেকে অল্প ছোট হবে, আপনি বলার দরকার নেই, কেমন?" সহজ গলায় কথাগুলো বলল হৈমন্তী।

অশ্বিনী ঘাড় নেড়ে নিচে নেমে গেল। হৈমন্তী ঘরের একদিকে জানলার কাছে সরে এসে নেটওয়ার্ক আনার চেষ্টা করল। লাভ হল না কিছু।

— 'পৌঁছে গেছি, নিবারণবাবু ইজ সিক, ওনার ছেলে আছে এখানে, এভ্রিথিং ইজ রাইট টিল নাও'— মেসেজটা টাইপ করে অস্মিতার নম্বরে ওয়াটস্যাপ করে রাখল। নেটওয়ার্ক এলে যাতে নিজে থেকেই ডেলিভারড হয়ে যায়। আর একটা মেসেজ টাইপ করল, 'জিনিসটা যদি কোথাও থেকে থাকে তো সেটা এ বাড়িতেই, কিছু জানতে পারলেই জানাব আপনাকে...'।

জানলার ধারে ফোন'টা রেখে ঘরের দিকে তাকাল হৈমন্তী। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে পাল্লা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

একদিকের দেওয়ালে একটা বড় আয়না ঝোলানো। সম্ভবত ক'দিন আগেই এনে রাখা হয়েছে সেটা। তবে অযত্নে আয়নার উপর জমা সরু ধুলোর পরত সরানো হয়নি। সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চুলের ক্লিপটা খুলে ফেলল হৈমন্তী, তারপর শার্টটা। হাতের আলগা স্পর্শে সরিয়ে ফেলল ধুলোর আস্তরণ। আয়না জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার ফর্সা নরম চামড়ার উপরে গোটা তিরিশেক কালশিটের দাগ। বুক, পেট, কোমর চিরে চলে গেছে তারা। মুণ্ড, ধড় আর পা ছাড়াও আরও অনেক ভাগে ভাগ করেছে হৈমন্তীর শরীরটাকে। দাগগুলোর উপরে আঙুল বোলাল সে। একটানা বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল নিজের মুখের দিকে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে একটা চাদর টেনে শুয়ে পড়ল বিছানায়। শিরদাঁড়া, কোমর আর হাঁটু দুটো অবশ হয়ে পড়ছে। দু'চোখ জুড়ে ক্লান্তির ঘুম নামল তার।

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুমটা। মিহি একটা যান্ত্রিক শব্দ কোথাও থেকে এল মনে হল। বিছানার উপরে উঠে বসে আগে হাতঘড়ির দিকে তাকাল হৈমন্তী। ওই একটা জিনিস সে কিছুতেই শরীর থেকে আলাদা হতে দেয় না, কেবলমাত্র স্নানের সময়টুকু ছাড়া। রাত সাড়ে দশটা বাজে। হৈমন্তীর মনে হল তার খিদে পেয়ে গেছে।

যান্ত্রিক শব্দটা মোবাইলের। একটা মেসেজ এসেছে তাতে। ফোন'টা হাতে নিয়ে দেখে কয়েক মিনিটের জন্যে নেটওয়ার্ক এসেই চলে গেছে। তার মধ্যেই অস্মিতার রিপ্লাই ঢুকেছে— 'হুম, নিবারণকাকার একটা ছেলে ছিল বটে, নামটা মনে পড়ছে না। কিছু অসুবিধা হলে জানাস কিন্তু।'

ফোন'টা আবার জানলাতেই রেখে আলো জ্বেলে স্যুটকেশ থেকে জিনিসপত্র বের করে ঘরের ভিতরে সাজিয়ে নেয় সে। আলনাটা গোছানো জামাকাপড়ে ভরে ওঠে। তার মধ্যে থেকে কলারওয়ালা একটা গেঞ্জি টেনে নেয়। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে নিচে নেমে আসে।

হৈমন্তীর ঘর ছাড়া বাকি দোতলাটা অন্ধকারে ঢেকে ছিল। বোঝা যায় কেউ নেই সেখানে। একতলায় নামতেই ছোটো একটা দালান। তার চারপাশ জুড়ে মোট আটটা ঘর। সিঁড়িটা যেখানে এসে শেষ হচ্ছে তার ঠিক উলটোদিকে একটা ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। সেদিকে এগিয়ে গেল হৈমন্তী। ঘরটা ফাঁকা, তবে সেটা পেরিয়ে ভিতরে আর একটা ছোট ঘর আছে। সেখান থেকে আর একটা হালকা আলো ভেসে আসছে। সেদিকে এগিয়ে যায় হৈমন্তী। এবং দরজার সামনে'টায় গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

ঘরের একেবারে মাঝখানে একটা চেয়ার পেতে বসে আছে অশ্বিনী। তার ঠিক উলটোদিকে একটা বড় আয়না। সেটার দিকে তাকিয়ে আছে একমনে। হাতের আঙুল নড়ছে না কোনও, শরীরে কোনও স্পন্দন নেই যেন, পাথরের

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



মতো নিশ্চল হয়ে কিছু দেখছে আয়নায়।

পিছন থেকে তার মুখ দেখতে পায় না হৈমন্তী। প্রায় মিনিট পাঁচেক ঠায় অপেক্ষা করে সে। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো!

— "গুড ইভনিং..." গলায় উচ্ছ্বাস এনে কথাটা বলে ভিতরে ঢুকে আসে হৈমন্তী। চমকে উঠে দাঁড়ায় অশ্বিনী। হৈমন্তীর দিকে ফিরতেই তার মুখে কয়েকটা লজ্জার রেখা খেলে যায়, "ওঃ, আপনি..."

— "হ্যাঁ আমি, কেন? একতলায় আসা বারণ নাকি?"

— "না না..." ছেলেটা হেসে ওঠে, "কোথাও যাওয়া বারণ না।"

— "তাহলে রান্নাঘরটা দেখিয়ে দিন প্লিজ, খিদেয় আর পারা যাচ্ছে না।"

ছেলেটা আরও লজ্জিত হয়ে ওঠে, "এঃ, খুব রাত হয়ে গেছে, তাই না? আসলে এখানে একা থাকি তো, সময়ের হিসেব থাকে না। আমি রান্না করেই রেখেছি, একটু দাঁড়ান।"

কথাটা বলে একগাল হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অশ্বিনী। হৈমন্তী লক্ষ করে ছেলেটার হাসিটা ভারী সুন্দর। দুটো গজদাঁত আছে তার। হাসলে দাঁতের ঠিক উপরে একটা পাতলা চামড়া দেখা যায়। তাতে আরও শিশুসুলভ হয়ে ওঠে হাসিটা।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় হৈমন্তী। এতক্ষণ একমনে কী দেখছিল ছেলেটা? ঘরের যে জায়গায় চেয়ারটা রাখা আছে সেখান থেকে আয়নায় তাকালে, নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু তো দেখতে পাওয়ার কথা নয়। মিনিট দশেক ধরে নিজের দিকেই তাকিয়েছিল? কিন্তু কেন?

হৈমন্তীর মনে হয় ছেলেটার মধ্যে কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে। নাকি এই বাড়িটাই এমন গোলমেলে? হতেই পারে, শ'দুয়েক বছর ধরে এত বড় একটা বাড়ি নিঃসঙ্গতায় খাঁ-খাঁ করছে। একসময় হয়তো বাড়িভর্তি মানুষের হাঁকডাক শোনা যেত, এখন একটি মাত্র আক্কুরে কেয়ারটেকার ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

পাষাণ বাড়ি?

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# দ্বিতীয় অধ্যায়

— "রোল নম্বর টোয়েন্টি সিক্স?" নামের পাশে 'এ' লিখে পরের রোলটা কল করতে যাচ্ছিল স্নিগ্ধা—থেমে গেল। মুখ তুলে ক্লাসের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "ফার্স্ট পিরিয়ডে প্রেসেন্ট আর টিফিনের পরে অ্যাবসেন্ট? স্কুলে পড়তে পড়তে ক্লাস বাঙ্ক করতে শিখেছে? হৈম..."

মুখটা খোঁজার চেষ্টা করল স্নিগ্ধা। ক্লাসে হৈম নেই। মেয়েটার চেহারা ছোটখাটো বলে মুখের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় অনেক সময়। কিন্তু আজ তার সামনের বেঞ্চে বসার কথা। মেয়েটার ব্যাগটা অবধি রাখা আছে বেঞ্চের উপরে। গেল কোথায়?

— "ও মাঠ থেকে ফেরেনি ম্যাম..." ফাঁকা বেঞ্চটার ঠিক পাশে বসা ছাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে কথাটা।

— "ফেরেনি মানে? কোথায় গেছে...?"

— "ওর শরীর খারাপ লাগছিল খেলতে খেলতে, শুয়ে পড়েছিল মাঠেই..."

স্নিগ্ধা ধমক দিয়ে ওঠে, "অসুস্থ মেয়েটাকে মাঠেই ফেলে চলে এলে?"

বাকি রোলকলটা না করেই ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসে স্নিগ্ধা। স্কুলের বাইরের দরজার কাছে দারোয়ান বসে খৈনি ডলছিল, দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে স্নিগ্ধা বলল, "গোপালদা একটু আমার সঙ্গে আসবেন? মাঠে যেতে হবে।"

খৈনি'টা লুকাতে দেরি হয়েছে গোপালের, থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাঠে! কেন দিদি?"

— "একটা মেয়ে খেলতে গিয়ে ফেরেনি..."

স্কুলের সামনের পিচের রাস্তাটা পার করে মাঠে এসে পড়ে দু'জনে। একটু আগের উড়ন্ত ধুলো এখন ঝিমিয়ে গেছে। তার উপরে দুপুরের রোদ চিক্‌চিক্

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



করছে। এতগুলো ছটফটে পায়ের দৌরাত্ম্যে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাঠটা।

— "ম্যাডাম, ওই যে..." মাঠের একদিকের প্রান্তে ছোট স্লিপ আছে, সেদিকে এগিয়ে যায় স্নিগ্ধা। বুকটা সিটিয়ে গেছে তার। স্লিপের ঠিক পা ঘেঁষে পড়ে আছে হৈম। দুটো হাত দু'দিকে ছড়ানো। চোখ দুটো বন্ধ। খেলতে খেলতে কি পড়ে গেছে তাহলে? চোট লেগেছে মাথায়?

— "হৈম, শুনছিস?" সজোরে তার শরীরে ঠেলা দেয় স্নিগ্ধা। কপালে হাত রাখে, ভুরু কুঁচকে যায় তার, "সাংঘাতিক জ্বর!" বিড়বিড় করে, "এত জ্বর নিয়ে মেয়েটা রোদের মধ্যে পড়ে আছে,..." হাঁটু আর ঘাড়ের কাছটা ধরে তাকে কোলে তুলতে যায় স্নিগ্ধা, পারে না, সতেরো বছরের মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করা সোজা নয়।

— "তুমি নিয়ে এসো ওকে... জলদি..."

প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে স্কুলে ফিরে আসে স্নিগ্ধা। ছোটখাটো হুলুস্থুলু পড়ে যায় গোটা স্কুল জুড়ে। একঝাঁক মেয়ে ক্লাসরুম ফেলে উঠে এসেছে দরজার কাছে। দু-একজন ক্লাসটিচার তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফেরানোর চেষ্টা করছেন।

ভিড়টাকে পাশ কাটিয়ে ক্লাসরুমের দিকে ফিরছিল স্নিগ্ধা। চোখে পড়ে ক্লাসরুমের ভিতরে বসে আছে পৌলমী। মাসকয়েক আগে অবধি হরিহর আত্মা ছিল দু'জন। হৈমন্তী মাঠে পড়ে আছে জানা সত্ত্বেও দেখতে যায়নি পৌলমী? ঝগড়া হয়েছে নাকি?

স্নিগ্ধা মেয়েটার কাছে এগিয়ে আসে, "ওর জ্বর হয়েছে তোকে বলেনি?"

— "না, ওর সঙ্গে আমার কথা নেই।"

— "কেন?"

— "ও বলতে চায় না। সব সময় দূরে দূরে থাকে, কিছু বলতে গেলেই ভীষণ রাগ করে, তাই আমিও আর কথা বলি না।"

স্নিগ্ধার খেয়াল হয় সত্যি মাসখানেক হল কারো সঙ্গে তেমন একটা মেশে না হৈম। চুপচাপ স্কুলে আসে, কোনওরকমে ক্লাসগুলো করে বাড়ি চলে যায়। বাড়িতে কি কোনও সমস্যা হয়েছে মেয়েটার?

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আবার পৌলমীর দিকে তাকায় স্নিগ্ধা, "ওর বাবা-মাকে চিনিস তুই?"

পৌলমী দু'পাশে মাথা মাথা নাড়ে, "না ম্যাম।"

— "বাবা-মার ব্যাপারে কিছু বলেনি তোকে?" কয়েক সেকেন্ড চুপ করে ভাবে স্নিগ্ধা। তারপর বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ে বলে, "আজকের মতো ক্লাস আর হবে বলে তো মনে হয় না। ক্লাসরুমেই থাক, হট্টগোলের মধ্যে যেতে হবে না তোকে।"

স্কুলের তরফ থেকে হেডমিস শেফালি দত্ত ফোন করে হৈমন্তীর বাবা-মাকে ডেকে পাঠালেন। আধঘণ্টার মধ্যে নিজেদের গাড়ি করেই স্কুলে এসে হাজির হলেন দু'জনে।

এতক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে হৈমন্তীর। সে শেফালি দত্তের ঘরেই একটা অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক চেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছে। মাঝে-মধ্যে ঘুরেফিরে তাকাচ্ছে ঘরের চারদিকে। কখনও চোখ রগড়াচ্ছে কিংবা আঙুল দিয়ে ডলছে নাকের ডগা। এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি সে। বাবা-মায়ের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল একবার। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

— "এভাবে জ্বর গায়ে স্কুলে পাঠিয়েছেন মেয়েকে! কিছু একটা হয়ে গেলে?" রাগত গলাতেই কথাগুলো বললেন শেফালি দত্ত।

মিসেস ঘোষ মিনমিন্ করলেন, "এ-মাসে অনেকগুলো কামাই হয়েছে। দুদিন হল জ্বরটা একটু কম, তাই ভাবলাম..."

— "ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

— "আজ্ঞে হ্যাঁ। ওষুধও খাচ্ছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না কিছুতেই। একটু করে কমছে আবার সন্ধের দিকে জ্বরটা বাড়ছে।"

— "এই ভাইরাল ফিভারটা খুব হচ্ছে আজকাল, বেয়াড়া অসুখ।"

— "এতদিন ধরে ভাইরাল ফিভার!" স্নিগ্ধা পাশ থেকে বলে ওঠে, "ডাক্তার আর সহপাঠীর বর্ণনায় কয়েকমাস হল কারও সঙ্গে মিশছে না ও।"

শিক্ষিকার গলা এবার খুব শুকনো, "শুধু জ্বর নয় ম্যাম, ওর চামড়াতেও কিছু একটা হয়েছে।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "তো ডার্মাটোলজিস্ট দেখান।" দত্ত মুখ নামিয়ে বললেন।

— "ঠিক কী হয়েছে বলুন তো?" স্নিগ্ধা ঘুরে বসে।

— "রাতে ঘুম হয় না ভালো করে। সারাক্ষণ বলে গলাব্যথা, মাথায় ব্যথা, রোজই প্রায় বার দুয়েক করে বমি হয়ে যাচ্ছে আর...", চামড়ার কথাটা বলতে গিয়েও একটু থেমে যান মিসেস ঘোষ। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে এগিয়ে আসেন মেয়ের দিকে, "চামড়ার উপর লালচে স্পট পড়ছে, প্রথমে লাল তিলের মতো দেখাচ্ছে, পরে কালশিটের মতো কালো হয়ে যাচ্ছে, এই যে..." মেয়ের পিঠের দিক থেকে জামাটা কিছুটা উপরে তুলে ধরেন মহিলা। ফর্সা মসৃণ চামড়ার কিছুটা অংশ দেখা যায়।

সিট থেকে উঠে হৈমন্তীর চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ায় স্নিগ্ধা। একবার মৃদু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে হৈমন্তী। মিসেস ঘোষ কান দেন না।

স্নিগ্ধা দেখে মেয়েটার কোমরের উপরে লালচে কয়েকটা স্পটকে ঘিরে খাতার মার্জিনের মতো লাইন ফুটে উঠেছে। তার ঠিক মাঝখানগুলো সরু সুতোর মতো কালচে হয়ে গেছে।

— "কী করে হল এগুলো?"

হৈমন্তী উত্তর দেয় না। শুধু দু পাশে মাথা নাড়ে।

— "কেউ মারধর করেছে? বা কোনও পোকার কামড়?"

— "না।"

— "ব্যথা আছে?"

— "উঁহু।"

— "শুধু এখানে না, সারা শরীর জুড়ে আছে দাগগুলো।"

— "রাতে ঘুম হয় না, তাই না?" স্নিগ্ধা লক্ষ্য করেছে মেয়েটার চোখের তলায় কালি পড়েছে, কী মনে হতে সে বলে, "আপনারা একটা কাজ করুন। ডাক্তারটা মনে হয় চেঞ্জ করা দরকার। আমার এক বান্ধবী আছে। ডাক্তার সম্পূর্ণা ভট্টাচার্য। আমেরিকায় থাকে। সদ্য কলকাতায় এসে চেম্বার খুলেছে। আমি অ্যাপোয়েন্টমেন্ট করে দিচ্ছি, ওকে একবার দেখিয়ে নিন। দরকার হলে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আমি যাব সঙ্গে।"

— "আপনি কি কিছু সন্দেহ করছেন?"

স্নিগ্ধা মুখ নামিয়ে হাসে, "আমি সামান্য স্কুলে ফিজিক্স পড়াই, আমার সন্দেহে কী যায় আসে বলুন? তবে এভাবে কালশিটে দাগ ফেলে রাখা ভালো না।"

ঘরে উপস্থিত চারজন মানুষ আরো কিছু আলোচনা করতে থাকে। হৈমন্তী চোখ বুজে নেয়, চোখ দুটো ভারী হয়ে আসছে। একটা বমি-বমি ভাব পাক দিয়ে উঠছে পেটের ভিতর। থেকে-থেকে মনে হচ্ছে কেউ যেন দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়াল থেকে কান পেতে শুনছে ওদের কথা। ওর কোনও ক্লাসমেট কি?

মনে পড়ল ও যখন জ্বরের ঘোরে মাঠে শুয়ে পড়েছিল, তখনও কেউ যেন ওকে ঠেলা দিয়ে ডাকছিল। চাপাস্বরে ফিরে যেতে বলছিল স্কুলে। কষ্ট করে একবার চোখও খুলেছিল হৈমন্তী। কাউকে দেখতে পায়নি।

এরপর আবার ক'দিন স্কুলে এল না হৈমন্তী। স্নিগ্ধার সেই আমেরিকা ফেরত বান্ধবী ডাক্তার ভট্টাচার্য হৈমন্তীকে একবার দেখেই কিছু টেস্ট করতে দিয়েছিলেন। আজ তার রিপোর্ট আসার কথা। ঝামেলায় পড়ে কিছুদিন সেদিকে আর মাথা দিতে পারেনি স্নিগ্ধা। আজ তাড়াতাড়ি স্কুল শেষ হয়ে যেতে সে সরাসরি বাড়ি গেল না। একটা ক্যাব বুক করে ডালহৌসির মোড়ে এসে নামল। এখানেই চেম্বার খুলেছে সম্পূর্ণা। আসার সময় একটা ফোন করে নিয়েছিল, ফোনে কিছু খুলে বলেনি সে।

চেম্বারের ভিতরে ঢুকতেই ঘোষ দম্পতিকে দেখতে পেল স্নিগ্ধা। চোখে-মুখে উদ্বেগ।

— "ও কি ভিতরে আছে?"

— "আধঘণ্টা হয়ে গেল, কিছুই তো জানাচ্ছে না।" মিস্টার ঘোষের গলায় স্পষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ।

— "আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



সম্পূর্ণার চেম্বারের দরজায় টোকা দেয় স্নিগ্ধা, "আমি স্নিগ্ধা রে, বলছি ভিতরে আসব একবার?"

"চলে আয়।"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে আসে স্নিগ্ধা। ঘরের একপ্রান্তে বড় একটা টেবিলের দু পাশে দুটো মানুষ বসে আছে। প্রায় বছরছয়েক পরে দেখা হল দুই বান্ধবীর, কিন্তু একটুকরো হাসিও ফুটল না সম্পূর্ণার মুখে। একদৃষ্টে হৈমন্তীর মুখের দিকে চেয়ে আছে সে। ক্লাস টুয়েলভে পড়া মেয়েটার মুখ থম্‌থম্ করছে। একদলা অস্বস্তি গলা টিপে ধরে আছে তার। স্নিগ্ধা খেয়াল করল হৈমন্তীর দুটো হাতের আঙুলগুলো শক্ত করে জড়িয়ে আছে একে অপরকে। যেন প্রাণপণ চেষ্টা করে চেয়ারে বসিয়ে রেখেছে নিজেকে।

স্নিগ্ধাকে হৈমন্তীর পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল সম্পূর্ণা। বাক্য ব্যয় না করে সেখানে বসে পড়ল স্নিগ্ধা।

— "ওর মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?" পাথরের মতো কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণার।

— "হ্যাঁ। কিছু একটা জানিয়ে দে। দুশ্চিন্তায় আছেন।"

— "কী জানাবো সেটাই ভাবছি..."

কথাগুলো বলে আবার হৈমন্তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে, "ডু ইউ হ্যাভ আ বয়ফ্রেন্ড?"

হৈমন্তী দুপাশে মাথা নাড়ে, সজোরে।

— "কিংবা এমন কেউ যার সঙ্গে তুমি খুব ঘনিষ্ঠ..."

স্নিগ্ধা বুঝতে পারে হৈমন্তীর শরীর জুড়ে অস্বস্তির কারণ। সে একটু গলা খাকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন করছিস বলতো? কী হয়েছে ওর?"

আর.এন.এ টেস্টের রিপোর্টটা তার দিকে এগিয়ে দেয় সম্পূর্ণা। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কিছু মানে কিছু বুঝতে পারে না স্নিগ্ধা।

— "তোমার বাড়িতে কে কে আছে? আই মিন মা বাবা ছাড়া..."

— "আর তো কেউ নেই।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "কোনও আত্মীয়স্বজন? যারা ঘনঘন বা রেয়ারলি বাড়িতে আসে?"

আর কোনও উত্তর দেয় না হৈমন্তী। তার গালের দু'পাশ লাল হয়ে উঠেছে। এইঘরে নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভয় পাচ্ছে সে।

— "ঠিক আছে, তুমি এখন বাইরে যাও। মা-বাবাকে গিয়ে বলো চিন্তার কিছু নেই। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে কথা বলছি ওনাদের সঙ্গে। কেমন?"

প্রায় ঝড়ের মতো উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় হৈমন্তী।

স্নিগ্ধার দিকে ফেরে সম্পূর্ণা, "শী ইজ এইচ.আই.ভি পজিটিভ।"

— "মানে! এসব কী বলছিস তুই!" থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে স্নিগ্ধার শরীর।

— "ওর ঘাড়ের দাগগুলো দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। ভাইরাসটা একটিভ হয়নি এখনও, সম্ভবত কয়েক উইক আগে ইনফেক্টেড। আর.এন.এ টেস্ট একটু এক্সপেন্সিভ, কিন্তু একেবারে প্রাইমারি স্টেজে ধরা পড়ে।"

— "এইটুকু বয়সের একটা মেয়ে..."

— "বয়সটা ফ্যাক্টর নয়, ভাইরাসটা নানারকম ভাবে ঢুকতে পারে, বডিলি ফ্লুইডস বা সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স..."

— "ইন্টারকোর্স! আমাদের গার্লস স্কুল!"

— "বাড়ি বা প্রাইভেট টিউশন তো গার্লস না..." রিপোর্টের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে বলে সম্পূর্ণা, "তাছাড়া রিসেন্টলি কোনও ইঞ্জেকশান নিয়ে থাকলে আর সিরিঞ্জ ইনফেক্টেড থাকলে সেখান থেকেও হতে পারে।"

স্নিগ্ধার মাথা ঝিমঝিম করছিল, গোটা চেম্বারটা বন্‌বন্ করে ঘুরতে শুরু করেছে যেন। সামনে রাখা রিপোর্টের কাগজটায় লেখাগুলো গুলিয়ে গিয়ে হায়ারোগ্লিফিক্স-এর মতো দেখাচ্ছে।

— "আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না! এসব হল কী করে?"

একটু ইতস্তত করে সম্পূর্ণা, "আমি সাজেস্ট করছি না কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এসব ক্ষেত্রে ডোমেস্টিক রেপ ইনভল্‌ভড থাকে। ইন এনি কেস ওর বাবা-মাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার।"

— "সারাটা জীবন পড়ে আছে সামনে, এত স্টুডিয়াস একটা মেয়ে... তুই

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কী এক্সপেক্ট করছিস? তাও মোটামুটি কত বছর?"

— "ক্যান নট সে। ভাইরাস যতদিন না অ্যাকটিভ হচ্ছে কিছু বলা যায় না। এমনও হতে পারে বছর দশেক শরীরে বাসা বেঁধে সে বসে থাকল, কেউ বুঝতেও পারল না। আবার আজ বাড়ি ফিরেই একটিভ হয়ে যেতে পারে।"

হৈমন্তীর মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল স্নিগ্ধার। ভারী নরম, লাজুক স্বভাব মেয়েটার। একটু মুখচোরা গোছের, কিন্তু চোখ দুটো ভারী উজ্জ্বল।

— "আমার মনে হয় কথাটা ওকেও এখনই জানানো দরকার। আই মিন অলরেডি ওর যদি কোনও বয়ফ্রেন্ড থাকে... আর একটা মানুষের জীবন নিয়ে রিস্ক নেওয়াটা উচিত হবে না।"

— "হুম..."

— "আমি ওর বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলছি। তুই ওর সঙ্গে একটু কথা বল।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ে স্নিগ্ধা। পা দুটোয় জোর পাচ্ছে না অনেকক্ষণ থেকে। হেয়ারলাইন বরাবর একটা কনকনে হাওয়া যেন বরফের কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত। দুটো হাত দিয়ে মুখ মুছে নেয়। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে অজান্তে।

বাইরে বসে ছিল তিনজন। এগিয়ে এসে হৈমন্তীর কাঁধে একটা হাত রাখে স্নিগ্ধা। নিচু, চাপা গলায় বলে, "তোর সঙ্গে একটা কথা আছে, আয় আমার সঙ্গে।"

রিসেপশনের ঠিক সামনে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সরু প্যাসেজটা একেবারে শেষপ্রান্তে এসে একটু বেঁকে গেছে। ছোট একটা খাঁজ তৈরি হয়েছে সেখানে। প্যাসেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না জায়গাটা। সেখানে হৈমন্তীকে এনে দাঁড় করায় স্নিগ্ধা। খানিকটা ঝুঁকে তার দু'কাঁধে দুটো হাত রাখে। মেয়েটা যেন একটু থতমত খেয়ে গেছে। চোখ দুটো স্বাভাবিকের তুলায় একটু বড় দেখাচ্ছে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আমি একটা প্রশ্ন করব, মনে করে উত্তর দিবি, ঠিক আছে?"

— "আচ্ছা ম্যাম।"

— "সরণের সূত্র কী?"

এই প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না হৈমন্তী। তার থতমত ভাবটা বেড়ে ওঠে, একটু ভেবেচিন্তে বলে, "কোনো বস্তু বা বিন্দু একটি অবস্থান থেকে আরেকটি অবস্থানে স্থানান্তরিত হলে, প্রথম অবস্থান থেকে দ্বিতীয় অবস্থান অবধি ভেক্টরকে সরণ বলে।"

— "বাঃ..." খুশি হয় স্নিগ্ধা। নিজের হাত থেকে হাতঘড়িটা খুলে ফেলে সে, সেটা হৈমন্তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "এই দেখ, ঘড়ির কাঁটাটা বারোটা থেকে শুরু হয়ে আবার বারোটায় ফিরে আসছে। মানে ঘড়ির কাটার সরণ কত হল?"

— "শূন্য।" চটপট উত্তর দেয় হৈমন্তী।

ঘড়িটা হৈমন্তীর হাতে বাঁধতে থাকে স্নিগ্ধা। বলে, "এই কাঁটাটা হল সময়, এটাকে বন্দি করে তোর হাতে আটকে দিলাম আমি।"

— "ম্যাম আমি ক্লাস টুয়েল্‌ভে পড়ি..."

— "চুপ কর, যা বলছি শোন। সময় সবসময় পালিয়ে যেতে চায়, সে বারোর পর তেরো, চোদ্দ এমন করে ধেয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তুই তা হতে দিবি না, এমন করে বন্দি করে রাখবি তাকে, সময়ের যেন কোনও সরণ না হয়। মনে থাকবে তো?"

হৈমন্তী কী বলবে বুঝতে পারছিল না। মাথা নেড়ে দেয়।

— "এই ঘড়িটা কখনও খুলবি না হাত থেকে, ঠিক আছে?"

— "হ্যাঁ ম্যাম।"

হৈমন্তীর মাথায় একটা হাত রাখে স্নিগ্ধা, "অনেক বড় হ রে মা, এখন যা, দেখ মা-বাবা কী বলছে..."

* * * * * * * * * *

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ঘুমটা ভেঙে যায় হৈমন্তীর। সত্যি কি ঘুমাচ্ছিল? নাকি জেগে জেগেই ভাবছিল আগের কথা? এ বাড়িতে এসে থেকে ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। স্নিগ্ধাম্যামের খবর নেওয়া হয়নি অনেকদিন। নম্বরটাও হারিয়ে গেছে সেই কবে। কলকাতায় ফিরে আগে খোঁজ করতে হবে।

এতক্ষণে বাঁ হাতের উপরে মাথা দিয়েই শুয়েছিল সে। সামনে তাকাতে কবজিতে বাঁধা ঘড়িটা চোখে পড়ে। সেকেন্ড, মিনিট আর ঘণ্টা, তিনটে কাঁটাই এখন বারোটার দাগ পার হয়ে যাচ্ছে...

## তৃতীয় অধ্যায়

জল দিয়ে সবে ধুয়েছে মুখটা। এখনও মোছা হয়নি। টপটপিয়ে জল পড়ছে মুখ থেকে। এমন সময় দরজায় খটরমটর আওয়াজ।

— "শুনছেন? চা এনেছি আপনার জন্য..."

— "দাঁড়ান, খুলছি.."

মুখটা না মুছেই এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দেয় হৈমন্তী। চায়ের প্লেট হাতে অশ্বিনী ঘরের ভিতরে এসে ঢোকে, "চিনিটা একদম আন্দাজে দেওয়া, ভাবলাম একবার ডেকে জিজ্ঞেস করি কতটা চিনি খান, তারপর ভাবলাম এত তুচ্ছ কারণে ডাকলে যদি রেগে যান..."

দাঁড়ানো অবস্থাতেই কাপে একটা চুমুক দেয় হৈমন্তী, "আঃ, পারফেক্ট।"

অশ্বিনীর মুখে হাসি ফোটে, প্লেটটা টেবিলের উপরে রেখে সে ঘর থেকে বেরনোর উপক্রম করে। হৈমন্তী থামিয়ে দেয় তাকে।

— "তাড়া আছে নাকি?"

— "তেমন না, আসলে একটু বাজার করতে যেতে হবে। চাল-ডাল বাড়ন্ত।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আপনি নিজে বাজার করেন?"

— "রোজ না, গনশা বলে একটা ছেলে আছে, ওই এনে দেয়। তবে আজ আপনি এসেছেন, শুধু চাল ডাল হলেই তো আর হল না।"

— "হু..." গম্ভীর মুখে পকেটে হাত চালিয়ে সিগারেট বের করে আনে হৈমন্তী, "আমার জন্য স্পেশাল আয়োজন? তা কী কী রান্না করতে পারেন আপনি?"

এতক্ষণে হৈমন্তীর মুখে আপনি সম্বোধন'টা বেমানান লাগতে শুরু করেছে। ছেলেটা তার থেকে তো ছোট, তুমি বলতে অসুবিধা নেই কোনও। কিন্তু আচমকা সেটা বলতে শুরু করলে কেয়ারটেকার বলে তাচ্ছিল্য করছে ভেবে বসতে পারে ছেলেটা।

— "আপনি তো দু'সপ্তাহ আছেন, সারপ্রাইজ থাক না হয়।"

দেশলাই দিয়ে অগ্নিসংযোগ করতেও কিন্তু জ্বলল না সিগারেটটা, হৈমন্তী বিরক্ত হয়। কাল জল লেগে কি ড্যাম্প খেয়ে গেছে?

— "এটা জ্বলবে, দেখুন..." ছেলেটা কোথা থেকে যেন একটা সিগারেটের বাক্স বের করে এগিয়ে দেয় তার দিকে।

হৈমন্তী একটু অবাক হয়, "আপনি সিগারেট খান নাকি?"

— "আজ্ঞে না।"

— "তাহলে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন যে।"

ছেলেটা একইরকম ঠান্ডা গলায় বলে, "ভাবলাম যদি আপনি খান আর কি..."

— "কিন্তু আমি এসে থেকে তো একবারও খাইনি তোমার সামনে, জানলে কী করে যে আমি সিগারেট খাই?"

ছেলেটা মৃদু হাসে, "আমি তো এও জানি, আমাকে আপনি বলতে অস্বস্তি হচ্ছে আপনার। নেহাত আমি কেয়ারটেকার বলে সংকোচ বোধ করছেন।"

সিগারেটটা জ্বালাতে গিয়েও থেমে যায় হৈমন্তী, "তুমি তো ভারী ইন্টারেস্টিং ছেলে হে... মাইন্ড রিডিং পারো না কি?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "ওই একটু আধটু..." অশ্বিনী সলজ্জ মুখে বলে।

—"বাঃ, আর কী বুঝতে পারছ আমার সম্পর্কে?" সিগারেটে একটা টান দিয়ে ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করে হৈমন্তী।

হৈমন্তীর কপালের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার তাকায় ছেলেটা, গড়গড় করে বলে যেতে থাকে, "আপনি অবিবাহিত, বা খুব অল্প সময়ের জন্য বিয়ে করেছিলেন। ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে ঘুমাতেন না, একা ঘুমাতেন, গায়ে হাতে পায়ে কিছু দাগ আছে মনে হয়, কিছুটা অলস, চুল নিয়ে ভীষণ কনসাস... আর..."

— "হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট?" প্রায় দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল হৈমন্তী।

ছেলেটা রহস্যময় হাসে, "আহা বসুন, উত্তেজিত হবেন না।"

— "সে হব না, আগে বলো কী করে জানলে?"

ছেলেটা একটা আঙুল দিয়ে হৈমন্তীর বিছানাটা দেখায়, "দেখুন, বিছানার একেবারে মাঝখান'টা কুঁচকেছে, ধারের দিকগুলো টান'টান, মানে সারারাত আপনি বিছানার একেবারে মাঝখানে শুয়েছিলেন। সাধারণত যারা ছোট থেকে কারও সঙ্গে বিছানা শেয়ার করে আসে তারা এভাবে মাঝখানে শোয় না, কারও জন্য জায়গা ছেড়ে একটা ধার ঘেঁষে শোয়। বিশেষ করে বিবাহিত মানুষদের পক্ষে তো সম্ভবই না। একা শুলেও অবচেতনে তারা কারও জন্যে বিছানা ছেড়ে শোয়।"

— "আই এম ইম্প্রেশড, আর বাকিগুলো?"

— "সকাল হয়ে গেছে কিন্তু বিছানা তোলেননি, তাছাড়া আপনি কাল এখানে এসেছেন এখনও ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করেননি, মানে রিসার্চের কাজও শুরু করেননি; অর্থাৎ অলস। আপনার আলনার দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে সমস্ত জামা কলারওয়ালা, মানে কাঁধে বা গলার কাছে কোনও দাগ আছে যেটা কাউকে দেখাতে চান না..."

— "আর চুলের ব্যাপারটা?"

এবার হেসে ফেলে অশ্বিনী, "আপনি আজ পর্যন্ত এমন কোনও মেয়ে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



দেখেছেন যে নিজের চুলের ব্যাপারে কনসাস না?"

— "বাবা! মেয়েদের ব্যাপারে ভালো জ্ঞানগম্যি আছে দেখছি, তা গার্লফ্রেন্ড জোটেনি এখনও?"

প্রশ্নটা শুনে আচমকাই গম্ভীর হয়ে যায় ছেলেটা, মুখ নামিয়ে বলে, "আমি যাই এখন, বাজার করতে হবে, বেলা বাড়লে ভালো সবজি আর পাওয়া যাবে না।"

— "আমি গেলে আপত্তি আছে কিছু?" হৈমন্তী সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে বলে, "সবজিপাতি বয়ে দিতে পারি, আর জায়গাটাও খানিক দেখা হয়, তাছাড়া..."

— "কী?"

— "সাতসকালে অলস বলে দাগিয়ে দিলে, কিছু তো একটা করা দরকার..." একটু কৌতুক করে বলে হৈমন্তী।

— "বেশ, আপনি তৈরি হয়ে নিন, আমি ডাক দিচ্ছি।" বলে নিচে নেমে যায় অশ্বিনী। হৈমন্তী সিগারেটটা শেষ করে বিছানার উপরে ফিরে আসে। ব্যাগের ভিতর থেকে ল্যাপটপটা বের করে আনে। অস্মিতা এর মধ্যে বেশ কটা মামুলি মেসেজ পাঠিয়েছে। সেগুলোর আর জবাব দিতে ইচ্ছে করে না।

ল্যাপটপ খুলে প্রথমে মেইল চেক করে, একটা নতুন ই-মেইল এসেছে, সেটার রিপ্লাই দেয়, 'আজ থেকে কাজ শুরু করব, জিনিসটা যেখানেই থাক টোটালি আনগার্ডেড অবস্থায় আছে। আশা করি খুব একটা বেগ পেতে হবে না।'

মেইল বন্ধ করে ডকিউমেন্ট ফোল্ডারে ফিরে আসে। এই ভাসানবাড়ি সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে সেটা পয়েন্ট করে রাখা আছে সেখানে। তার উপরেই আর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় হৈমন্তী।

মোটামুটি আঠেরোশো ষাটের আশেপাশে মুরারিমোহন মানে এক জ্যোতির্বিদ কলকাতা থেকে এসে এই বাড়ি বানান। সে সময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং। এই মুরারিমোহন ছিলেন ক্যানিঙের অত্যন্ত কাছের একজন।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



তার একটা কারণও ছিল, সে সময়ে ভারতের মহাকাশ গবেষকদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন মুরারিমোহন। সাইন্স জার্নালে তার নামও পাওয়া যায় বেশ কয়েকবার। কিন্তু ওই আঠেরোশো ষাটের পর থেকেই যেন লুকিয়ে পড়েন মুরারিমোহন। অর্থাৎ এ বাড়িতে এসে বসবার শুরু করার পর থেকেই নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন যেন।

ভারতে আসার আগে আঠেরোশ সাতচল্লিশ নাগাদ ব্রিটেনের জাদুঘর পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন ক্যানিং। গোটা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা কয়েক লক্ষ প্রাচীনপুঁথি আর আর্টিফ্যাক্টের আঁতুড়ঘর ছিল ব্রিটিশ মিউজিয়াম। শোনা যায় সেখান থেকেই মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন আর্টিক্যাক্ট ভারতে নিয়ে আসেন ক্যানিং। সেটা তিনি তুলে দেন মুরারিমোহনের হাতে। তবে এ-সবই প্রাচীন গুজব। সম্ভবত আরবান মিথ।

গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকে হৈমন্তী। সত্যিই কি লর্ড ক্যানিঙের হাতে করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কোনও গোপন সম্পদ এসে পৌঁছেছিল মুরারিমোহনের হাতে? যদি এসে থাকে তবে সেটা নিয়ে কী করেছিলেন মুরারিমোহন? এবং তার থেকেও বড় কথা, জিনিসটা কি এখনও এই বাড়িতেই আছে?

ভাসানবাড়ির চারপাশটা নির্জন, দু পাশে বুনো গাছের সার ছাড়া আর তেমন কিছু চোখে পড়ে না। কারুকাজ করা যে পাঁচিলটা দিয়ে চৌহদ্দিরা ঘেরা সেটা কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। লোহার রড্ বেরিয়ে পড়েছে সেখান থেকে। সেই ভাঙা জায়গার ফাঁকে ফাঁকে শুকনো শ্যাওলার আস্তরণ জমে আছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ভ্যান রিকশা দাঁড় করাল অশ্বিনী। হৈমন্তী এর আগে কোনওদিন ভ্যানে ওঠেনি। উপরে চড়ে বসতে বেশ অসুবিধা হল তার। তবে মানিয়ে নিল কোনওরকমে। মাটির রাস্তার উপরে চাকার ঘটঘট শব্দ করে চলতে লাগল গাড়ি।

এ গ্রামে এসে থেকে হৈমন্তীর মন'টা ভিজে আছে, এখানে কলকাতা শহরের ধোঁয়া আর কলকব্জা নেই, রাস্তার দু পাশ জুড়ে এবড়ো-খেবড়ো

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ঘাসে ঢাকা জমির উপরে লম্বা লম্বা ঘাছ, পথের ধারে কলতলা, দীঘি আর তার মাঝে একটা দুটো কুঁড়ে ঘর। কোথাও আবার পাকা বাড়ি।

— "আচ্ছা, একা একা এখানে থাকতে বোর লাগে না তোমার?" রাস্তার দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করে হৈমন্তী।

— "না, আপনার লাগছে?"

— "আমি তো কাজে এসেছি, কাজ নিয়ে থাকলে আর বোর লাগবে কেন? ভালো কথা, নিবারণবাবু কোথায় আছেন বলতো?"

— "আমাদের বাড়ি আর একটু ভিতরের দিকে।"

— "ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার, কয়েকটা ইনফরমেশান জানার আছে, নাহলে কাজ এগোবে না।"

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ছেলেটা উত্তর দেয়, "আপনার যা জানার আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, এ বাড়ির ব্যাপারে বাবার থেকে অনেক গল্প শুনেছি।"

— "বটে!" ডানহাত দিয়ে চুলগুলো পিছনে ঠেলে দেয় হৈমন্তী, "কতদিন হল দেখছ বাড়িটা?"

— "জন্ম থেকেই।"

— "মানে বছর তিরিশেক?"

— "তাই হবে..."

এবার গলাটাকে একটু ভারী করে নেয় হৈমন্তী, "আর নিবারণবাবু?"

— "বাবাও জন্ম থেকেই এখানে আছেন। বাবার বয়স ধরে নিন ষাট..."

হৈমন্তী মনে মনে হিসেব করে, উনিশশো ষাট। মুরারিমোহন সম্ভবত মারা যান আঠেরোশো নব্বুই নাগাদ। মাঝের এই সত্তর বছরের হিসেব জানে এমন কাউকে খুঁজতে হবে।

— "নিবারণবাবুর আগে এ বাড়ি কে দেখাশোনা করতেন?"

অশ্বিনী ঠোঁট উল্টায়, "বাবার আগে পাঁচবছর বাড়িটা ফাঁকা পড়েছিল, শুনেছি তখন থেকেই কোর্টে কেস চলছে। তার আগে তো লোক থাকত

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



এখানে। যিনি এ বাড়ি তৈরি করেছিলেন তার বংশধররা।"

—"বটে।" কিছুক্ষণের জন্যে গভীর ভাবনায় ডুবে যায় হৈমন্তী। মাটি এখন আগের থেকে আরও একটু বেশি অমসৃণ হয়ে পড়েছে। ঘটঘট শব্দটা বেড়ে গেছে তুলনায়।

জোর করে মুখে একটা কৌতুকের ভাব আনে হৈমন্তী, "আচ্ছা এইসব প্রাচীন পরিত্যক্ত বাড়িতে তো শুনেছি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, নিরারণবাবু বা তুমি তেমন কিছু দেখোনি কোনওদিন?"

আচমকাই একটা ঝাঁকা খায় ভ্যান'টা, হৈমন্তীর শরীরটা অনেকটা সরে আসে অশ্বিনীর দিকে, দুটো মুখ কাছে এসে পড়ে, একটা কফিজাতীয় গন্ধ এসে প্রবেশ করে হৈমন্তীর নাকে।

— "আপনি বিশ্বাস করেন, ভূতে?" অশ্বিনী জিজ্ঞেস করে।

অদ্ভুত একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে হৈমন্তী, গোটা ভ্যান'টা দুলে উঠেছিল এইমাত্র। চালক, হৈমন্তী এবং বসার পাটাতনগুলোও প্রায় কয়েক ইঞ্চি লাফিয়ে উঠেছিল নিজেদের জায়গা থেকে, অথচ অশ্বিনীর শরীরে কোনও হেলদোল নেই। ধাক্কাটা যেন এসে লাগেইনি তার শরীরে।

— "উঁহু... যা দেখিনি তা বিশ্বাস করব কেন?"

— "আজ রাতে দেখলে বিশ্বাস করবেন?"

— "মানে..." হৈমন্তী জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বলে।

— "আজ রাতে ঠিক দেড়টা নাগাদ ছাদে চলে আসবেন। আপনি বাঙাল ভাষা জানেন?"

হৈমন্তী হাসে, "কেন? তোমার ভূত বাঙাল নাকি?"

— "না, তবে নিতাইদা বাঙাল, এক্কেবারে ঢাকাইয়া..."

কথা শেষ হবার আগেই থেমে যায় ভ্যান'টা, একটা ধুতিপাঞ্জাবি পরা বেঁটেখাটো মাঝবয়সী লোক হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়েছে ভ্যান'টা, লোকটার মুখে পান, রাস্তার একধারে পিক্ ফেলে এগিয়ে আসে সে ভ্যানের দিকে, "অত হরবড় করনের কী আসে? ধীরে চালাইতে পারো না? কই যাবা?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আমরা তো বাজার যাচ্ছি নিতাইদা, আপনিও চলুন না?"

— "তুমি বেশি কথা কইবা না পোলা, তমারে কি আমি জিগাইসি?" ধমক দেন নিতাইদা, চালকের দিকে তাকিয়ে বলেন, "শুনো, পুলাপানগো বাজারে ড্রপ কইরা আমারে পোস্ট আপিসে লইয়া যাবে। বুঝস?"

চালক মাথা নেড়ে দেয়। ধুতি গুটিয়ে ভ্যানে উঠে পড়ে নিতাই। লোকটার কথার মধ্যে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক আছে, হৈমন্তীর মন'টা হালকা হয়ে যায়।

ভ্যান'টা আবার একটা বিকট গর্জন করে চলতে শুরু করে। নিতাই হৈমন্তীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মন দিয়ে পান চিবাতে চিবাতে বলে, "মাইয়া কেডা?"

— "কলকাতা থেকে এসেছেন আমাদের ভাসানবাড়ি নিয়ে রিসার্চ করতে।"

— "রিসার্চ! মানে সাইন্টিস্ট?"

হৈমন্তী কিছু বলতে যাচ্ছিল, অশ্বিনী হাতে চাপ দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়, "হ্যাঁ, নাম করা বিজ্ঞানী। মহাকাশ গবেষণা করেন। আমাদের নিতাইদার আবার এ অঞ্চলে জ্যোতিষী বলে একটা খ্যাতি আছে।" ছলনার হাসি হাসে অশ্বিনী।

— "তাই নাকি! আপনি হাত দেখতে পারেন?" হৈমন্তী জিজ্ঞেস করে।

— "হাত না, মুখ। মানুষের মুখ দেখে গড়গড় করে সব বলে দেন..."

হৈমন্তী উৎসাহিত হয়ে ওঠে, "তাই নাকি? আমার মুখ দেখে বলে দিতে পারবেন না?"

— "রিকোয়েস্ট করে দেখুন, কখন কী মুডে থাকেন বলা তো যায় না, ও নিতাইদা, হবে নাকি একবার?"

নিতাই পকেট থেকে বের করে একটা বিড়ি ধরিয়েছে এতক্ষণে। প্রাণের আরামে একটা টান দেয় তাতে, তারপর অশ্বিনীর দিকে চেয়ে বলে, "তোমার মুখখান জানি না ক্যান একদম বুজি না, এদ্দিন দেখসি, ঘুরঘুর করতিসো

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



চোখের সামনে অথচ বেবাক ফাঁকা। জ্যান সৃষ্টিকর্তা কিছুই লেখে নাই। ব্ল্যাঙ্ক পেজ।"

চাপা গলায় হৈমন্তী বলে, "আমারও কিন্তু তাই মনে হয় বুঝলে, তোমাকে উপর থেকে যা মনে হয় আদৌ তুমি তা নয়, ভিতরে অন্য কিছু আছে।"

— "এত তাড়াতাড়ি বুঝে গেলেন?"

হৈমন্তী চোখ টেপে, "একটু সময় দাও, আরও বুঝে যাব, এই বাড়িটাকেও আর তোমাকেও..."

একটু উদাস দেখায় অশ্বিনীকে, নিতাই মুখ ফিরিয়ে বলে, "শুনো মাইয়া, রিসার্চ বলো আর যাই বলো, ও বাড়ির আসল কানেকশন হইল এস্ট্রোলজির লগে, ভাসানবাড়ির ছাতে গিয়ে দাঁড়াইলে এমন কিছু তারার দেখা পাবা যা তুমি অন্য কুথাও হতে পাবা না।"

— "বলেন কী! শুধু ছাদ থেকেই দেখা যায়?"

— "আর সেই জন্যেই নিতাইদা মাঝে-মাঝে খাতাপত্র নিয়ে ছাদে গিয়ে কীসব গণনা করেন। ও বাড়ির ছাদ থেকে নাকি অন্যরকম আকাশ দেখা যায়।"

হৈমন্তীর ভুরু দুটো কুঁচকে যায়। সে আর কিছু বলে না। আবার ভ্যানের শব্দ প্রকট হয়ে ওঠে।

মিনিটখানেক পরেই বাজারের সামনে এসে দাঁড়ায় ভ্যান'টা। অশ্বিনী নিচে নেমে ঝোলা ব্যাগগুলো নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ভাড়া মেটাতে-মেটাতে বলে, "আপনি কী খেতে ভালোবাসেন? মাছ না মাংস?"

— "মাইন্ড রিডিং করে বের করবে পারবে না এটা?" ইঁটের উপরে পা রেখে বলে হৈমন্তী।

ঠোঁট দুটো ফাঁক হয় ছেলেটার, হাসিটা অর্থপূর্ণ, বলে, "চলে আসুন। মশলাপাতি কিনতে হবে আগে।"

— "কী কিনবেন ঠিক করতে পারলেন না?"

অশ্বিনী সামনে হাঁটতে-হাঁটতে বলে, "কোন'টাই লাগবে না। বাড়িতে মাটন

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আছে, কালাই গনশা কিনে দিয়ে গেছে।"

— "আপনি কী করে জানলেন আমি মাটন ভালোবাসি?"

— "থট রিডিং..."

এবার কিন্তু সত্যি একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে হৈমন্তীর মনের ভিতরে। ছেলেটা তার সমস্ত কথা এত সহজে জেনে যাচ্ছে কী করে? থট রিডিং বলে আদৌ কিছু হয় বলে সে বিশ্বাস করে না।

— "দিদি, ব্যাগ নেবেন? ভালো ব্যাগ আছে..."

— "রাবারের চটি, হরেক মাল পঞ্চাশ টাকা..."

একটা গলা কাটা মুর্গীর শেষ চিৎকার শোনা গেল, একটা মাছের মাথাকে মাঝখান থেকে দু'ফাঁক করে দিল একটা ধারালো আঁশবটি...

এগোতে গিয়েও পা বাড়াতে পারল না হৈমন্তী। তার মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে, চারদিক থেকে ভেসে আসা ডাকগুলো পাক খেতে লাগল ওকে ঘিরে। এমন হচ্ছে কেন? চারদিকের পৃথিবীটা এমন বন্‌বন্ করে ঘুরতে শুরু করেছে কেন?

পায়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তার ক্লান্ত শরীরটা নেমে আসছে মাটির কাছাকাছি। অনুভব করল কাঁধ থেকে কলারটা সরে গেছে, কালচে শুকনো ছোপগুলো বেরিয়ে পড়েছে রোদের আলোয়। চারপাশ থেকে অনেকগুলো উন্মুখ চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে, তাকিয়ে আছে কাঁধ বুক আর কোমরের দাগগুলোর দিকে।

হঠাৎ চারপাশ থেকে একটা উষ্ণ অনুভূতি ঘিরে ফেলল ওকে। একটা শ্যালের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে হৈমন্তী। সেই সঙ্গে একটা মানুষের শক্ত শরীর – একটা বুক। বুকটা চেনে হৈমন্তী, এর স্পর্শে আগেও চমকে উঠেছে সে। এবার আর চমকালো না বরং আঁকড়ে ধরল এবার।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# চতুর্থ অধ্যায়

মাটিতে সজোরে মাথাটা ঠুকে যেতে ঘুম ভাঙল হৈমন্তীর। চোখ মেলতে বুঝতে পারল বিছানা থেকে মেঝের উপরে এসে পড়েছে। "উঃ" শব্দ করে এক হাতে কপাল চেপে ধরল সে। মনে হল মাথায় একসঙ্গে দুটো যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। একটা আগে থেকেই ছিল, আর একটা এইমাত্র মাটিতে মাথা ঠুকে জন্মেছে।

চোখ খুলে হৈমন্তী দেখল মেঝের উপরে সাদা রঙের কয়েকটা কাগজ পড়ে আছে, যেন ঘরময় সেগুলো ছড়িয়ে রেখেছে কেউ। হাতের উপরে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। শরীরটা চলছে না। মাথাটা ভারী হয়ে আসছে। গলার কাছে একটা কষাতে স্বাদ ঢোঁক গিলতে বাধা দিচ্ছে বারবার। সেই সঙ্গে ঠোঁটের পাশে চটচটে আঠালো ভাব।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আঠালো ভাবটা আধশুকানো রক্তের। গাল আর চিবুকের কয়েক জায়গায় কালো রক্ত শুকিয়ে গেছে। চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা টাটকা জল নেমে এসেছিল বাসি রক্তের গায়ে, বেসিনের সামনে গিয়ে দ্রুত সেগুলো মুছে ফেলল হৈমন্তী।

জামাকাপড় খানিকটা ঠিকঠাক করে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। গলায় জোর এনে ডাক দিল, "অশ্বিনী... এই অশ্বিনী..."

নিচের দিকের ঘর থেকে কোনও শব্দ এল না। রেলিং ধরে নিচে নামতে লাগল সে।

রাত সাড়ে ন'টার কাছাকাছি বেজেছে। সকাল থেকে এখন অবধি ঠিক কী ঘটেছে মনে নেই হৈমন্তীর। বাজারে ঢোকার মুখে সে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। তারপর অশ্বিনীই হয়তো বাড়িতে এনে শুইয়ে দিয়েছে ওকে।

একতলায় নেমে আরও বারদুয়েক ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া গেল না। আবার কালকের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল হৈমন্তী। এখনও আলো আসছে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



সেখান থেকে। দেয়ালে হাত রেখে এগিয়ে যায় সে।

কালকের থেকে আজকে কোনও তফাৎ নেই। মোটামুটি ফাঁকা একটা ঘরে একদিকে বড় আয়নার মুখোমুখি বসে আছে ছেলেটা। অধির আগ্রহে চেয়ে আছে আয়নাটার দিকে। মন দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। মাথা, পা, হাতের আঙুল একবিন্দুও নড়ছেও না। কিছুক্ষণের জন্যে যেন তার শরীর থেকে প্রাণের চিহ্ন মুছে দিয়েছে কেউ।

— "অশ্বিনী... তুমি এখানে..." বেশ জোর গলাতেই কথাটা বলেছে হৈমন্তী। ছেলেটা কিন্তু এখনও ফিরে তাকায়নি ওর দিকে।

ধীরে ধীরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় হৈমন্তী। আয়নায় অস্বাভাবিক কিছু নেই। একটা হাতল দেওয়া চেয়ারে বসে আছে অশ্বিনী। চোখ দুটো ঠান্ডা পাথরের মতো স্থির, তার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে হৈমন্তী।

— "এই অশ্বিনী..." কাঁধে একটা ঠেলা দেয় হৈমন্তী। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায় সে, "ওঃ! আপনি, শরীর কেমন লাগছে এখন?"

— "বেটার..." মুখটা একবার মুছে নিয়ে বলে হৈমন্তী। অশ্বিনী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, "আপনি বসুন বরঞ্চ, আমার একটু কাজ আছে এখন..."

— "না দাঁড়াও..." অশ্বিনীর হাতের উপর চাপ দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয় হৈমন্তী, বলে, "আমার মুখে রক্ত লেগেছিল, কিন্তু বিছানায় তেমন রক্ত ছিল না, সারাদুপুর কোথায় ছিলাম আমি?"

— "বিছানাতেই ছিলেন..." আঙুল দিয়ে ঘরের একটা কোণ দেখিয়ে দেয় অশ্বিনী। একটা ছোট ঝুড়ি ভর্তি হয়ে আছে দলা পাকানো কাগজে। সব কাগজগুলোতেই রক্তের দাগ।

— "আজ বিকেল অবধি ভীষণ জ্বর ছিল আপনার। ঘুমের ঘোরে মুখ দিয়ে খুব রক্ত উঠছিল, আমার কাছে অত কাপড় নেই তাই..."

চেয়ারে বসে পড়ে হৈমন্তী। দুটো হাত দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের মুখ ঢেকে ফেলে। মুখ তুলতে আয়নার নিজের মুখটা দেখতে পায়, চোখ সরিয়ে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



নেয়। হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে থাকে কয়েক সেকেন্ড। তারপর মুখের উপর এসে পড়া চুলগুলো যত্ন করে সরিয়ে নিয়ে বলে, "তুমি এমন আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকো কেন বলতো?"

অশ্বিনীর মুখে কোনও পরিবর্তন আসে না। তার চোখ দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু চমকে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়, "ওটা আমার একটা স্বভাব বলতে পারেন, এই যেমন আপনি সবসময় হাতে এই ঘড়িটা পরে থাকেন, কেন?"

হৈমন্তী হাসে, "আয়না ছাড়া অন্য দিকেও নজর দাও তার মানে। ওটা স্কুলে আমাকে আমার এক ম্যাম দিয়েছিলেন।"

— "কেন?"

— "পরীক্ষায় থার্ড হয়েছিলাম একবার। আচ্ছা তোমার পড়াশোনা কতদূর?"

একটু ইতস্তত করে অশ্বিনী, "আমার আর পড়াশোনা..." দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "ওই স্কুলটুকু পাশ করেছি। তবে আমি বই অনেক পড়েছি জানেন, ফিকশন, নন-ফিকশন, বিজ্ঞানের বই... ছাদে যাবেন?"

হৈমন্তীর মনে হল 'বিজ্ঞানের বই' এর সঙ্গে ছাদে যাওয়ার প্রসঙ্গটার কোথাও একটা যোগাযোগ আছে। সে মাথা নাড়ল, "চলো..."

হৈমন্তী লক্ষ করেছে অশ্বিনী এ বাড়িতে এতটা সময়ে থাকলেও তার থাকার চিহ্ন নেই কোথাও। বিছানা নেই, ধরে নেওয়া যায় সে মাটিতে শোয় কিন্তু মাটিতে পাতার চাদর-তোষক, বালিশ, জামাকাপড়ের আলনা, গামছা, টুথব্রাশ, দাড়িকাটার জিনিসপত্র এসব কোথায়? ছেলেটার গাল দেখে বোঝা যায় প্রায় রোজই দাড়ি কাটে সে। অন্য কোনও ঘরে আছে কি তাহলে?

হাতে একটা ছোট চটের থলে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ছাদে চলে আসে অশ্বিনী, তার পেছন পেছন হৈমন্তী। ভাসানবাড়ির ছাদে সে এই প্রথম এল। মন'টা জুড়িয়ে গেল তার। ছাদের চারদিকে দু'ফুট উঁচু পাচিল দেওয়া, সেগুলো পার করে গ্রামের বুক জুড়ে ঝোপঝাড়, জঙ্গল আর খুদে খুদে বাড়িঘর

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



চোখে পড়ে। উপরে অনন্ত তারাভরা আকাশ। তার বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা আকাশছোঁয়া গাছ। যেন গ্রামের মানুষজন এককালে আকাশে চড়ার জন্যেই বানিয়েছিল সেগুলো, খানিকটা তৈরি করার পর কোনও কারণে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

শনশন করে হাওয়া দিচ্ছে একটা। হৈমন্তীর শরীর যেন সেই বাতাস থেকেই ফুরিয়ে যাওয়া রক্ত শুষে নিচ্ছে। মাথার পিছনে বাঁধা চুলগুলো খুলে ফেলল সে। খোলা হাওয়ায় নিঃশব্দ ছন্দে উড়তে লাগল তারা।

ছাদের একপ্রান্তে একটা সিমেন্টের বেঞ্চ করা আছে। জনাতিনেক লোক তাতে বসতে পারে। ওরা দু'জন দুপাশে বসল। অশ্বিনী চটের থলে থেকে কয়েকটা লালচে ফল বের করে মাঝখানে রাখল।

— "কী ওটা?" হৈমন্তী জ্যোৎস্নায় চিনতে পারল না ফলটা।

— "বেদানা। আপনার শরীর থেকে যা রক্ত বেরিয়েছে সেটা ফিরিয়ে আনতে এর থেকে ভালো কিছু হয় না।"

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ছেলেটার মুখের দিকে তাকায় হৈমন্তী, নিচু চাপা গলায় বলে, "তুমি আমার এত যত্ন নিচ্ছ কেন বলতো?"

বেদানার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে অশ্বিনী বলে, "আমার গোটা জীবন'টা তো যত্ন নিতে নিতেই কেটেছে, কখনও বাড়ির কখনও মানুষের।"

— "কেয়ারটেকার?" হৈমন্তী হাসে, "এমন করে গোটা জীবন বললে যেন চার কুড়ি পেরিয়ে গেছে..."

— "আমার বয়স দেখে যা মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি... হাত পাতুন।"

হৈমন্তীর হাতে কয়েকটা দানা তুলে দেয় অশ্বিনী। সেগুলো চিবোতে চিবোতে হৈমন্তী বলে, "আচ্ছা এই বাড়িটা তো বেশ পুরনো, কোনও লুকানো ঘর, প্যাসেজ, সুড়ঙ্গ এই টাইপের কিছু আছে?"

— "উঁহু..."

— "বছর ষাটেক আগেও তো লোক থাকত এখানে, তাদের সব

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



জিনিসপত্র গেল কোথায়?"

— "বিক্রি হয়ে গেছে নিলামে।"

— "আর যেসব জিনিস নিলাম করা যায় না? মানে ধরো বইপত্র, কাগজ, বা সেকালের যেসব ছবি-টবি ছিল? সেগুলো গেল কোথায়?"

— "আমি জানি না। হয়তো জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ে কী করবেন আপনি?"

— "আমার কাজে লাগত।"

অশ্বিনী আর কিছু বলল না। কিছু বিশেষ প্রসঙ্গে কথা বললে সে হঠাৎ করেই চুপ করে যায়। হৈমন্তীর কিন্তু মন বলছে কাগজপত্র এ বাড়িরই কোথাও রাখা আছে। হয়তো সবার চোখের আড়ালে। হয়তো এমন কোনও জায়গায় যেখানে বাড়ির বাসিন্দাদেরও চোখ পড়ে না। তন্নতন্ন করে খুঁজলে পাওয়া যাবে কিন্তু সুযোগ কোথায়? ছেলেটাকে এসে থেকে একবারও ঘুমাতে দেখেনি হৈমন্তী। যতবার নিচে নেমেছে ততবার ওই একই দৃশ্য দেখেছে। এক মনে আয়নার দিকে চেয়ে বসে আছে অশ্বিনী। বাজার বা আশেপাশের কোথাও পাঠানো যায় তাকে, কিন্তু সেটুকু সময় তো গোটা বাড়ি খুঁজে ফেলা যায় না। অন্তত একটা দিন তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। ঘুমের ওষুধ আছে হৈমন্তীর...

নিস্তব্ধতা ঘন হয়ে উঠছিল, হৈমন্তী প্রসঙ্গ পালটে নেয়, "তুমি যে বলছিলে রাতে এ বাড়ির ছাদ থেকে কিছু অচেনা তারা দেখা যায়..."

— "এখন না, আর একটু রাতের দিকে..." বেদানাটা প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে এসেছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমন্তী, মেঘ নেই, ফাঁকা তেপান্তরের মাঠের উপরে যেন অনেকগুল উজ্জল হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে গেছে কেউ।

— "আচ্ছা এই যে তারাগুলো, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, আমাদের হাসি-কান্না-অভিমানের সাক্ষী হয়ে আছে যুগের পর যুগ, আমাদের ব্যাপারে কী ভাবে বলতো ওরা?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "একা লাগে ভীষণ..."

— "মানে?" উত্তরটার জন্য প্রস্তুত ছিল না হৈমন্তী।

অশ্বিনীর গলার স্বর যেন দূর থেকে ভেসে আসছে, "আপনার কখনও মনে হয়নি এত বছর ধরে মানুষের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওরা বিরক্ত হয়ে গেছে? মনে হয়নি আর জ্বলতে চায় না ওরা? ওরা নিভতে চায়? ওরা আর আপনার গল্প শুনতে চায় না? মনে হয়নি এবার বিদায় চায় ওরা?"

হৈমন্তী কিছু উত্তর দিতে পারে না। ছেলেটাকে এমন এক নিঃশ্বাসে দমকা হাওয়ার মতো শব্দে আগে কথা বলতে শোনেনি সে। মুহূর্ত আরও ঘন হয়ে ওঠে, আবার থমথমে কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "আপনি আমার কথার উলটো মানে বুঝেছিলেন, আমি বলিনি ভাসানবাড়ির আকাশ থেকে নতুন কোন তারা দেখা যায়..."

— "তাহলে?"

— "এ বাড়ির আকাশ থেকে বেশ কিছু তারা দেখা যায় না। যেসব তারা মরে গেছে তাদের দেখা যায় না এ বাড়ির ছাদ থেকে... একটু রাত হলে দেখতে পাবেন..."

— "যাঃ এ আবার হয় নাকি?" আকাশের দিকে তাকায় হৈমন্তী, "অন্য জায়গা থেকে দেখা যায়, এবাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায় না? ইয়ার্কি?"

— "একটু রাত হোক, দেখতে পাবেন।" বেদানার শেষ দানাটা হাতে তুলে দিতে দিতে বলে অশ্বিনী।

হৈমন্তী মনে মনে ভাবে ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে তার কোনও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা নেই। যে তারাগুলো মরে গেছে তাদেরও আমরা দেখতে পাই কারণ তাদের শেষ সময়ের আলোটুকুনির পৃথিবীতে আসতে কিছুটা সময় লাগে। তাহলে কী গোটা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র এই ভাসানবাড়িতে সময়ের গতিবেগ বেশি? কিন্তু তা কী করে হয়? শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ বদলানো অসম্ভব।

ছাদের দরজার দিক থেকে খশখশে পায়ের আওয়াজ আসতে চমকে ফিরে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



তাকায় হৈমন্তী, এতক্ষণ ভাবনায় ডুবে গেছিল সে।

দরজার কাছে একটা বেঁটেখাটো মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলোয় ছায়াটা চিনতে পারল হৈমন্তী। নিতাইবাবু। একহাতে একটা চোঙের মতো যন্ত্র, সম্ভবত দূরবীন, অন্য হাতে লাল শালুতে বাঁধানো খাতা।

— "কাল রাইতে একখান খুন হইয়া গেসে ইদিকে..."

নিতাই এর কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগে হৈমন্তীর, অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে প্রশ্নটা, "কী?"

— "কী নয়, কেডা। সেইডাই তো বুঝা যায় নাই এহনও। রক্তারক্তি হইয়া গেসে, বুজস? ভোজালি দিয়া মাথা আর ধড় পৃথক কোইরা দিসে..."

— "বাবা! এদিকেও শুরু হল এসব! তো লোকটার মানিব্যাগ-ট্যাগের মধ্যে কোনও পরিচয়পত্র পায়নি পুলিশ?" অশ্বিনী জিজ্ঞেস করে।

— "আইডেন্টিফিকেশোন? হালায় বডিটাই তো গায়েব হইসে... মুন্ডখান কেবল রাস্তার উপরে রাইখখা গেসে।"

খাতাটা বেঞ্চের মাঝখানে রেখে চোঙটা আকাশের দিকে তুলে ধরে নিতাই, বলে, "তবে চেহারা দেইখা তো এ গ্রামের ব্যাডা বলে তো মনে হইতেসে না।"

বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ে ছাদের পাঁচিলের একদিকে এগিয়ে যায় হৈমন্তী, রাতের অন্ধকার মেখে শুয়ে আছে গ্রামটা। শনশনে হাওয়ার তেজ এতক্ষণে কিছুটা বেড়েছে। একটু আগে বেল আর ছাতিম ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল দূর থেকে। এখন মাংসের গন্ধ মিশেছে তাতে?

— "ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে," অশ্বিনী বলে, "খুন করে মুণ্ড গায়েব করার একটা যুক্তি আছে, তাতে আইডেন্টিফিকেশান হতে একটু সময় লাগে, কিন্তু বডি গায়েব করে কী লাভ? এতক্ষণে হয়তো পুলিশ লোকটার পরিচয় পেয়েই গেছে..."

— "ভায়োল্যান্স, বুজস? ভায়োল্যান্স। মুণ্ডুখান দেখায়ে আইডেন্টিফাই করা লাগবে। হুদাই কি বডী গায়েব করসে?"

এতক্ষণ চুপ করে ছিল হৈমন্তী, সে থমথমে গলায় বলে, "ভাবা যায় এই

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



শান্ত নিরিবিলি গ্রামে একটা লোক রাতবিরেতে ছুরি হাতে লুকিয়ে আছে খুন করবে বলে?"

— "ছুরি হাতে লোক কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখা যায়, আপনি চাইলে আমি এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি..."

— "কোথায়?" অবিশ্বাসের সুরে বলে হৈমন্তী।

অশ্বিনী নিতাই-এর দিকে ফিরে হাত বাড়িয়ে দেয়, "আপনার যন্ত্রটা একটু ধার দিন তো নিতাইদা, বিড়ি ধরান বরঞ্চ একটা..."

কথা না বাড়িয়ে দূরবীন'টা দিয়ে দেয় নিতাই। অশ্বিনী সেটা হৈমন্তীর হাতে দিয়ে বলে, "নিন চোখ লাগান এতে, দেখাচ্ছি..."

— "মানে? কী দেখাবে তুমি?"

— "আহা, লাগান না..."

দূরবীন'টা চোখে লাগিয়ে গ্রামের দিকে তাকায় হৈমন্তী। অশ্বিনী একটা হাত দিয়ে তার আর একটা চোখ ঢেকে দিয়ে বলে, "উঁহু, নিচে নয়, উপরে। আকাশের দিকে তাকান।"

— "আকাশের দিকে... ছুরি হাতে লোক!" বিড়বিড় করে হৈমন্তী। কথাগুলো তার ঠোঁটেই আটকে যায়। সত্যি ছুরি কোমরে আর তির-ধনুক হাতে একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। আকাশের বুকে শুয়ে আছে সে। শুয়ে আছে কয়েক কোটি বছর ধরে — কালপুরুষ।

মুগ্ধ হয়ে সেই আদিম অস্ত্রসজ্জিত পুরুষের দিকে চেয়ে থাকে হৈমন্তী।

— "তারাগুলো চেনেন?"

— "উঁহু..."

— "কোমরে গোঁজা তলোয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন? ওর ঠিক মাঝের তারাটার নাম জানেন?"

— "উঁহু..."

— "অরিয়ন নেবুলা... ওটা আসলে তারাই নয়। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর ধুলোর মিশ্রণে তৈরি একটা গোলা... অথচ না থাকলে কালপুরুষের

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



তরোয়ালটাই তৈরি হত না..."

হৈমন্তীর উড়ন্ত চুলের কয়েকটা এসে পড়ে অশ্বিনীর গলার কাছে। সেগুলো সযত্নে সরিয়ে রাখে ছেলেটা। নিজেও আকাশের দিকে চেয়ে আছে সে।

হৈমন্তী তাকায় কালপুরুষের চোখের দিকে। মুখের একটা ক্ষীণ আভাস ছাড়া আর কিছু নেই তার। এত বছর ধরে ওইভাবে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কি সত্যি ক্লান্ত হয়ে যায়নি মানুষটা? আর কি শিকার করতে চায় না সে? নাকি এত বছর ধরে সেও জেগে আছে কারও অপেক্ষায়? আর তাকে দেখতে পেলেই তার শরীরে একটু একটু করে রক্ত-মাংস ফিরে আসবে। অসংখ্য রঙের সমুদ্রের মাঝে আকাশের বুক জুড়ে দু'জনে খেলে বেড়াবে তখন...। হৈমন্তী নিঃশব্দে প্রশ্ন করে, হয়তো কিছু উত্তরও দেয় কালপুরুষ। কিন্তু তাদের মধ্যেকার কয়েক আলোকবর্ষ বায়ুহীন দূরত্বে হারিয়ে যায় সে উত্তর।

দূরবীন'টা নিতাইয়ের হাতে আবার ফিরিয়ে দেয় সে।

— "লোকটা এ গ্রামের নয় বুঝলেন কেমন করে?" জিজ্ঞেস করে হৈমন্তী।

— "গ্রামের লোকের কি আর গলার কাসে..." পরের শব্দটা হাতড়ায় নিতাই, "কালো কালি দিয়া চামড়ার কী জ্যান আঁকে আইজকাল..."

— "ট্যাটু..."

— "হ্যাঁ, ওই একখান ট্যাটু আসে..."

— "আর? আর কিছু পাওয়া যায়নি মুখে?"

একটু সময় নিয়ে নিতাই বলে, "নাকের ঠিক উপরে একখান কাটা দাগ আসে, মেলা বদখৎ দেখতে নাকি..."

— "কোন'টা? লোকটা নাকি ট্যাটুটা?" অশ্বিনী জিজ্ঞেস করে।

— "দুইটাই... ওই ট্যাটুর একখান নামও সুনসিলাম, কী জ্যান..."

— "ডেভিল ট্যাটু..." অজান্তেই হৈমন্তীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কথাটা।

— "সেকী! আপনি চেনেন নাকি লোকটাকে?" অশ্বিনী তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "না।"

— "তাহলে নাম জানলেন কী করে?"

— "এমনি... গেস করলাম..."

দুটো হাত দিয়ে সজোরে ছাদের পাঁচিলটা চেপে ধরেছে হৈমন্তী। এত জোরে যে বুড়ো আঙুলের নখ বেশ কিছুটা চামড়া ছাড়িয়ে উঠে এসেছে। একটা চাপা যন্ত্রণা যেন রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে।

— "আমি ওরকম কাউকে চিনি না..."

## পঞ্চম অধ্যায়

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে খুশি হল হৈমন্তী। গেটের ঠিক বাইরেই একটা হলদে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আজকাল অনলাইন ক্যাবের যুগে সাবেক ট্যাক্সির দিন গেছে। তাও হৈমন্তীর অ্যাম্বাসাডারে উঠতেই ভালো লাগে। এদের সবার রঙ এক, যেন একটা বিরাট বড় গাড়ি প্রতিজ্ঞা করেছিল সব মানুষকে বুকে নিয়ে হাঁটবে সে, কিন্তু একসঙ্গে সবাইকে নিতে পারেনি বলে নিজেকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছড়িয়ে দিয়েছে কলকাতার রাস্তায়।

গুগল ম্যাপ যখন আসেনি তখন এদেরকেই রাস্তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করত পথচলতি মানুষ। বেশিরভাগ সময় দাঁড়িয়েই থাকত ট্যাক্সিগুলো, কখনও ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়ত সিটের উপর শুয়ে। ঘুম ভেঙে ঠিকানা বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। ঢলঢলে, গতিহীন, ঘরোয়া জীবনের ইঙ্গিত ছিল সেখানে।

তাই হৈমন্তী হলদে ট্যাক্সি দেখলে আর উবার ডাকে না। আজও সেদিকেই এগিয়ে এল। ড্রাইভার ভদ্রলোক পাঞ্জাবী। তার খয়েরি দাড়ির উপরে বিকেলের নরম রোদ এসে পড়েছে।

— "গোলপার্ক যাবে?" হৈমন্তী জানলার কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ট্যাক্সিওয়ালা ঝিমোচ্ছিল, মুখ তোলে, "কাহে নাহি জায়েঙ্গে? আইয়ে।"

সামনের সিটে উঠে বসে হৈমন্তী। ছোট থেকেই যে কোনও গাড়ির পিছনের সিট তার পছন্দ নয়। তাছাড়া মনে হল পিছনের সিটে কেউ একজন বসে আছে। সে খেয়াল করল না ভালো করে। পকেট থেকে স্মার্টফোন বের করে নিউজ স্ক্রোল করতে লাগল। একটা খবরে চোখ আটকে গেল।

কলকাতার বুকে এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটে চলেছে কয়েকমাস ধরে। এমন আহামরি কিছু নয়, তাও ভারী আগ্রহ জাগল হৈমন্তীর। খবরের সারমর্ম হল— পথচলতি মানুষের মধ্যে কারও কারও চোখে আচমকাই জাল পড়ে যাচ্ছে। হুঁশ থাকছে না, তারপর ঘণ্টাতিনেক পরে আবার রাস্তারই একপাশে জ্ঞান ফিরছে তাদের। যেন পথ চলতে চলতে আচমকা ঘুমিয়ে পড়েছিল। পকেট থেকে দামি ফোন, মানিব্যাগ কিছুই উধাও হয়নি। শরীরের কোথাও কোন জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। শুধু জীবন থেকে ঘণ্টাতিনেক সময় কাটা পড়ছে। জিনিসটা গুজবের মতো রটেছে, ক্ষয়ক্ষতি কিছু হচ্ছে না বলে পুলিশ এখনও পাত্তা দেয়নি।

আরও দু তিনটে খবরে চোখ বুলিয়ে একটা গান চালায় হৈমন্তী। জন ডেনভারের ভিজে হাওয়ার মতো গলা ভেসে আসে, —

I guess he'd rather be in Colorado
He'd rather spend his time out where the sky
looks like a pearl after a rain...

শহর কলকাতার বুকে ঘিঞ্জি আর ঘর্মসিক্ত মানুষের ভিড় মুছে গিয়ে বৃষ্টির ভিজে ছাপ লাগা পাহাড়ী জঙ্গল ভেসে ওঠে। বাসের হর্ণের বদলে বাজতে থাকে ডি মেজর। হৈমন্তীর মন ঠান্ডা হয়ে আসে।

Once again I see him walkin
Once again I hear him talking to the stars he makes
And asking them for bus fare...

কিছুটা তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, চোখ খুলে সামনে তাকিয়ে সে চমকে ওঠে, "এ কী! গোলপার্ক যাব বললাম যে, কোথায় যাচ্ছেন?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



সর্দার উত্তর দেন না, উত্তর আসে পিছন থেকে, "গাড়িটা উনি চালাচ্ছেন বটে কিন্তু নির্দেশ দিচ্ছি আমি..."

গলাটা চিনতে পারে হৈমন্তী, রিয়ার ভিউ মিররে তাকায়। পিছনে যে লোকটা বসে আছে তার নাকের উপরে একটা কাটা দাগ। মোটেই সুবিধের নয় মুখটা। তবে মুখটা চেনা, প্রাথমিক বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে হৈমন্তী বলে, "তুমি আমাকে ফলো করছ নাকি?"

— "মাথা খারাপ?" সুমিতের গলায় ব্যঙ্গর ছাপ, "তোমাকে যে অনুসরণ করবে সে নরকের দরজা অবধি পৌঁছে যাবে।"

— "তো? এই ট্যাক্সিটা কী আপাতত সেদিকেই যাচ্ছে?"

— "হ্যাঁ, তবে চিন্তা নেই। আবার ফিরেও আসবে।"

হৈমন্তী বুঝতে পারে একটা ধান্দা আছে সুমিতের। সে মুখ নিচু করে ফোনে কিছু ডায়াল করতে যাচ্ছিল। সর্দারের বাঁ হাতটা পাথরের মতো নেবে আসে। ছিনিয়ে নেয় ফোন'টা।

— "আহা গুরুজী! ওকে অমন জবরদস্তী করার দরকার নেই। ওর খুঁটি আমার কাছে বাঁধা আছে... ফোন'টা রাখতে দিন..."

ফোন'টা হৈমন্তীর কোলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ড্রাইভার। সেটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখে সে।

— "তুমি আমার সঙ্গে ঠিক করনি কিন্তু..."

— "কী ঠিক করিনি?" শান্ত গলায় প্রশ্ন করে হৈমন্তী।

— "আমাদের ব্যাপারটা শুরু হওয়ার সময় তোমার এইডস আছে সেটা আমাকে ভদ্রলোকের মতো জানানো উচিত ছিল।"

— "আমার এইডস নেই এখনও। এইচ.আই.ভি আছে।"

— "ওয়াটএভার, জানানো উচিত ছিল না?"

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে হৈমন্তী, তারপর কেটে কেটে উত্তর দেয়, "না জানানোয় কোনও ক্ষতি হয়নি তোমার..."

— "উই কিসড..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "তাতে এইচ.আই.ভি ট্রান্সমিট হয় না, অশিক্ষিতের মতো..."

— "শাট আপ। চুমু থেকে ব্যাপারটা আরও বেশিদূর গড়ালে কী হত তুমি বুঝতে পারছ?"

— "সেটা হতে পারে ভেবেই এগোতে দিইনি সম্পর্কটা..." কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বলে, "তারপর থেকে আর কোনও সম্পর্কই এগোতে দিই না, বন্ধু-বান্ধব, কলিগ... নাথিং..."

কয়েক সেকেন্ড কোনও উত্তর আসে না। গাড়ির চাকার শব্দ ছুটে চলে পিচের রাস্তার উপর দিয়ে।

— "তুমি যা করেছ সেটা লিগাল অফেন্স, এতবড় একটা রোগ লুকিয়ে..."

— "আমার হাঁপানি আছে, গাইনোকোলজিকাল সমস্যা আছে, পিরিয়ড হয় না ঠিকঠাক, সেসব বলেছি তোমাকে?"

— "হেল উইথ ইয়র পিরিয়ড..." সুমিতের গলায় একটা কর্কশ ভাব এসে মেশে, "শোনো, তোমার এক্সপ্ল্যানেশান আমার দরকার নেই। তোমাকে কেবল আমায় একটা কাজ করতে দিতে হবে। যদি না দাও তাহলে তোমার এই রোগের কথা কাল তোমার ময়লা নিতে আসা লোকটাও জেনে যাবে..."

— "কী কাজ? টাকাপয়সা চাইলে নেই আমার কাছে। তাছাড়া যেটা আছে সেটা দেওয়ার মতো নয়।" মিহি একটা হাসি ফুটে ওঠে হৈমন্তীর ঠোঁটে।

— "ঠিক সেটাই চাই আমাদের। রক্ত।"

— "রক্ত!" হৈমন্তী চমকে ওঠে, "আমার রক্ত? কী হবে? এন্ড ওয়াট ডু ইউ মিন বাই 'আমাদের'?"

— "সেটা তোমাকে না জানালেও চলবে আমার। জাস্ট তোমার কিছুটা রক্ত নেব আমরা, বেশি না। দু সিরিঞ্জ।"

— "কী হবে সেটা দিয়ে?"

সর্দারের মুখের দিক থেকে একবার চোখ ফিরিয়ে নেয় সুমিত, "দেয়ার ইজ আ কোম্পানি, ওরা তোমাদের মতো মানুষের রক্ত চাইছে।"

— "আমাদের বলতে এইচ.আই.ভি ইনফেক্টেড রক্ত?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "হ্যাঁ।"

— "কী হবে সেটা দিয়ে?"

সুমিতের গলা নরম হয়ে আসে, আরোপিত কর্কশভাবটা কমে আসে অজান্তেই, "ওরা রাস্তা থেকে লোক তুলে এনে তাদের শরীরে ওই ব্লাড ইঞ্জেক্ট করে ছেড়ে দিচ্ছে। লোকগুলো বুঝতেও পারছে না ওরা শরীরে এইচ.আই.ভি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে..."

ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে একটু সময় লাগে হৈমন্তীর, "কী লাভ হচ্ছে এতে ওদের?"

— "আমি জানি না..."

হৈমন্তী আর কিছু বলার আগেই একটা ছোট গলির সামনে এসে আচমকা ব্রেক কষে ট্যাক্সিটা। ওর মাথাটা সিটের পিছনে ঠুকে যায়।

— "উৎর আইয়ে... আরামসে..." দরজা খুলে দাঁড়ায় ড্রাইভার। তারপর এগিয়ে গিয়ে গলির ভিতরে ঢুকে পড়ে।

এতক্ষণে সন্ধ্যে কিছুটা গাঢ় হয়েছে। গলির ভিতরটা আধো অন্ধকারে ঢেকে আছে। তার ভিতর থেকে রেডিওর শব্দ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে সুর করে নামতা পড়ছে একটা বছর দশেকের ছেলে।

— "এসো আমার সঙ্গে..." হৈমন্তীর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয় সুমিত। হাতটা কিন্তু ধরে না হৈমন্তী। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামনে পা বাড়াতে বাড়াতে বলে, "ট্যাটুটা তোলনি এখনও?"

নিজের গলার ডেভিল ট্যাটুটার দিকে চেয়ে সুমিত হাসে, "তোলা এক হ্যাপা। তাছাড়া এখন নিজেকে ডেভিল এপ্রেন্টিস হিসেবে বেশ মানিয়ে যায়। তুমি তোলনি কেন?"

— "যার রক্তে বিষ আছে তার চামড়ায় কী থাকল তাতে কী যায় আসে?"

অন্ধকার গলির ভিতরে খানিকটা এগিয়ে একটা শাটারের তলা দিয়ে ঢুকে আসে তিনজনে। একটা ঢিমে হলদে আলো জ্বলছে ভিতরে। পাম্প চলার আওয়াজ আসছে একটানা। সেই বাচ্চা ছেলের নামতাটা মিলিয়ে এসেছে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



এতক্ষণে। ওষুধের গন্ধ আসছে কোথা থেকে।

কিছুটা এগিয়ে একটা ছোট সিঁড়ি আর করিডোর পার করে ডানপাশে ঝুলন্ত পর্দা সরিয়ে ফেলল সুমিত। ডানহাতের আংটি দিয়ে দরজায় বিশেষ কায়দায় টোকা দিল। হৈমন্তী বুঝল টোকাটাই পাসওয়ার্ড।

— "ও হেল্লো হেল্লো, আপনিই সেই হৈমন্তী ঘোষ?" দরজা খুলে যে ছেলেটা দাঁড়িয়েছে তাকে দেখে সদ্য কলেজ পাস করা কর্পোরেট সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে নেতাজির মতো গোল ফ্রেমের চশমা, সিঁথি করে আঁচড়ানো চুল, ভরাট মায়াময় মুখ।

— "শুদ্ধসত্ব..." আলাপ করিয়ে দেয় সুমিত, "এখানকার ব্যাপারগুলো ওই দেখাশোনা করে..."

একটা বড় হলঘর চোখে পড়ছে তার ভিতরে বেশ কয়েকটা বেড ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আছে। মর্গে লাশ কাটার টেবিলগুলোর মতো দেখতে অনেকটা। সেই ওষুধের গন্ধটা বেড়ে উঠেছে আগের থেকে।

— "বসুন না, প্লিজ..." ঘরের একধারে একটা অগোছালো করে রাখা চেয়ার দেখিয়ে দেয় শুদ্ধসত্ব, "আমাদের হসপিটালিটির অভাব বুঝতেই পারছেন, আসলে আমাদের কাজটা সবে শুরু, তাই একটু..."

— "আমাকে এভাবে এখানে ধরে আনার মানে কী?" চেয়ারে বসে প্রশ্ন করে হৈমন্তী। তার কপালের মাঝখান'টা জ্বালা করতে শুরু করেছে।

শুদ্ধসত্ব অবাক হয়, "সেকী! সুমিত, তুমি জানাওনি ওনাকে?"

— "জানিয়েছে, কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী? এভাবে মানুষের শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়ে লাভ কী আপনাদের?"

প্রশ্নটা শুনে খুশি হয় শুদ্ধসত্ব। প্রায় শিশুর মতো দৌড়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে এনে রাখে হৈমন্তীর সামনে, তারপর সেটার উপরে বসে পড়ে বলে, "আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, আপনার কখনও মনে হয়নি, এই যে রোগটা, এইডস... এটা খুব কম হচ্ছে। মানে একশো জনের মধ্যে প্রায়..."

— "ওয়াট দ্য হেল ইউ আর টকিং আবাউট?" রাগত গলায় প্রশ্ন করে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হৈমন্তী। চেয়ারের দুটো হাতল খামচে ধরে।

— "আবাউট ইউ মি...স ঘোষ... আপনি একবারও ভাবেননি যে দুর্ভাগ্যটা একা আপনার কেন হবে?"

— "না..." জোর গলায় বলে হৈমন্তী, "মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনাদের? আপনারা যা শুরু করেছেন তাতে কত মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে আইডিয়া আছে? টেরোরিস্ট আপনারা... আপনারা... আই উইল কল দ্য পুলিশ..."

হোহো করে হেসে ওঠে ছেলেটা, তারপর পকেট থেকে একটা ফোন বের করে একটা নম্বর ডায়াল করে। কল বাটান'টা দেখিয়ে হৈমন্তীর দিকে এগিয়ে দেয় সেটা, "নিশ্চয়ই জানাবেন পুলিশকে, তার আগে এই হসপিটালে ফোন করে বলুন তো যে আপনি এইচআইভি পজেটিভ... ইউ নিড ট্রিট্‌মেন্ট।"

ফোন'টা নিতে গিয়েও থেমে যায় হৈমন্তী।

— "কী হল? করবেন না কল?" শুদ্ধসত্ব আর একটু এগিয়ে আসে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় ফোন'টা, গনগনে গলায় বলতে থাকে,

— "আপনাকে যে এতদূর নিয়ে এলাম আমরা, চোখ বাধিনি, ফোন কেড়ে নিইয়নি, এমন কী আপনাকে এখান থেকে অক্ষত শরীরেই ফেরত দিয়ে আসব। এত কনফিডেন্স আমাদের আসে কোথা থেকে? আমরা কী করে নিশ্চিত হই যে আপনি পুলিশকে জানাবেন না? বলতে পারেন?"

হৈমন্তী উত্তর দেয় না। মাথা নামিয়ে নেয়।

ছেলেটা বলে চলে, "নিজের রোগটার কথা বলতে পারেন না কাউকে, কারণ আপনার এইচ.আই.ভি আছে জানামাত্র আপনার চরিত্র থেকে পাবলিক টয়লেটের গন্ধ পাবে লোকে, কাগজের অফিসে আপনার চাকরিটা চলে যাবে। আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবেন না, দোকানে গিয়ে সিগারেট কিনতে পারবেন না। রোগটা ধরা পরার পর একটা টেস্ট করেছিল আপনার বাড়ির লোক... আপনি ভার্জিন কিনা, মনে আছে?"

— "আছে..."

— "কীভাবে করা হয়েছিল সেটা?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হৈমন্তীর ঠোঁটটা কেঁপে ওঠে দু'বার। মুখে কথা ফোটে না।

— "ব্রাইট স্টুডেন্ট ছিলেন ছোট থেকে, সুন্দরী, ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন, গান গাইতে পারেন, ঝকঝকে স্মার্ট একটা মেয়ে। আপনাকে নিয়ে নিশ্চয়ই গর্ব ছিল আপনার মা-বাবার। সেই বাবার চোখে প্রকাশ্য ঘৃণা কেমন লেগেছিল আপনার? যে মায়ের শরীরের অংশ আপনি... আপনি জানেন আপনার জীবন বেশিদিন বাকি নেই, এই বাকি দিনগুলোও ভয়ে-ভয়ে কাটাতে হবে আপনাকে... তার চেয়ে না হয় খানিকটা শিক্ষা দিলেন এই সমাজটাকে..."

— "এসব বলে আপনি কী প্রমাণ করতে চাইছেন?"

— "যাদের আপনি বাঁচাতে চাইছেন তারা বাঁচানোর যোগ্যই না। এই সোসাইটি সেদিনই এই রোগটাকে মেনে নেবে সেদিন মড়কের মতো ছড়িয়ে পড়বে রোগটা।"

হাঁটুর উপর পা তুলে বসে হৈমন্তী, "তা না হয় হল। কিন্তু আপনাদের এতে লাভটা কোথায়? আপনাকে দেখে তো এইডস পেসেন্ট মনে হচ্ছে না, সেটা হলে আমাকে দরকার হত না।"

— "এত কথার কী মানে হয় আমি বুঝতে পারছি না।" সুমিত বলে "জাস্ট রক্তটা দিয়ে দাও, ব্যাস... ল্যাঠা চুকে গেল..."

— "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? টেরোরিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ তুমি?"

আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে হৈমন্তীর একটা হাত চেপে ধরে তাকে একধারে টেনে আনে সুমিত, তারপর চাপা গলায় বলে, "আমি হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছি। তোমার জীবনের ঠিক নেই, আজ আছো কাল নেই, তুমি মানিয়ে নিয়েছ সেটা, কিন্তু আমাকে বাঁচতে হবে। তোমার থেকে রক্তটা আদায় করতে না পারলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

— "আই ডোন্ট কেয়ার... আমি এতগুলো মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারব না। আর তুমি বেঁচে থেকেও এমন মহান কিছু তো করে ফেলছ না..."

— "রক্তটা তোমাকে দিতেই হবে হৈমন্তী। এখান থেকে তুমি সুঁচ না

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ফুটিয়ে বেরোতে পারবে না। প্লিজ, হাত জোড় করছি, অন্তত আমার প্রতি যে অন্যায়টা করেছ তার প্রতিদান হিসেবে..."

— "মানুষের মৃত্যু নিয়ে বার্গেন করব না আমি..."

হিংস্র একটা ধাক্কা দেয় সুমিত, "শালা নিজেও মরবে আমাকেও মারবে, এরা কত সাংঘাতিক লোক ধারণা আছে তোমার?"

হলঘরের উলটোদিকের দরজা খুলে দু'জন ষণ্ডা লোক বেরিয়ে আসে, দু'জনের গায়েই জামা নেই। হাত আর বুকের পেশিগুলো নিভন্ত টিউবলাইটের আলোতেও ঝকমক করে উঠছে। শুদ্ধসত্ব এতক্ষণে তার কোমরে বাঁধা ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ বের করে ফেলেছে। দু'জন লোককে পাশে নিয়ে এগিয়ে আসে হৈমন্তীর দিকে।

— "ভেবে নিন রক্তদান করছেন। ফর আ গ্রেট কজ..." বিড়বিড় করে শুদ্ধসত্ব। রক্তাভ হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো।

পিছন ফিরে হৈমন্তী দেখে একটা গ্রিলহীন খোলা জানলা আছে সেখানে। কিন্তু সেটা অবধি পৌঁছানর আগেই লোকগুলো ধরে ফেলবে ওকে। কোণঠাসা বিড়ালের মতো সে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। শুদ্ধসত্ব আরও কিছুদূর এগিয়ে আসে, "নাউ ডোন্ট ফাইট লিটিল বার্ডি।"

— "সিরিঞ্জটা আমাকে দিন..." হাত বাড়িয়ে দেয় হৈমন্তী, "আমার শরীর থেকে অন্য কাউকে রক্ত নিতে দেব না আমি।"

একটু ভাবে ছেলেটা, তারপর হাসিমুখে সিরিঞ্জ এগিয়ে দেয় হৈমন্তীর দিকে, "বেশ। তাই হোক..."

সিরিঞ্জটা হাতে ধরে আচমকাই নিজের ঘাড়ের কাছে বসিয়ে দেয় হৈমন্তী, তারপর গাঁথা অবস্থাতেই সেটা চালিয়ে দেয় নিজের বুক বরাবর, লম্বালম্বি হয়ে চিরে যায় অনেকটা। গলগল করে লাল রক্তের ধারা বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। সিরিঞ্জটা ছুরির মতো তুলে ধরে হৈমন্তী।

— "ফাকিং বিচ..." খিস্তি করে ওঠে সুমিত।

দু'জন লোক ওকে ধরতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। হৈমন্তীর হাতের সিরিঞ্জের

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



সূঁচ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সে রক্ত চামড়া ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু সঞ্চারিত হবে শিরায় শিরায়। লোক দুটো ভয়ে পিছিয়ে যায়।

জানলাটার কাছে গিয়ে সেটার উপর উঠে বসে হৈমন্তী। তারপর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা না করে ঝাঁপ মারে বাইরে।

মাটিতে এসে পড়ে হাঁটু আর মাথা দুটো একসঙ্গে ঠুকে যায়। তীব্র যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে সে। উঠে দাঁড়াতে একটু সময় নেয়।

উপর থেকে সুমিতের চিৎকার ভেসে আসে, "আজ তুমি পালিয়ে গেলে হৈমন্তী। বাট আই উইল ফাইন্ড ইউ। আমার হাত থেকে তুমি পালাতে পারবে না..."

সিরিঞ্জটা রাস্তার উপরে ছুঁড়ে ফেলে খোঁড়া পায়ে এগোতে থাকে হৈমন্তী, মাটির উপর পা'টা টেনে নিয়ে চলে কোনও মতে, দুর্বিষহ যন্ত্রণা উল্লসিত ধর্ষকের মতো মাটিতে টেনে ফেলতে চায় ওকে।

— "আর যেদিন তোমাকে খুঁজে পাব... আই উইল টিয়ার ইউ... তোমার মাথা আর ধড় টেনে আলাদা করে ফেলব আমি... ইউ ফিলথি হোর..."

## ষষ্ঠ অধ্যায়

মাথার উপরে তাকিয়ে আকাশটা দেখেই দৌড় মারে গনশা। কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে এককোণে। একটু আগে ঘাড়ের কাছে আলপিনের মতো ঠান্ডা স্পর্শ পেয়েছে। এইবার জোরে বৃষ্টি নামবে।

গড়গড় করে মেঘ ডেকে উঠল একবার। গনশা হাতের ব্যাগটা বাগিয়ে ধরে কোনওরকমে দৌড় দিল। মাছটুকুনি ভাসানবাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে পারলে গোটা পঞ্চাশটাকা বকশিশ পাওয়া যাবে। এমনিতে আজ বাজারে যাওয়ার কথা ছিল না। তার উপরে কাল বাজারের কাছে একটা লোক খুন হওয়ায়

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বেশিরভাগ দোকান খোলেনি। তাও পঞ্চাশটাকার লোভ সামলাতে পারেনি গনশা। পাথুরে রাস্তার উপর কালো বিদ্যুতের মতো দৌড়াতে লাগল সে।

ভাসানবাড়িতে যেতে ভালোই লাগে গনশার। সেখানে বকাবকি করার মতো কেউ নেই। যেখানে খুশি ঘোরাঘুরি করা যায়। শান্ত, নিরিবিলি।

খানিকটা দৌড়াতেই মেঘলা আলোয় জঙ্গলের দিকটা চোখে পড়ল গনশার। এই একচিলতে জঙ্গলটা ছোট থেকেই ওকে টানে। জঙ্গলের একটা বিশেষ জায়গার বেশ কিছুটা বাজ পড়ে কালো হয়ে গেছে। লোকে বলে কয়েকশো বছর আগে নাকি ভয়ানক একটা বাজ পড়েছিল ওখানে, তারপর থেকে কখনও গাছ গজায়নি জায়গাটায়।

গনশা এগোতেই যাচ্ছিল, এমন সময় ওর মনে হয় জঙ্গলের ভিতর থেকে কে যেন ডাকছে ওকে, নাকি হাওয়ার শব্দ?

বড়বড় ফোঁটায় এখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। গনশা সামনে হাঁটতে গিয়েও থেমে গেল, কেউ কী হেসে উঠল? জঙ্গলের ভিতরে অন্ধকার অংশটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল সে। মনে হল সত্যি কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওকে যেন কিছু বলতে চায় লোকগুলো। ভয়ে ভয়ে দৌড় দিল ভাসানবাড়ির দিকে।

কাকভেজা হয়ে কোনওরকমে হাতের ব্যাগটা খাবলে ধরে যখন বাড়ির গেট পেরল তখন মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। ঝমঝম শব্দে ভরে উঠেছে চারিদিক। নরম মাটির উপর কয়েক চিলতে জলাধার তৈরি হয়েছে। তার উপরে বৃষ্টির ফোঁটা বৃত্তাকার নকশা কেটেই নিজের খেয়ালে মুছে দিচ্ছে।

একতলার রান্নাঘরে এসে সে দেখতে পেল অশ্বিনীকে, হাতের ব্যাগটা সামনে তুলে ধরে বলল, "এনেছি দাদা, ভেজেনি..."

মটরশুঁটি ছাড়াচ্ছিল অশ্বিনী, মুখ তুলে চোখ গোলগোল করে বলল,

— "আর তুই ভিজে টইটুম্বুর হয়েছিস..."

নিজের কাঁধে পড়ে থাকা গামছাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল সে, "চান করে গা-হাত মুছে নে। আর দিদিমণিকে ডেকে দে তো..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



স্নানঘরের দিকে যাচ্ছিল গনশা, একটু থেমে কী যেন ভেবে বলল,

— "আমি আর পুরানবাসা দিয়ে আসব না দাদা, ও জঙ্গলে কিছু আছে।"

— "জঙ্গলে! কী আছে?" চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করে অশ্বিনী।

— "জানি না, কে যেন হাসছিল আজ। স্পষ্ট শুনতে পেলাম... ওখানে কী হয়েছিল বলতো?"

অশ্বিনী একটু ভেবেচিন্তে বলে, "শুনেছি তো বাজ পড়েছিল একবার।"

— "তাতে লোক মরে গেছিল?"

— "যেতে পারে। কেউ হয়তো কাঠ কাটতে গিয়েছিল তখন। কেন রে?"

গনশা কিছুক্ষণ থম্ মেরে থেকে বলল, "আজ মনে হল ওখানে দাঁড়িয়ে কারা যেন হাসছিল..."

— "এ আর এমন কী? ও জঙ্গলে তো কত লোকে কাঠ কাটতে যায়, তাদের কেউ হাসছিল হয়তো..."

গনশার পছন্দ হয় না উত্তর, "না দাদা, অমন হাসি নয়, মনে হল যেন..."

— "আঃ" বিরক্ত হয় অশ্বিনী, "ঠান্ডা লাগবে এবার, যা স্নান করে নে..."

গনশা আর প্রশ্ন না করে সরে পড়ে। অশ্বিনী নির্বিকার মুখ করে মটরের বাটি সরিয়ে গনশার আনা মাছের ব্যাগটা টেনে নেয়।

আজ অন্য রান্না হওয়ার কথা ছিল। সেই মতোই বাজার করা হয়েছে, কিন্তু সকাল থেকে গ্রাম কাঁপিয়ে বৃষ্টি এসে পড়ায় খিচুড়ির তোড়জোড় শুরু হয়েছে, সেই সঙ্গে ইলিশ মাছ।

গ্রামের কোথাও ভীষণ শব্দ করে একটা বাজ পড়ল। পায়ের নিচের মাটি হাফ ইঞ্চি কেঁপে উঠল তাতে। অশ্বিনীর মুখে কিন্তু কোনও পরিবর্তন এল না। অম্লান বদনে চালে-ডালে মেশাতে লাগল সে।

এদিকে রান্নাঘরের জানলায় বাইরের পেয়ারা গাছের পাতা ভিড় করে এসেছে। বাইরের বৃষ্টির জল পাতা চুঁইয়ে এসে পড়ছে স্টোভের ঠিক সামনে'টায়। ভিজে মাটির গন্ধ ভেসে আসছে সেই সঙ্গে, নরম চালের গন্ধ, পুরনো বাড়ির ভাঙা ইঁটের গন্ধ... অশ্বিনীর কোনওদিকে খেয়াল নেই... যেন

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



এসব কিছুরই কোনও গুরুত্ব নেই তার কাছে।

— "দিদিমণি তো ঘরে নেই..." পেছন থেকে গনশার গলা পেয়ে মুখ ঘোরায় অশ্বিনী, "চানঘরে আছে তাহলে..."

— "দরজা খোলা... নেই তো..."

উঠে দাঁড়ায় অশ্বিনী, "নেই মানে? কোথায় গেল? বাইরে এত বৃষ্টি, গ্রামের কিছু চেনে না..." বিড়বিড় করে নিজের মনেই কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে উপরে। হৈমন্তীর ঘরের সামনে এসে একবার ভিতরে উঁকি দেয়। কেউ নেই। বিছানার চাদর এলোমেলো। যেন হঠাৎ করেই কোনও কারণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে সে। এমন কি ঘরের ঠিক সামনে চটিটা পর্যন্ত পড়ে আছে। জোলো হাওয়ায় বয়ে আসা ছাটে ভিজে উঠছে বিছানাটা।

অশ্বিনী আর গনশা মিলে বন্ধ করে দেয় খোলা জানলাগুলো। সেগুলো বন্ধ হতেই ছাদের দিক থেকে একটা ধুপধাপ আওয়াজ ভেসে আসে।

অশ্বিনী ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, "ছাদে গেছে মনে হয়। উপরে আয় তো একবার।"

তিনতলার শেষ সিঁড়িটা টপকাতেই হৈমন্তীকে দেখা যায়। তার গায়ে কাল রাতের পোশাক। ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। মাথার চুল বেয়ে কোমরে নেমে আসছে জলের স্রোত। অশ্বিনীদের দিকে পেছন করে ছাদের পাঁচিল ধরে দূরের দিকে চেয়ে আছে সে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে পড়ে ওরা দু'জনে। বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টির ঝমঝমে আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না। ভিজে হাওয়ার ধাক্কা লাগছে গায়ে, অশ্বিনী শালটা ভালো করে গায়ে চাপিয়ে নেয়।

কিছুক্ষণ পরে নিজে থেকেই পিছন ঘোরে হৈমন্তী। ওদের দু'জনকে সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে হাসে, মুখের জলটা মুছে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পরক্ষণেই অবাধ জলের ধারা এসে আবার ভিজিয়ে দেয়।

— "আজ শরীর ভালো আছে মনে হচ্ছে..." অশ্বিনী বলে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "তা আছে, এখানে যা রাজার হালে রেখেছ..." হৈমন্তী হাসে, "বাড়িতে থাকলে নিজের কাজ নিজেকেই করতে হত, এখানে এমনিতেই শরীর ভালো হয়ে যায়।"

অশ্বিনী মাথা দোলায়, "তা যায় বটে, কিন্তু এমন হুটহাট এদিক-ওদিক চলে যাবেন না। এ জায়গাটা ইদানীং ভালো নেই আর। একটা খুন হয়ে গেছে। আজ গনশা আবার জঙ্গলে কাকে যেন হাসতে শুনেছে..."

— "ইদানীং বলতে আমি আসার পর থেকে, তাই তো?" হৈমন্তী এগিয়ে আসে ওদের দিকে, "তবে আর বেশিদিন নেই আমি।"

— "মানে?" অশ্বিনী মুখ তুলে প্রশ্ন করে। জলের শব্দে তার কথাটা অস্পষ্ট শোনায়, "আপনি তো দু'সপ্তাহ থাকবেন কথা ছিল..."

ছাদের মেঝেতেই বসে পড়ে হৈমন্তী, "নাঃ, যে কাজে এসেছিলাম সেটা আদৌ হবে বলে মনে হচ্ছে না। এ বাড়িটা পুরানো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিহাসের কোনও চিহ্নই আর নেই এখানে।"

অশ্বিনীকে একটু চিন্তিত দেখায়। হৈমন্তী মেঝের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে, "একবার তোমার বাবা, মানে নিবারণবাবুর সঙ্গে দেখা করলে হত। কিন্তু তা তো আর হচ্ছে না, অগত্যা..."

এই সময়ে গনশা মুখ ফুটে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, অশ্বিনী তাকে থামিয়ে দেয়, "বেশ, তো কবে ফিরছেন?"

— "কাল প্রোব্যাবলি।"

— "ট্রেনের টিকিট কেটেছেন?"

— "হ্যাঁ, অনলাইনে বুক করলাম।"

অশ্বিনী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়েও আবার বন্ধ হয়ে এল। ব্যাপারটা চোখে পড়ে হৈমন্তীর। সে বলে, "কিছু বলতে যাচ্ছিলে মনে হল..."

— "হ্যাঁ।" গম্ভীর গলায় বলে অশ্বিনী।

— "বলো।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "হ্যাঁ, কেন জানব না? ওই গোলামাঠের ভিতরে একটা গলি আছে, ওটা দিয়ে হেঁটে..."

— "আচ্ছা পরে বলিস না হয়, এখন চল নিচে যাই।"

চুল থেকে জলটা নিংড়ে নিয়ে আবার সেটা পিছনে ঠেলে দেয় হৈমন্তী, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, ভালো কথা, যাবার সময় বলে গেল আমার জন্যে খিচুড়ি ইলিশ মাছ হচ্ছে, ও নিজে খাবে না মনে হল..."

— "না। দাদা মাছ মাংস খায় না।"

— "সে কী! ব্রত করে নাকি? কিন্তু রান্না তো করছে।"

— "রান্না করে, খায় না। আমাকে একবার মাংস করে খাইয়েছিল। খুব ঝাল দেয়। কিন্তু খেতে খুব ভালো দিদি।"

— "বটে..."

নিচে নেমে নিজের ঘরে ফিরে এল হৈমন্তী। টুপটুপ করে শরীর থেকে জল পড়ে চলেছে একটানা। পায়ে পায়ে জলের দাগ এগিয়ে চলেছে। হৈমন্তী এসে ঢুকল ঘরের ভিতরে। বাইরে আকাশে মেঘ গুড়গুড় করছে। যেন এখুনি একটা বড়সড় বাজ পড়বে, তার প্রস্তুতি চলছে।

কাল রাতে ঘুমটা ভেঙে যেতেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে হৈমন্তী। এই দু'দিনে এই জায়গাটার উপর, বাড়িটার উপর একটা অলুক্ষুণে মায়া পড়তে শুরু করেছে তার। এমন কি এই বাড়ির ছাদ থেকে যে আকাশটুকু দেখা যায় সেটাও, অত দূর থেকেও যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

হৈমন্তী জানে– টান ভালো নয়।

নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছিল কোনও টানকে আর প্রশ্রয় দেবে না। সামান্য শিকড় গজালেই উপড়ে ফেলবে চারাগাছ।

ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে একতলা থেকে। লাল, কড়া করে ভাজা মাছগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই গন্ধটাকে ঘায়েল করতেই একটা সিগারেট ধরাল সে। আমেজে টান দিতে লাগল। সাদা মিহি ধোঁয়ার রেখা বেরিয়ে এসে জানলা দিয়ে মেঘের সঙ্গে মিশে উড়ে যেতে লাগল

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আপনার জন্য খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ হচ্ছে আজ, ভেজা হয়ে গেলে নিচে চলে আসবেন।"

কথাটা বলে আচমকাই উঠে দাঁড়ায় অশ্বিনী। আর কোনও কথা না বলে গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। গনশাও তার দেখাদেখি উঠে যাচ্ছিল। হৈমন্তী থামিয়ে দেয় তাকে। হাত ধরে একটা টান দিয়ে বলে,

— "এই তুই যাচ্ছিস কোথায়? আয় ভিজবি আয়..."

প্রবল ঘাড় নাড়ে গনশা, "না, আমার ঠান্ডা লাগবে।"

— "এঃ, গ্রামের ছেলে, মাঠ ঘাটে চষে বেড়ায়, আর বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগবে! আয় বলছি..."

একটানে হাত ছাড়িয়ে নেয় গনশা, "না, দাদা বকবে।"

গনশার হাতে হৈমন্তীর নখের আঁচড় লাগে, সে সিঁড়ির উপরে এসে বসে মুখ বাড়িয়ে হাতটা দেখার চেষ্টা করে, "রক্ত বেরচ্ছে?"

— "না।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় গনশা।

— "ঠিক তো?"

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে দেখায় গনশা। হৈমন্তী নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ভেজা চুলগুলো বুকের উপরে এনে বলে, "আচ্ছা, তোর এই দাদা এখানে কতদিন হল আছে রে?"

— "আগের মঙ্গলবার এসেছে।"

— "সেকী!" থমকায় হৈমন্তী, "হাবভাব দেখে মনে হয় অনেকদিন ধরে আছে। তার আগে দেখিসনি কোনওদিন?"

— "দেখেছি, নিবুকাকার সঙ্গে আসত এখানে, মাঝে মাঝে।"

— "জন্ম থেকেই দেখছিস?"

— "না, আগে অন্য কোথাও থাকত। কিন্তু দাদা এখানে সবকিছু চেনে..."

— "তাই তো দেখছি। আচ্ছা এই নিবুকাকাকে তুই ছোট থেকে দেখছিস?"

— "নিবুকাকা?" গনশা হাসে, "হ্যাঁ, ছোটবেলায় তো পড়াত আমাকে।"

— "ওদের বাড়িটা কোথায় তুই জানিস?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "হ্যাঁ বল।"

— "আজ পারলে একবার নিবারণকাকার সঙ্গে দেখা করে আয়। উনি ঠিক কী বলতে চাইছেন ভারী জানতে ইচ্ছা করছে।"

— "বেশ, বৃষ্টি থামলে যাব বিকেলের দিকে।"

আরও দু-একটা কথা বলে ফোন'টা রেখে দেয় অস্মিতা। শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হৈমন্তী।

চোখে পড়ে খানিক দূরে কাঁচা মাটির রাস্তার উপর দিয়ে একটা বছর বারোর ছেলে বোনকে সাইকেলের পিছনে বসিয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজছে তারা দু'জনেই। দাদা সাইকেল চালাচ্ছে আর বোন অকারণেই টুংটুং করে বেল বাজাচ্ছে। একটা মুড়িওয়ালাকে পাশ কাটিয়ে গেল তারা। তার মাথায় মস্ত ধামা। তাদের থেকে কিছু উপরে একটা বাড়ির ছাদে করগেট শেডের তলায় কাসুন্দি শুকাতে দিয়েছে কেউ। সেই বয়ামের উপরে মাঝে মাঝে চড়াই পাখি এসে বসছে আর ঠোঁট দিয়ে টোকা দিয়ে বয়াম খোলার চেষ্টা করছে।

জায়গাটা ঠিক অজগ্রাম নয়, তাও একটা গ্রাম্য প্রশান্তি আছে এখানে। কী খেয়াল হতে একটা কাগজের প্লেন বানালো হৈমন্তী। পেন দিয়ে তার উপরে নিজের নাম লিখল, "হৈম"। তারপর জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সেটা সজোরে উড়িয়ে দিল আকাশের দিকে।

— "যাঃ, উড়ে যা..." বিড়বিড় করে বলল সে।

প্লেন'টা খানিক ওড়ার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু অজানা জগতের ভয় পেয়েই হয়তো আবার নেমে আসতে লাগল নরম মাটির দিকে। প্লেন'টা খুশি হয়েছে কিনা বোঝা গেল না। হৈমন্তী তার ডানার দিকটা দেখতে পাচ্ছে, মুখের দিকটা নয়। বৃষ্টিতে ভিজে গেল কাগজটা।

— "নিচে যাবে দিদি? না এখানে খাবার দিয়ে যাব?" গনশা এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। মনে হয় হৈমন্তীর প্লেন ওড়ানো দেখে মনে মনে একচোট হেসে নিয়েছে। হৈমন্তী খানিক লাজুক মুখে বলল, "না না, দিয়ে যাবি কেন? আমি যাচ্ছি নিচে।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কোনও এক অজানার উদ্দেশে।

হৈমন্তীর ফোন'টা বেজে উঠল রিনরিন শব্দে। অস্মিতা ফোন করেছে, লাফিয়ে জানলার কাছে গিয়ে ফোন'টা রিসিভ করল সে, নেটওয়ার্ক প্রায় নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তাতে বৃষ্টির ফোঁটার মতোই ঝিরঝিরে খাপছাড়া কথা শোনা যাচ্ছে, — "শোন ভাই, নিবারণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর?"

— "না তো, উনি তো অসুস্থ।"

— "কান্ট হিয়ার ইউ, যাই হোক। সপ্তাহখানেক আগে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন ভদ্রলোক। পোস্ট অফিসের কৃতিত্বে আজ এসে পৌঁছাল। চিঠিটা খুব ছোট। তবে পড়ে মনে হল মানুষটা কোন একটা কারণে ভয় পেয়েছেন। স্পেশালি তোকে যেতে বারণ করছে, গেলেও বলেছেন যেন হোটেল ভাড়া করে থাকিস। ভাসানবাড়িটা সেফ নয়।"

আরও কিছু বলছিল অস্মিতা, সবটা কানে আসে না হৈমন্তীর, সে প্রশ্ন করে, "সেফ নয় মানে? ভেঙে পড়বে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

— "তা জানি না, তবে নিবারণকাকা কোন কারণ না থাকলে বারণ করার মানুষ নয়।"

— "আচ্ছা আমি কাল ফিরে যাচ্ছি। আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব না হয়। বাই দ্য ওয়ে, নিবারণকাকার ছেলেটি ভারী ইন্টারেস্টিং।"

এবার ওপাশের গলায় সন্দেহের আভাস ধরা পড়ে, "কেমন ইন্টারেস্টিং? ছকটক নেই তো?"

— "ধুর, তবে বেশ খাতির-যত্ন করছে আমার।"

— "গ্রেট, আসার সময় হাত ভরে বকশিস দিয়ে আসিস।"

বকশিসের কথায় মন'টা খারাপ হয়ে গেল হৈমন্তীর। অশ্বিনীর সঙ্গে কথা বলে মনে হয় না টাকাপয়সা কিংবা অন্য কোনওরকম চাহিদা তার আছে বলে। ছেলেটা অদ্ভুত, সন্দেহ নেই। যদি ভিতরে লোভ কিংবা উদ্দেশ্য থেকেও থাকে সেটা এত সহজে বোঝা সম্ভব নয়।

— "আর শোন," অস্মিতা এখনও কাটেনি ফোন'টা।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



নিচে নেমে বড় ঘরটার কাছে পৌঁছে হৈমন্তী দেখে ঘরের একেবারে মাঝামাঝি তিনটে আসন পাতা রয়েছে। মাঝের কল্কিকাটা আসন'টা। তার জন্য। সেটার উপরে গিয়ে বসে পড়ে হৈমন্তী। কয়েক মিনিট পরে তার সামনে খাবারের থালা রেখে যায় অশ্বিনী। গন্ধে ম্-ম্ করে ওঠে ঘরটা, হৈমন্তীর জিভে জল এসে যায়। একটু বাঁকা সুরে সে বলে, "তোমার রান্নার এমন হাত আছে জানলে আরও ক'দিন থেকে যেতাম এখানে... নেহাত ট্রেনের টিকিটটা কাটা হয়ে গেছে...।"

একটু আগে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল অশ্বিনীকে। এখন তার মুখে আবার সেই উজ্জ্বল ভাব ফিরে এসেছে, খিচুরির হাঁড়িটা হৈমন্তীর সামনে রেখে সে বলে, "তাহলে আজ বেশি করে খান না হয়। আবার কবে আসবেন তো ঠিক নেই।"

হৈমন্তী অশ্বিনীকেও খেতে বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মনে পড়ল সে নিরামিষাশী। হয়তো আমিশ খাবারের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে একসঙ্গে খায় না। এক চামচ খিচুড়ি মুখে দিয়ে সে বলে, "ভালো কথা, তুমি নাকি মাছ মাংস খাও না। কোনও ঠাকুরের ব্রত আছে নাকি?"

অশ্বিনী ঘাড় নাড়ে, "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। কিন্তু খাদ্যের জন্য পশুজন্তুর মৃত্যু আমার পছন্দ নয়।"

— "তাহলে রান্না করলে যে..."

বাইরে থেকে গমগম করে একটা শব্দ আসে। যে বাজের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল সেটা এতক্ষণে ষোড়শপচারে পড়তে চলেছে।

— "মাঝে মাঝে আমাদের হত্যা করতে হয়। ভালো না লাগলেও করতে হয়, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে, জানেন না?

সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালোভৌঃ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুধ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।"

— "বাবা! ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই এদিকে গীতা পড়েছ!"

হাসির রেখা ফোটে অশ্বিনীর মুখে, "আমার সময়ের অভাব নেই, তাই সব

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



পড়ে ফেলি।"

— "তা অর্জুনকে তো কৃষ্ণ ধর্মরক্ষার্থে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি কী রক্ষা করছ শুনি?"

অশ্বিনী মুখ তুলে তাকায়, আর সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী ছিটকে পড়ে আসন থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কানে তালা লেগে যায় তার। মাথাটা ঠুকে যায় মেঝের উপরে। বাড়ির একবারে পাশেই একটা বাজ পড়েছে। উপর তলা থেকে সশব্দে কিছু মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। সম্ভবত ছাদ থেকে কয়েকটা ইট খসে পড়ে নিচে। গোটা গ্রামটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে বাজটা। শুধু একজনকে ছাড়া। সে এখনও আগের মতোই মেঝের উপরে বসে আছে। এই উন্মাদ বজ্রপাত তাকে এক বিন্দু টলাতে পারেনি।

— "শিট! আমার ল্যাপটপটা..." হৈমন্তীর মনে পড়ে টেবিলের উপরে ল্যাপটপটা রেখে নিচে এসেছিল সে। বাজ পড়ে বাড়ি কেঁপে ওঠায় সেটাই হয়তো নিচে এসে পড়েছে। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে সে। নিজের ঘরে ফিরে এসে নিশ্চিত হয়।

ল্যাপটপটা টেবিলের উপরেই আছে। শুধু জানলার বিমের উপরে ফোন'টা নেই। জানলার কাছে এসে নিচে তাকায়। নাঃ কোথাও চিহ্ন নেই ফোন'টার। নির্ঘাত সেটা নিচে গিয়ে পড়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তবে সেটা আর উদ্ধার করেও লাভ নেই। এতক্ষণে গুঁড়ো হয়ে গেছে হয়তো।

হতাশ হয়ে মুখের সামনে থেকে চুল সরায় হৈমন্তী। উপরে তাকাতেই অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। জানলার বাইরের উপরের দিকের একটা ছোট অংশের ইট খসে পড়েছে। শতাব্দী প্রাচীন পাঁজরের সিমেন্ট আর বালি উঁকি দিচ্ছে সেখান থেকে।

কিন্তু সেগুলো ছাড়াও আরও একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে সেই ফাঁকে। একটা প্রায় ইঁটের সাইজেরই পেতলের বাক্স। তার উপরে কিছু রঙিন পাথর বসানো।

প্রায় দেড়শ বছর ধরে ভাসানবাড়ির দেওয়ালের গাঁথনিতে বন্দি হয়ে ছিল বাক্সটা...

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# সপ্তম অধ্যায়

— "নিতে ও নিতে" বটতলার কাছে এসে ডাক দেয় নিবারণ। নিতাইচরণ সাড়া দেয় না। দিঘির পাড় ঘেঁষে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে যেন, অথচ এখন বিকেলও হয়নি। আজ কৌশিকি অমাবস্যা, তায় সূর্যগ্রহণ লেগেছে। নিতাইয়ের বাড়ির লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ফলে বাড়িতে বসে সূর্যগ্রহণ দেখায় বাধা আছে। লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিবারণের বাড়ির সামনে গাছতলার অন্ধকারে গা ডুবিয়ে সূর্য দেখছে সে।

অবাক হয়ে আকাশের বুকে চোখ রেখেছিল সে — ওই একটা অন্ধকার ছায়া এসে ঢেকে ফেলল সূর্যটা। এমন কিছু কি আছে তাহলে, যে মস্তবড় সূর্যটাকেও ঢেকে ফেলতে পারে?

এমন সময়ে নিবারণের ডাক কানে আসে তার, "আরে এই নিতে, তোকে বড়বাড়ির কবরেজ ডাকে, চ..."

বড়বাড়ির কবরেজ মানে শশাঙ্কমোহন। লোকটাকে ভালোই লাগে নিতাইয়ের। কিন্তু এখন সূর্যগ্রহণ ছেড়ে একটুও যেতে ইচ্ছা করে না তার। মুখ না ঘুরিয়েই বলে, "বইলা দে এখন নিতে যাবা না, গরহন লাগতাসে..."

প্রশ্নের উত্তর মজুত ছিল নিবারণের, "কবরেজ বলেছে দূরবীন দিয়ে দেখাবে, আরও ভালো দেখতে পাবি।"

রাজি হতে আর দেরি হয় না নিতাইয়ের। চট করে নিবারণের ভাঙা সাইকেলে উঠে পরে সে। ঘটঘট শব্দ করে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে গড়াতে থাকে সাইকেল। মিনিট দশেক পর ভাসানবাড়ির দালানে পৌঁছে থামে সেটা। আকাশ তখনও আরও খানিকটা অন্ধকার হয়েছে।

বৃদ্ধ শশাঙ্কমোহনের পাখির শখ। গোটা ভাসানবাড়িতে রঙবেরঙের পাখির আনাগোনা। তাদের যত্ন নেন তিনি। খেতে দেন, জলের বাটি রেখে আসেন

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ছাদে। বিয়ে-থা করেননি। পাখিদের নিয়ে সংসার। তবে এদের মধ্যে কেউই খাঁচায় থাকে না। রোদ মেখে এসে বসে জানলায়, ছাদের পাঁচিলে, কিচিরমিচির শব্দে বৃদ্ধের খবর নেয়, তারপর উড়ে যায় ইচ্ছা মতো।

দু'জনকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেই শশাঙ্কমোহনের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে, "এসো, এসো কত্তা, ওই জানলায় দাঁড়িয়ে এই দূরবীন'টা বাগিয়ে ধরো তো দেখি, ব্যাটাচ্ছেলে সূর্যটাকে ধরতে পারো কিনা।"

টেবিলে রাখা দূরবীন'টা দেখিয়ে দেন শশাঙ্কমোহন। নিতাই সেটা নিয়ে এগিয়ে যায় জানলার দিকে। নিবারণ মেঝেতেই বসে পড়ে। তার আকাশ নিয়ে অত আগ্রহ নেই। সে এ বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় থাকে। কত্তাবাবুর যত্ন নেয়। শশাঙ্কমোহনের বয়স হয়েছে। তাছাড়া ইদানীং চোখেও কিছু কম দেখেন। তাকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামায়, জল এনে দেয়, বাজার করে দেয়। নিবারণকে বড় ভালোবাসেন শশাঙ্কমোহন।

তিনি ধমক দেন, "কতবার তোকে বলেছি মেঝেতে বসবি না। এ বাড়িতে এত খাট বিছানা, চেয়ার টেবিল, আর তুই শুধু মেঝেটাই দেখতে পাস?"

— "আমার এখানে বসেই শান্তি কত্তাবাবু।" একগাল হেসে মেঝের উপর ঝুঁকে বসে নিবারণ।

জানলায় নিতায়ের দিকে চোখ ফেরান তিনি, "এই ব্যাটা সারাক্ষণ মাটিতে রয়েছেন আর উনি তাকিয়ে থাকেন আকাশে... হ্যাঁ রে," শশাঙ্কমোহন গলা তুলে বলেন, "তোর বাড়িতে কিছু বলে না?"

অন্যমনস্ক হয়েই উত্তর দেয় নিতাই, "বলে তো..."

— "জানেন কত্তা, ও একবার আকাশ দেখতে দেখতে ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছিল," খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে ওঠে নিবারণ।

এইবার চোখ ফিরিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে নিতাই, "সমুন্দির ব্যাটা, যেইটা বুঝো না, সেইটা লইয়া বেশি কথা কয়ো না, সেদিন রাইতে আমি যা দেখসিলাম সেইটা দেখলে তোমার মাথায় আউলা লাগি যাব।"

— "কী দেখেছিলি?" শশাঙ্কমোহন প্রশ্ন করেন।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



মুখ ফিরিয়ে দূরবীনে চোখ রাখে নিতাই, "একখান আগুনের গোলা, আকাশের একপেরান্ত থেকে আর একপেরান্তে চইলা গেল। ঠিক জ্যান একখান আলোর কাঁটা..."

— "হ্যালিস কোমেট!" উৎসাহিত হয়ে ওঠেন শশাঙ্কমোহন, "কিন্তু..." পরের কথাগুলো মনে মনে বলেন তিনি, "সে তো উনিশশো দশে এসেছিল, আবার পঁচাত্তর বছর পরে, মানে উনিশশো ছিয়াশি নাগাদ আসবে। এখন সবে সত্তর।"

থমথমে মুখে বসে থাকেন শশাঙ্কমোহন। বাড়ির কোথাও থেকে তার প্রিয় ময়নাটা ডাকতে শুরু করেছে। কিন্তু সেটাও কানে যায় না শশাঙ্কর। তবে কি অন্য কোন ধূমকেতু দেখেছে নিতাই? কিন্তু খালি চোখে পৃথিবী থেকে এমন স্পষ্ট করে আর কোন কমেট তো দেখা যায় না।

নিতাইয়ের কাছে এগিয়ে যান তিনি, মাথায় একটা হাত রেখে বলেন,

— "শোন্, তোকে একটা বুদ্ধি দিই আমি, তাতে তোর বাড়ির লোকও খুশি হবে, তুইও দু পয়সা ইনকাম করতে পারবি..."

— "কী?"

— "বাড়ি গিয়ে তুই বল যে কাল রাতে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিস, তুই গ্রহ-নক্ষত্র হিসেব করে মানুষের ভাগ্য বলে দিতে পারিস।"

চাপা হাসি হাসে নিতাই, "কী যে কয়েন কত্তা... আমি কি ওসব পারি?"

— "উঁহু, তোকে পারতে কে বলেছে? ওসব বুজরুকি, আমি জানি। কিন্তু ভেবে দেখ, তুই সারাদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেও কেউ বাধা দেবে না, পয়সা কড়ি কামাবি, মান-সম্মান পাবি..."

নিতাই মাথা নাড়ে, "না, বাপ বলসেন মিথ্যা কওয়া আর চুরি করা পাপ..."

মেঝের উপরে হাঁটু রেখে বসে পড়েন শশাঙ্কমোহন, "বল দেখি এই দুনিয়াতে সব থেকে বড় চোর কে?"

— "কে?"

— "তুই যার দিকে তাকিয়ে আছিস সে..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "সূর্য?" অবাক বিস্ময়ে বলে নিতাই।

শশাঙ্কমোহন তার পিঠে একটা চাপড় মারেন, "শনির যেমন একটা বলয় আছে না? আমাদের এই সৌরজগতেরও একটা বলয় আছে। একটা বিরাট বড় রিং, বুঝলি? ঠিক যেন নিজের ছানাপোনা আর বাড়িকে ঘিরে একটা পাঁচিল দিয়ে রেখেছে সুজ্যিমামা। এই পাঁচিলকে বলে উরস ক্লাউড...;" চোখ বড়বড় করেন শশাঙ্কমোহন, "এখন গোপন কথা হল আমাদের এই গুরুগম্ভীর ঋষিসুলভ সূর্য এই গোটা রিঙটা অন্য গ্রহের থেকে চুরি করে এনেছিলেন... অন্য নক্ষত্র থেকে ধূমকেতু চুরি করে এনে রেখেছিলেন নিজের পাশে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই রিংটা বড় হতে হতে এখন অনেকটা দূরে চলে গেছে। তবে গোল করে ঘিরে রেখেছে এখনও..."

সমস্ত ব্যাপারটা বোঝে না নিতাই। শশাঙ্কমোহন এবার নিবারণের দিকে সরে আসে, "ওর তো না হয় আকাশ দেখে পেট চলে যাবে, তোর কী হবে?"

কী উত্তর দেবে বুঝে পায় না নিবারণ, ফিক্ করে হেসে দেয়। শশাঙ্কমোহন তার পাশেই মেঝেতে বসে পড়ে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলেন, "আমার তো বয়স হয়েছে, আজ আছি কাল নেই। আমি হুট করে চলে গেলে তুই এই বাড়ির দেখাশনা করবি, বুঝলি?"

নিবারণের হাসিটা নিভে আসে।

— "কী রে, পারবি না? আমার দেখাশোনা তো বেশ করিস, বাড়িটার যত্ন নিতে পারবি না?"

উপরে নিচে মাথা দোলায় নিবারণ, "হ্যাঁ, পারব কত্তা।"

শশাঙ্কমোহন খুশি হন, "পারবি যখন তোকে একটা কথা বলি তাহলে।"

নিবারণ উত্তর দেয় না, শশাঙ্কমোহন বলে যান, "নিতাই সেদিন যেটা দেখেছিল সেটাকে হ্যালির ধূমকেতু বলে। প্রতি পঁচাত্তর বছর পরে পৃথিবীর কাছে আসে। তখন কিছুক্ষণের জন্য মাত্র তাকে দেখতে পায় পৃথিবীর মানুষ। আজ থেকে নয় কিন্তু। লক্ষলক্ষ বছর ধরে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে চীনারা দেখেছে, ব্যাবিলনিয়ানরা দেখেছে, ইনকারা

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



দেখেছে, রোমানরা দেখেছে, লিখেও রেখেছে আকাশে অদ্ভুত আলোর কথা। কিন্তু একটাই ধূমকেতু যে বারবার ফিরে আসছে সেটা তারা বুঝতে পারেনি। শেষে অ্যাডমন্ড হ্যালি নামে এক বিজ্ঞানী এইসব লেখার মধ্যে থেকে ধরতে পারলেন ব্যাপারটা। ভাবলেন, উঁহু এত মিল তো আলাদা আলাদা ধূমকেতুতে থাকতে পারে না। ইনি তাহলে একই ব্যক্তি, শুধু এতটা সময়ের ব্যবধানে দেখা যায় যে একটা সভ্যতার মানুষের পক্ষে তাকে চিনতে পারা সম্ভব নয়, তার নাম থেকেই ধূমকেতুর নাম দেওয়া হয়... এখন..."

কিছুক্ষণ থেমে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে পরের কথাগুলো বললেন শশাঙ্কমোহন, "আমাদের এই ভাসানবাড়িতেও এমন অনেক অচেনা ধূমকেতু আসে। বারবার, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, তাদের আমরা দেখি, অনুভব করি, কিন্তু তারা যে একই মানুষ সেটা আমরা বুঝতে পারি না, তুই যদি অনেকদিন এ বাড়িতে থাকিস তাহলে একদিন চিনতে পারবি তাদের... কেমন?"

গোটা ব্যাপারটা অনেকক্ষণ আগেই গুলিয়ে গেছে ছেলেটার কাছে। কিন্তু মন'টা খুশি হয়ে ওঠে। এই বাড়িটার প্রতি এতদিনে একটা মায়া জন্মেছে তার। ঠিক ভাসানের সময়ে দুর্গাঠাকুরের জলে পড়া মুখটার দিকে চেয়ে যেমন মায়া লাগে। এ বাড়ির যত্ন নেবে সে, যতদিন বেঁচে আছে এখানেই থেকে যাবে... নিবারণ ঠিক করে নেয়। মুখ তুলে জানলায় এসে বসা একটা চড়ুয়ের ডানায় আলতো করে হাত বোলাচ্ছেন শশাঙ্কমোহন। লোকটা বুড়ো, কিন্তু ভারী সরল।

মাস দুয়েক পরে জ্বরে ভুগে শশাঙ্কমোহন মারা যেতে গ্রামেরই শ্মশানে দাহ করা হয় তাকে। জ্ঞাতিগুষ্টির তেমন কেউ ছিল না বলে গ্রামের লোকই সমস্ত দায়িত্ব নেয়। তবে তার শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়া মিটে যেতেই শুরু হয় বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা। কোর্টে বাড়ির মালিকানা নিয়ে শুরু হয় মামলা।

লতায়-পাতায় বংশধরদের মধ্যে আইন-আদালতের বিবাদ মিটতে-মিটতে পাঁচ বছর কেটে যায়। এই পাঁচ বছরে নিবারণ নিজ দায়িত্বে যত্ন নিয়েছে বাড়িটার। সামনে বাগানে নতুন ফুল লাগিয়েছে। রাজমিস্ত্রি ডেকে এনে কয়েক

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



জায়গায় ভাঙা ইঁট মেরামত করেছে। ঘরদোর পরিষ্কার করেছে, বাড়িটাকে নিজের বাড়ির থেকেও বেশি ভালোবাসে সে।

মামলা মিটতে একটা চিঠি পায় নিবারণ। তাতে বলা হয় বাড়ির চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তাকে। বাড়ির অধুনা মালিক কলকাতা ছেড়ে এখানে আসবেন না। ভাসানবাড়ি বিক্রি করার তেমন ইচ্ছাও নেই তাদের। ফলে আপাতত নিবারণকেই যোগ্য লোক হিসেবে কেয়ারটেকার রাখছে তারা। মাঝে-মাঝে কলকাতা থেকে ছুটি কাটাতে মালিক আসবেন। তখন বাড়িটা ঝকঝক অবস্থায় পেলেই চলবে।

সেই থেকে নিবারণ এ বাড়ি ছেড়ে নড়েনি আর। তার নিজের একটা ছোট এক-কামরার ঘর আছে এ গ্রামে। কিন্তু সেখানে নিতান্ত দরকার না পড়লে যায় না।

তিরিশ বছর বয়সে নিবারণ বিয়ে করে। একটা সন্তানও হয়। তবে ছেলে বউয়ের দিকে তেমন নজর ছিল না তার। বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোতে ভূতের মতো ঘুরে বেড়াত। চাইলে ছেলে-বৌ'কে এখানে এনে রাখতে পারত, কিন্তু এ বাড়িতে অন্য কেউ এসে থাকলে সেটা পছন্দ করে না নিবারণ। ভিখারি এলে দুরদুর করে তাড়িয়ে দেয়।

দু-তিন বছরে একবার পরিবার নিয়ে ঘুরতে এসে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যান বাড়ির মালিক। সে ক'দিন কোনওরকমে সহ্য করে নেয় নিবারণ। ওরা থাকলে বাড়ির স্বাভাবিক শান্তি নষ্ট হয়। দেওয়ালগুলো বিরক্ত হয়। ভাসানবাড়ি নীরবতা চায়, অবকাশ চায়, গঙ্গার ঘোলাটে জলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেমন ডুব দিতে ইচ্ছা করে তার অতলে, তেমন ভাসানবাড়ি বিলীন করতে ভালোবাসে মানুষকে। দু'দিন কাটিয়ে ফিরে যাওয়া পছন্দ করে না সে।

বাড়িটা কি জীবন্ত? মাঝে মাঝে ভাবে নিবারণ। কিছু একটা চায় যেন বাড়িটা। বুড়ো কবরেজের বলে যাওয়া কথাগুলো মনে পড়ে যায়, "এ বাড়িতে এমন অনেক কিছু লেখা হয়ে আছে যা এখনও চিনে নেওয়া হয়নি।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



একই মানুষ ঘুরে ফিরে আসে বারবার, শুধু একই মানুষ বলে চেনা যায় না তাকে..."

চিনতে কি পারবে নিবারণ? সে জানে না। শশাঙ্কমোহন মারা যেতে তেমন কেউ আসেনি এ বাড়িতে। নিবারণকে হয়তো পছন্দ নয় তাদের। তবে ভাসানবাড়িকে বুক দিয়ে আগলে রাখে সে। যেমন রাতের আকাশের তারা না চিনেও তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে নিতাইচরণ। দু'জনের চোখেই ফুটে ওঠে অপার বিস্ময় আর মুগ্ধতা।

* * * * * * * *

পুরনো বটতলা ফেলে জঙ্গলের প্রান্ত বরাবর এগিয়ে আসে দু'জনে। গনশার একটা হাত ধরে রেখেছে হৈমন্তী। এই রাস্তাটায় মাটি এবড়ো-খেবড়ো। হোঁচট খেয়েছে কয়েকবার। এখন সন্ধে নেমে গেছে। আলো কমে এসেছে সেই সঙ্গে। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। যদিও রাস্তার খানাখন্দে জল জমে আছে এখনও। নিবারণের বাস্তুভিটের দিকে এগিয়ে যায় দু'জনে।

গনশাকে চিন্তিত দেখায়, হৈমন্তী তার মাথায় একটা ঠেলা দিয়ে বলে, "কী রে, কী ভাবছিস তুই?"

চমক ভাঙে গনশার, মুখ না তুলেই বলে, "দাদা অবেলায় ঘুমায় না, কিন্তু আজ ঘুমাচ্ছে।"

— "তাহলে কখন ঘুমায়?"

— "তা জানি না, কিন্তু এমন সময়ে তো ঘুমায় না।"

হৈমন্তী গম্ভীর মুখে বলে, "আজ রান্না-টান্না করে ক্লান্ত হয়েছে মনে হয়। তাই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

— "রান্না তো রোজ করে... আজ..."

— "উফফ্! তোকে এত জ্যাঠামি করতে হবে না।..." ধমক খেয়ে চুপ

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



করে যায় গনশা, তার কপাল থেকে চিন্তার রেখাগুলো কিন্তু যায় না।

হাত দিয়ে তার চুল নেড়ে দেয় হৈমন্তী, নরম গলায় বলে, "আজ দুপুরে আমার ল্যাপটপে যে গেমটা খেলছিলি ওটার নাম মনে আছে?"

— "প্রো... প্র..." মনে করার চেষ্টা করে গনশা।

— "প্রোজেক্ট আইজিআই, আমার আর একটা কাজ করে দিলে আজ রাতে যতক্ষণ খুশি খেলিস, কেমন?"

— "কাজ?" গনশা বুঝতে পারে তাকে ঘুষ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার নীতিমালার দাঁড়িপাল্লায় 'প্রোজেক্ট আইজিআই' সব বাটখারাকে হারিয়ে দিয়েছে, "কী কাজ?"

— "তুই দোতলার জানলায় উঠতে পারবি? বাইরে থেকে?"

— "জানলায়! কেন?" হোঁচট খেতে খেতে সামলে নেয় গনশা।

— "একটা জিনিস পেড়ে দিতে হবে।"

— "কিছু আটকে গেছে?"

— "ধরে নে তাই।"

একটুক্ষণ বিচার করে গনশা, কাতর গলায় বলে, "দোতলার জানলায় উঠেছি জানলে দাদা মেরে ফেলবে আমাকে।"

— "মহা আহাম্মক তো..." আবার ধমকায় হৈমন্তী, "তোর দাদাকে জানাচ্ছে কে? আচ্ছা শোন, গেমের তিন নম্বর ধাপে ওই জেলখানার চাবিটা কোথায় আছে তাও বলে দেব..."

অব্যর্থ নিশানা। গনশা বিমোহিত হয়ে পড়ে। জেলখানার চাবির খোঁজ পাওয়া গেলে পাপের ভয় কীসের?

মিনিট দশেক পরে নিবারণের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। বাড়ি বলতে তেমন আহামরি কিছু না। এক কামরার চালাঘর। জঙ্গলের ঠিক বাইরের প্রান্তে বলে আশেপাশে কিছু কলাগাছের সার গজিয়েছে। গাছের পাতায় ঢেকে আছে ঘরটা। ভিতর অবধি না ঢুকলে বোঝাই যায় না ভিতরে একটা ঘর আছে বলে।

in Telegram: https://t.me/amargranthag

— "পাড়া প্রতিবেশি বলে কেউ নেই দেখছি।" হৈমন্তী দেখতে দেখতে বলে।

— "নিবারণকাকা কারো সঙ্গে মিশত না। মানুষজন পছন্দ করত না।" ভাসানবাড়ি

নিবারণ ভাসানবাড়ির বন্ধু নিত, কিন্তু তার নিজের বাড়িতে তেমন ধী নেই। কোনওরকমে দাঁড় করানো আছে কাঠামোটা।

— "মোবাইল ব্যবহার না করার কারণটা বুঝতে পারছি এবার।"

জলজমা পথে কিছুদূর এগিয়ে আসে হৈমন্তী। পায়ে কাদার ছিটে লাগে তার। নিবারণের বউ বেঁচে নেই। অসুস্থ শরীরে এমন অস্বাস্থ্যকর ঘরে লোকটা একা পড়ে থাকে? হুট করে কিছু হয়ে গেলে চিৎকার করলে একটা মানুষও শুনতে পাবে না।

কী মনে হতে গনশা বলে, "আমার কাকা বলে নিবারণকাকা নাকি পাগল হয়ে গেছিল।"

— "কী রকম পাগল?" সাবধানে এগোতে-এগোতে বলে হৈমন্তী।

— "ভাসানবাড়ি কাকাকে শুষে নিয়েছে।"

বিড়বিড় করে হৈমন্তী, "বাড়ি আবার মানুষকে শুষে নেবে কী করে? তবে লোকটার মাথায় কিছু ছিট আছে তা তো বুঝতেই পারছি।"

গনশা পিছনেই দাঁড়িয়ে পড়ে। হৈমন্তী কাঠের দরজায় হালকা একটা ঠেলা দেয়। মিহি শব্দ করে খুলে যায় দরজাটা।

পুরনো লেপকাঁথা আর ভিজে কাঠের গন্ধ একসঙ্গে নাকে আসে হৈমন্তীর। চাঁদের আলো চালের ফাঁক দিয়ে এসে ঢুকছে ভিতরে। পায়ের তলায় সিমেন্টের মেঝে, তার উপরে কিছুটা ছেঁড়া আলো ঘুমিয়ে আছে।

ঘরটা ফাঁকা।

একদিকের বিছানার উপরে চাদর পাতা আছে। তার উপরে মানুষের শরীর নেই, এমন কী কারো শোবার চিহ্নও নেই। হৈমন্তীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে এ ঘরে বেশ কয়েকদিন কোনও মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। সেটা অবশ্য ভুল হতে পারে...

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



এই বৃষ্টির মধ্যে গেলেন কোথায় নিবারণবাবু? নাকি ক'দিন আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে গেছেন তিনি?

বিছানাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল হৈমন্তী। চোখে পড়ল, খাটের পায়ার কাছে দলা পাকানো কিছু একটা পড়ে। সেটা হাতে নিতে গিয়েও আটকে যায় সে... পিঠে একটা শক্ত হাত এসে পড়েছে। সে চমকে পেছনে ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। অশ্বিনী দাঁড়িয়ে আছে ঘরের ঠিক মাঝমাঝি। কাঁধের শালটা কয়েক জায়গায় ভিজে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হৈমন্তীর দিকে।

আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করে হৈমন্তী, "আসলে নিবারণবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা করছিল..."

— "দেখা হয়েছে?" যেন বরফের ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে কথাগুলো।

— "না... মানে..." গলা আটকে যায়, "উনি তো নেই..."

— "অপেক্ষা করবেন?"

হৈমন্তী বোঝে তার পা দুটো কেঁপে উঠছে, "না না, কিন্তু এত বৃষ্টির মধ্যে অসুস্থ মানুষটা কোথায় গেল, চিন্তা হচ্ছে না আপনার?"

এক পা এগিয়ে আসে অশ্বিনী, "একটা খুন হয়ে গেছে। আরও হতে পারে। এই গ্রামটা নিরাপদ নয় আর। আপনাকে আমি বলেছিলাম একা একা কোথাও যাবেন না।"

— "আসলে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে আর ডাকিনি..."

জ্বলজ্বলে চোখে একবার হৈমন্তীর দিকে তাকায় অশ্বিনী। তারপর দরজার দিকে ফিরে এগিয়ে যায়। হৈমন্তীর হতভম্ব ভাবটা কাটেনি এখনও। যে ডোজের ঘুমের ওষুধ শরবতে মিশিয়েছিল সে, তাতে অন্তত আটঘণ্টার আগে জাগার কথা নয় অশ্বিনীর। অথচ এখন একঘণ্টাও কাটেনি। এ কী করে সম্ভব?

— "শুনুন না," কখনও অশ্বিনীকে তুমি ছেড়ে আপনি বলতে শুরু করেছে নিজেও খেয়াল করেনি হৈমন্তী। গলাটা স্বাভাবিক করে বলে, "ভাবছি

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



[illegible] দ্বিতীয় সময় না। আমার বাড়ি ছিল থেকে যাই এখানে।"

[illegible] হাসিটা গোটা মুখ [illegible] শিশুসুলভ হাসিটা গোটা মুখ [illegible] মুখের উপর জ্যোৎস্না খেলে যায় [illegible]। [illegible] সে।

[illegible] সেকেন্ড অপেক্ষা করে দৈনন্তী। তারপর [illegible] সামনে মেলে ধরে। খাটের পায়ার পাশ থেকে [illegible] ফুল নিয়েছিল।

[illegible] ছবি বাঁধানো। নিচে ব্লক লেটারে [illegible] আছে। আঠারোশ একানব্বই।

[illegible] জ্যোৎস্নার সেটা মেলে ধরতে রুপালী [illegible] ছবি।

[illegible] আগে ভাসানবাড়ির সামনের বাগানে তোলা হয়েছিল [illegible]। সেখানে দাঁড়িয়ে বরা বাবার সবাই উপস্থিত আছে ছবিতে। [illegible] মধ্যে কোনও একজন মুরারিমোহন। ছবির কেউ সামনের সারিতে, কেউ পিছনে, সেকালে গ্রুপ ফটো তোলার রীতি ছিল।

ছবির একপাশে [illegible] থেকে তিনজনের, পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা [illegible] শাল গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার মুখে চোখ আটকে যায় তার।

ছবিটা হাত থেকে খসে পড়ে...

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# অষ্টম অধ্যায়

সারারাত ঘুম হয়নি হৈমন্তীর। ঘরের ভিতরে একটা অদৃশ্য চেলো যেন একই লয়ে বেজে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। প্রথম প্রথম মন টাকে ভাবিয়ে তুলেছিল সেটা, নানারকম সম্ভাবনার কথা অঙ্কের মতো কষে নিয়ে আবার মুছে ফেলছিল বারবার। উত্তর মিলছিল না কিছুতেই। এখন সেই সুরটা ঘ্যানঘ্যানে লাগতে শুরু করেছে।

ছবিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে হৈমন্তী। বারবার আলো জ্বেলে খুঁটিয়ে দেখেছে ছবিটা। অবিকল যেন অশ্বিনী দাঁড়িয়ে আছে ছবির একদিকের ধারে। কোনও পার্থক্য নেই।

পিঠের উপরে একইভাবে ফেলা আছে শালটা। নিয়ম মেনে মাথার চুলগুলোও আঁচড়ান। তবে কি অবিকল অশ্বিনীর মতো দেখতে কেউ কখনও এ-বাড়িতে থাকত?

তাছাড়া আর কিই বা হতে পারে? ছবিতে যে মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে আজ তার বয়স অন্তত দেড়শো হবার কথা। অর্থাৎ তার পক্ষে বেঁচে থাকা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

হৈমন্তী একবার ভাবল গোটা ব্যাপারটা অশ্বিনীকে জানানো দরকার, কিন্তু ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে সেটা ঠিক হবে না।

ছবিটা নিবারণবাবুর বিছানার নিচে পড়েছিল। অর্থাৎ উধাও হবার আগে সেই ছবিটাই দেখছিলেন তিনি। ছবির ছেলেটার ব্যাপারেই নিশ্চয়ই কিছু জানতেন। সে জন্যেই অস্মিতাকে চিঠি লিখে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। কোনও কি বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন?

অশ্বিনী? কিন্তু তার মধ্যে বিপদজনক কিছু তো লক্ষ করেনি হৈমন্তী...

নাঃ, আজ করেছে। আজ একটু আগে। তার শান্ত চোখ দুটোতে একটা হিংস্র নেকড়ের ক্রোধ লুকিয়েছিল।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বিছানা থেকে উঠে পড়ে হৈমন্তী। সিগারেট ধরায়। মাথার ভিতরটা ভনভন করছে। খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাইরে ঘন অন্ধকারে ঢাকা গ্রাম আর মিহি কুয়াশা মাখা গাছপালার সার থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

হৈমন্তীর চোখ নেমে এল মাটির দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাদাটে কিছু একটা জিনিসের উপরে চোখ আটকে গেল। মানুষের দেহ! মাঝারি মাপের বাবলা গাছের নিচে পড়ে আছেন একটা মানুষ। কে হতে পারে? নিবারণ?

সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে সে। হৈমন্তী ঠিক করে নিল যেভাবেই হোক বাইরে বেরিয়ে লোকটার কাছে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু কী করে? সন্ধে পার হলেই বাইরের দরজায় তালা দিয়ে দেয় অশ্বিনী।

বেশি ভাবনা চিন্তার অবকাশ না নিয়ে হৈমন্তী নিচে নেমে আসে। যেভাবেই হোক চাবি খুলে বাইরে আসতে হবে। চাবিটা ঝোলানো থাকে অশ্বিনীর ঘরের দেওয়ালের হুকে। পা টিপে টিপে সেখানে পৌঁছে হৈমন্তী দেখে রোজকার মতোই চেয়ারে বসে আয়নার দিকে চেয়ে ধ্যানমগ্ন হয়েছে অশ্বিনী। ইচ্ছা করেই পায়ে শব্দ করে সে। অশ্বিনীর ধ্যান ভঙ্গ হয় না।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে দেওয়াল থেকে চাবিটা টেনে নেয় সে। আয়নার উপরে তার ছায়া সরে যায়, অশ্বিনীর স্থির শরীরে কোনও হেরফের আসে না। সে একটানা তাকিয়ে আছে নিজের দিকে।

বাইরের দরজাটা খুলে প্রায় ছুটে বাগান'টা পেরিয়ে বাড়ির পিছন দিকটায় এসে দাঁড়ায় হৈমন্তী। এদিকটা কাঁটাঝোপে ভর্তি। সেটা পেরিয়ে বাবলা গাছের কাছে পৌঁছাতে শরীরের কয়েক জায়গায় ছড়ে যায় তার। উত্তেজনা আর চেরা দাগগুলো অস্থির করে তোলে তাকে।

নিবারণের শরীরটা এখনও আগের মতোই পড়ে আছে। মাঝে মাঝে হাত দুটো কেঁপে উঠছে একটু। সে বেঁচে আছে। গোটা শরীর কাদামাখা, ঠোঁটের পাশে রক্তের দাগ। টর্চ জ্বালিয়ে কাছে এগিয়ে এল হৈমন্তী।

লোকটার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তার গায়ে ঠেলা দিল, "শুনছেন, প্লিজ চোখ খুলুন..." অসহায় লাগল হৈমন্তীর, "দাদা, শুনছেন?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



লোকটার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার। চোখ দুটো আধখোলা হল, একটা হাত উঠে এল হৈমন্তীর দিকে, ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছে মানুষটার, কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল সে।

— "আপনি নিবারণবাবু?"

অস্পষ্ট গলায় কিছু বলল লোকটা। বোঝা গেল না। হৈমন্তী তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, "আমার নাম হৈমন্তী ঘোষ। ভাসানবাড়িতে এসে রয়েছি আমি..."

— "ভাসান... বাড়ি..." অসুস্থতার মধ্যেও লোকটার মুখে একটা লালচে চেতনার রেশ লাগল, "আমি নিবারণ... ও বাড়ির..."

— "জানি। আজ রাতে আপনার বাড়ি গেছিলাম। আপনি ছিলেন না। কী হয়েছে আপনার?"

এতক্ষণে সোজা হয়ে উঠে বসেছে নিবারণ, বৃদ্ধ মুখের মৃত বলিরেখাতে লালচে রঙ খরস্রোতা হয়েছে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে হৈমন্তীর দুটো কাঁধ খামচে ধরেন তিনি, "পালিয়ে যাও, ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যাও, যেখানে পারো লুকিয়ে পড়।"

— "কেন? কী আছে ওখানে?" হৈমন্তী উতলা হয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না নিবারণ। মাথাটা চারপাশে ঘুরিয়ে কিছু দেখে নেয়, কিছুর একটা আশঙ্কা জাগছে, মৃত্যুভয় খেলা করছে তার মনের ভিতরে।

— "বলুন কী আছে ওখানে?"

— "মৃত্যু, বিসর্জন, একবার ওই বাড়ির উপর মায়া পড়ে গেলে আর ফিরতে পারবে না কোনওদিন, ওই বাড়ি শুষে নেবে তোমাকে..." থেমে থেমে কথাগুলো শেষ করল নিবারণ।

— "অশ্বিনীরও কি তাই হয়েছে?"

এবার সতর্ক চোখ তুলে তাকায় নিবারণ, "কে? অশ্বিনী?"

— "আপনার ছেলে।" অবাক গলায় বলে হৈমন্তী।

— "আমার কোনও ছেলে নেই... আমার ছেলে সাত বছর বয়সে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



টাইফয়েডে মারা গেছে..."

একটা ঠান্ডা স্রোত হৈমন্তীর হৃদপিণ্ড ভেদ করে চলে যায়। শরীর কিছুটা পিছিয়ে আসে তার। মাথার ভিতরে ধুলোবালির ঝড় শুরু হয়েছে, নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না কিছুতেই।

— "ও কে তাহলে?"

প্রায় চিৎকার করে প্রশ্ন করে হৈমন্তী। নিবারণ দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলে, কান্নার দমক এসে বৃদ্ধের বুক কাঁপিয়ে দেয়।

— "আমি জানি না, কিন্তু আমাকে ও বাঁচতে দেবে না, মেরে ফেলবে। আমি কোনওরকমে পালিয়ে..."

— "কেউ মারতে পারবে না আপনাকে।" একটা হাত ধরে নিবারণকে দাঁড় করিয়ে দেয় হৈমন্তী। কসরত করে উঠে দাঁড়ায় নিবারণ। হৈমন্তী একটা হাত কাঁধে তুলে নিয়ে বলে, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

— "কোথায়?"

— "ভাসানবাড়িতে।"

— "না, ওখানে না।" ছিটকে সরে যেতে চায় নিবারণ। হৈমন্তী শক্ত হাতে ধরে রাখে, "বললাম তো ভয়ের কিছু নেই, আমি থাকতে কেউ ক্ষতি করবে না আপনার। আসুন আমার সঙ্গে।"

হৈমন্তীর গলার ভিতরের জোর কিছুটা সঞ্চারিত হয় নিবারণের মধ্যে, দু'জনে এগিয়ে গিয়ে বাড়িটার সামনে চলে আসে। নিবারণ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, "কী করছে ও এখন?"

— "নিজের ঘরে, আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে।"

ঢোঁক গেলে নিবারণ, "যতক্ষণ ওভাবে থাকে ততক্ষণ কোনওদিকে হুশ থাকে না।"

— "কিন্তু করে কী ওইভাবে?"

নিবারণ দু'দিকে মাথা নেড়ে দেয়। হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে বলে, "বেশ, এখন কিছু বলতে হবে না আপনাকে। আপাতত আমার ঘরে চলুন। একটু সুস্থ

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হয়ে নিয়ে সব খুলে বলবেন আমাকে।"

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অশ্বিনীর ঘরে আর একবার উঁকি দিয়ে দেখে হৈমন্তী। এখনও একইভাবে বসে আয়নার দিকে চেয়ে আছে ছেলেটা। কোনওদিকে হেলদোল নেই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিবারণের শরীরটা একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হৈমন্তী তার ঠোঁটের পাশের কাটাটার উপরে এন্টীসেপ্টীক লাগিয়ে দেয়। দরজায় লাগানো হুড়কোটা কয়েকবার মন দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয় নিবারণ। তারপর ফিরে এসে বিছানার পাশে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ে। হৈমন্তী তার সামনে পা মুড়ে বসে জিজ্ঞেস করে, "এবার বলুন তো, এই অশ্বিনী বলে ছেলেটা যদি আপনার ছেলে না হয়, তাহলে কে?"

ঘাড় নাড়ে নিবারণ, "আমি জানি না ম্যাডাম, বড়কত্তার সঙ্গে যখন এই বাড়িতে থাকতাম তখন থেকেই বুঝেছিলাম এই বাড়িটা একটু অদ্ভুত। এখানে কোথাও একটা কিছু ভারী গোলমাল হয়ে আছে। বেশিদিন থাকলে কেমন একটা মোহ জন্মায়। শ্যাওলার মতো, জানলার গ্রিলে ধরা জং এর মতো, এ বাড়ি ছেড়ে আর যেতে ইচ্ছা করে না, সংসারের আর কোনওকিছুর দিকে খেয়াল থাকে না।"

হৈমন্তী বুঝল নিবারণ নিজের মতো কথা বলে চলেছে। প্রশ্নের উত্তর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সে আবার ফিরিয়ে আনে, "অশ্বিনীকে কবে থেকে চেনেন আপনি?"

— "প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল। এই ক'বছরে ওকে একটুও বড় হতে দেখিনি, জানি না কেন যতবারই এ বাড়িতে ও এসেছে ওর বয়স সেই একই রয়ে গেছে। ও সত্যিকারের মানুষ নয় দিদিমণি, ওর মধ্যে অন্য কিছু আছে।"

হৈমন্তীর কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে। নিবারণকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না। সে নিজে থেকেই বলে চলেছে। অতীতের কোনও প্রাচীন গহ্বরে হারিয়ে গেছে তার চোখ, "বড়কত্তা বলেছিলেন এ বাড়িতে এমন অনেক কিছু ঘটে যা বাইরের মানুষকে জানাতে নেই। বাড়ির ভিতরের ছবি

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



রাস্তার লোকের থেকে আড়াল করতে যেমন জানলা-দরজায় পর্দা লাগানো হয়, তেমন ভাসানবাড়িতে আরও অনেক কিছু আড়াল করতে হবে। আমি অবশ্য কথাটার মানে তখনও বুঝিনি।

প্রথম দুটো বছর ভারী ভালো লাগত এখানে থাকতে, লোকজনের হইহল্লা নেই, চিৎকার নেই, নিজের মতো থাকা-খাওয়া আর বাড়ির দেখাশোনা করা...

আমার যখন কুড়ি বছর বয়স তখন একদিন ওকে দেখতে পাই আমি। সেদিনও এমন ঝড়-জলের রাত ছিল। বনবন বাজ পড়ছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি বাড়িটা ভেঙে পড়ে যাবে। হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছিল দরজায়। মনে হচ্ছিল বাইরে থেকে যেন কেউ টোকা দিচ্ছে। আমি তখন রান্না করছিলাম, অতটা কান দিইনি। এমন সময় মনে হল সত্যি টোকা পড়ছে। তাড়াহুড়ো করে উঠে দরজা খুলে দেখি একটা বছর সাতাশের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করতে জানালো বাইরে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ঝড় জলে আটকে গেছিল, রাতটুকু এ বাড়িতে কাটিয়েই সে চলে যাবে। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে আমার ভালোই লেগেছিল, তাছাড়া এ বাড়িতে চুরি ডাকাতি হওয়ার মতো কিছু তো ছিল না। আমি ওকে একরাতের জন্য একতলার ঘরের মাটিতে বিছানা পেতে থাকতে দিয়েছিলাম।

মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখি বৃষ্টি কিছুটা ধরে এসেছে। ছেলেটা এখনও আছে নাকি দরজা খুলে চলে গেছে দেখতে ঘরে গিয়ে দেখি সে ঘুমায়নি। ঘরের ঠিক মাঝখানে বড় আয়নাটার দিকে মুখ করে বাবু হয়ে বসে আছে। ঠিক যেন ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর ডাকিনি তাকে। সকালে উঠে দেখি সে গায়েব। ঘর ফাঁকা। সেই প্রথম দেখেছিলাম ওকে। তখনও জানতাম না ও আবার ফিরে আসবে...”

বাইরে বৃষ্টির ধারা আরও বেড়ে উঠেছে। নিবারণের গল্পে দ্রুতগামী সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঝরে পড়ছে যেন তারা। তারাও এ ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

— “এই ঘটনার আগে কোনোদিন দেখেননি ওকে?”

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



নিবারণ দু'দিকে ঘাড় নাড়ে, "না। দেখে থাকলেও কুল মনে ছিল না। আমি গ্রামের মানুষের সঙ্গে খুব একটা মিশিনি কোনওদিন। নিজের মতো করে এখানেই পড়ে থাকতাম।"

— "এরপর কবে দেখেছিলেন ওকে?"

— "এর আট বছর পরে। ততদিনে ওর কুলটা ভুলে গেছি। আবছা মনে ছিল হয়তো। একদিন বাজার করে ফিরে দেখি বাগানের বাইরেটায় দাঁড়িয়ে একমনে ফুল দেখছে। আমি কী চাই জিজ্ঞেস করতে বলল এ বাড়িতে সে ক'দিন থাকতে চায়, টাকাপয়সাও দিতে রাজি আছে।

বাবুদের চিঠি না পেলে আমি এ বাড়িতে কাউকে থাকতে দিই না। প্রথমে সে কথাই বলেছিলাম, কিন্তু তারপর ও আমাকে অবাক করে দিয়ে এ বাড়ির সব কথা শোনাতে লাগল আমাকে। বড়কর্তার কথা, তার বাপের কথা, এমন কী আমার ছোটবেলার নাড়িনক্ষত্র অবধি সব বলে দিল। এসব কথা কারো জানার কথা নয়। পুরনো কথাগুলো বলে কী করে জানি না আমার মনটা নরম করে দিল ও। টাকাপয়সা ছাড়াই ওকে থাকতে দিলাম আমি। তবে গতরে খেটে দিত। ভারী অদ্ভুত ছেলেটা, ঘুমায় না, গায়ে জোরের অভাব নেই, এতটুকু ফাঁকি দেয় না কোনও কাজে, খাবার দাবারের লোভ নেই... তবে..."

পরের কথাগুলো বলতে গিয়ে থেমে যায় নিবারণ, ঘরের দরজার দিকে তাকায়, কান পেতে কোন আওয়াজ আসছে কিনা শোনার চেষ্টা করে, মুখের উপর একবার হাত চালিয়ে নিয়ে বলে, "একটা বুনো স্বভাব আছে ওর, কেউ আমার বা এই বাড়ির কোনও ক্ষতি করতে এলে ওর ভিতরে সেই বুনো জন্তুটা জেগে উঠত। মনে আছে একবার গ্রামের কিছু ডেঁপো ছেলে আমার ঘরের জানলা দিয়ে একটা সাপ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অশ্বিনী কী করে জানি খুঁজে পেয়ে সেটাকে ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, তবে সেই ছেলেগুলোকে দু'দিন পরে জঙ্গলের একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। মাঝরাতে ঘুমের ঘোরে কেউ তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে এসেছিল গাছের সঙ্গে।

অন্ধকারে ছেলেগুলো কিছু দেখতে পায়নি তবে আমি জানি কাজটা

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



অশ্বিনীর। দু'দিন ধরে অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে। ওই ঘটনার পরে ওর চোখ থেকে আগুন নিভে যায়।"

হৈমন্তী গালে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু ও যে আপনার ছেলে সেটা গ্রামে রটাল কে? ও নিজেই?"

— "না, আমি। বাবুরা মাঝে-মধ্যে কলকাতা থেকে আসেন। তাদেরকে কী উত্তর দেব? বাইরের লোককে বাড়িতে এনে রেখেছি?"

— "ওর যে এই চল্লিশ বছরে বয়স বাড়েনি সেটা আপনি ছাড়া আর কে জানে এখানে?"

— "নিতাই জানে। এ বাড়িতে অদ্ভুত কিছু যে ঘটে সেটা আমি ছাড়া ওই কেবল জানে কিছুটা।"

জানলার কাছটায় গিয়ে দাঁড়াল হৈমন্তী। মাথার ভিতরে দমকা একটা বাতাস আটকে আছে। কোথাও কিছু তাল কেটে যাচ্ছে গল্পটা। চল্লিশ বছর বয়স বাড়েনি অশ্বিনীর? এমন'টাও সম্ভব?

টেবিলের উপর রাখা ছবিটা চোখে পড়ল তার। ছবিটা যদি সত্যি হয় তাহলে চল্লিশ কেন? অন্তত শখানেক বছর ধরে একইরকম আছে অশ্বিনী। সেদিন আকাশের তারাগুলো দেখে চক্‌চক্ করছিল তার চোখ, অশ্বিনীর সঙ্গে কি কোন মিল আছে তারাগুলোর? সেও কি নিশ্চল সময়ের বুকে শুয়ে থাকা কোনও কালপুরুষ?

— "কিন্তু আপনি এখন ওকে ভয় পাচ্ছেন কেন?" হৈমন্তী প্রশ্ন করে।

নিবারণ ভিরু দৃষ্টিতে ঘুরে তাকায়, "ও আমাকে মেরে ফেলতে চায়। আমাকে হাতের সামনে পেলেই..."

— "কিন্তু কেন?"

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায় নিবারণ, "আমাকে নাকি এ বাড়ির আর প্রয়োজন নেই। সেই জন্যেই আমাকে সরিয়ে দিতে চায়।"

টেবিলের উপরে একটা ঘুষি মারে হৈমন্তী, "মানে কী এসব কথার? বাড়ির কাউকে প্রয়োজন থাকে কী করে? তাছাড়া প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই একটা

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



মানুষকে মেরে ফেলতে হবে?"

কথাগুলো বলে কী একটা ভেবে থমকে যায় হৈমন্তী, গলার স্বর নিচে নেমে আসে, "চল্লিশ বছর আগে ওকে প্রথম দেখেছিলেন, তাই না? তার আটবছর পরে আবার ফিরে আসে। মানে আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে। মানে নাইনটিন এইটটি এইট?"

— "হ্যাঁ, তাই হবে।"

— "ডেটটা মনে আছে?"

নিবারণকে ভাবুক দেখায়, মনে করার চেষ্টা করে, "তা মনে নেই, তবে বাগানের যে ফুলটা ও দেখছিল সেটা স্নোড্রপ্স। ওই ফুল বিদেশ থেকে এনে লাগিয়েছিলেন বড়কর্তা। শুধু নভেম্বর মাসে ফুটত।"

— "আর ডেট?"

নিবারণের সামনে নিরেট দেওয়াল, "একেবারে মনে নেই। তবে... সেদিন রাতে রান্নাটা অশ্বিনীই করে দিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে আমার হাঁটুর গাঁটে ব্যথা হচ্ছিল সেদিন... মানে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা..."

হৈমন্তী হাসে, "অমাবস্যা পূর্ণিমার সঙ্গে ব্যথার কোনও সম্পর্ক নেই। মিথটা আছে বলে আমাদের মনে হয় যে ব্যথা হচ্ছে। এক ধরনের মনোরোগ এটা। নান দা লেস, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ছিল সেদিন..."

একটু থেমে পরের কথাগুলো বলে হৈমন্তী, "যদি অমাবস্যা হয় তাহলে অসুবিধা নেই, কিন্তু পূর্ণিমা হলে..."

— "পূর্ণিমা হলে কী?"

— "তাহলে ডেটটা হবে তেইশে নভেম্বর ১৯৮৮..."

— "সে কি! মনে আছে আপনার? এতদিন আগের..."

— "আছে মনে... কারণ তেইশে নভেম্বর ১৯৮৮ আমার জন্মদিন... সেদিন সকালেই অশ্বিনী ফিরে এসেছিল এ বাড়িতে..."

নিবারণ ছিটকে সরে যায় দূরে।

তার একটা কারণ আছে অবশ্য। দরজায় টোকা পড়তে শুরু করেছে। সেই

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



সঙ্গে বাইরে থেকে একটা গলা ভেসে এসেছে, "আমি অশ্বিনী, দরজাটা খুলবেন একটু?"

চোখের ইশারায় নিবারণকে লুকিয়ে পড়তে বলে হৈমন্তী। তারপর মুখ থেকে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মুছে ফেলে দরজা খুলে দেয়। অশ্বিনী উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে আছে হৈমন্তীর দিকে, ধীরে ধীরে সে প্রশ্ন করে, "বাইরের দরজাটা দেখি খোলা? আপনি বাইরে গেছিলেন?"

দু'দিকে ঘাড় নাড়ে হৈমন্তী, "উঁহু... নাতো..."

— "এমনি এমনি খুলে গেল? নাকি আমি নিজেই..." বিড়বিড় করে অশ্বিনী, তারপর আবার স্বাভাবিক গলায় বলে, "জানেন, আপনার ঘর থেকে কথা বলার আওয়াজ আসছিল মনে হল..."

হৈমন্তী 'ফোনে কথা বলছিলাম' বলতে যাচ্ছিল, ঘটনাটা মনে পড়তে সামলে নিয়ে বলল, "তাহলে ঘুমের ঘোরে কথা বলছিলাম হয়তো।"

— "আপনি ঘুমের ঘোরে কথা বলেন?"

উপরে নিচে মাথা দোলায় হৈমন্তী। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

— "কই আগে তো দেখিনি?"

— "তুমি রোজ ঘুমাতে দেখো আমায়?"

লাজুক হাসি হাসে অশ্বিনী। তারপর মুখটা নিচে নামিয়ে এনে বলে, "শুনুন না, মাঝরাতে দরজাটা যখন খুলেই গেছে তখন সেটা দিয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসা যায়, কী বলুন?"

— "বাইরে! এত রাতে? কেন?"

অশ্বিনীর ডানদিকের ভুরুটা কিছুটা উপরে উঠে যায়, রহস্যময় গলায় সে বলে, "ভূত দেখবেন?"

— "ভূত! এখন... আচ্ছা আমি জামাটা ছেড়ে নিয়ে..."

হৈমন্তীর ডানহাতটা ধরে একটা টান দেয় অশ্বিনী, "কিচ্ছু ছাড়তে হবে না, ভূত, ভগবান আর সময় কারো জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# নবম অধ্যায়

খানিকটা কান্নার পরে নিজেকে জোর করে থামিয়ে নেয় মানুষ। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারপর তার মনের বাঁধ ভেঙে যায়, আবার তার চোখ থেকে আরও বেশি ঝাঁপিয়ে জল নেমে আসে। মাঝের এই সময়টুকু তার মনের ভিতরে দ্বন্দ্ব চলে। তার ভিজে নোনতা গাল ফুঁপিয়ে ওঠে কয়েকবার। এবং ঠিক সেই সময়টায় একটা মানুষকে সব থেকে বেশি প্রয়োজন হয় তার। তারপরে কান্নার দমকের কাছে হার স্বীকার করে নিলে আর সহস্র ডাকাডাকিতেও লাভ হয় না কিছু।

আজকের আবহাওয়াতেও সেই মাঝের সময়টুকু চলছে। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আরও একপশলা নামা শুধু সময়ের অপেক্ষা। মাঝের এই মিনিট তিরিশেক কেবল আকাশে মেঘ ডাকবে, ভিজে মাটির গন্ধে ভরে থাকবে চারিদিক, আর জল-কাদায় ডুবে থাকা বুনো ঝোপের আড়াল থেকে অলৌকিক পোকামাকড়ের ডাক কানে আসবে।

সেই জলকাদার উপর দিয়ে প্রায় দৌড়ে এগোচ্ছে অশ্বিনী। হৈমন্তী তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। মাঝে থেমে থেমে সে ভাবছে ব্যাপারটা সত্যি ঘটছে তো? এর আগে ভারী গম্ভীর আর রাশভারী একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল তাকে। অথচ এখন তার চোখে, মুখে কৈশোরের চাপা উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে।

— "কী হল? আসুন..."

পেছনে ফিরে তাড়া দিল অশ্বিনী। হৈমন্তী ছোট্ট লাফ দিয়ে একটা জমা জল পেরিয়ে এসে বলল, "আরে পায়ে জুতো নেই তো, কিসে না কিসে পা পড়ে যায়..." এতটা দৌড়ে হাঁপিয়ে গেছে হৈমন্তী, বড় করে শ্বাস নিতে নিতে বলে, "তাছাড়া আমার বয়স হয়েছে। ভালো কথা, তোমার বয়স কত বলতো? সাতাশ আঠাশ?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



সামনে হাঁটতে থাকে অশ্বিনী, "ওই... কাছাকাছি।"

— "হুঁ, মেয়েরা বয়স বলতে চায়না শুনেছিলাম, এখন দেখছি ছেলেরাও..."

মুখের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া উসকো-খুসকো চুলগুলো গুছিয়ে বেঁধে নেয় হৈমন্তী। শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে একটা। সুতির নরম গেঞ্জির ফাঁকে ঢুকে পড়ে সারা শরীরে খেলা করে যাচ্ছে। মুখের চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে বারবার।

চতুর্দিক অন্ধকারে ঢেকে আছে। ঝোপঝাড়ের উপর জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে মাঝে-মাঝে। তার ফাঁক দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা এগিয়ে গেছে। অশ্বিনী রাস্তাটা চেনে। তার শালের একটা প্রান্ত চেপে ধরে এগিয়ে চলেছে হৈমন্তী।

কিছুদূর হেঁটে এসে থমকে দাঁড়ায় অশ্বিনী। তার শরীরের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে হৈমন্তী দেখে একটা বড় ডোবার সামনে এসে পড়েছে দু'জনে। ডোবার চারদিক ঝোপ আর জলাভূমি। সেই জলাভূমি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলেছে। ঝিলটাকে কেন্দ্র করে একটা হাঁটু সমান উদ্ভিদদের ব্রিগেড মিটিং চলছে যেন।

— "এখানে নিয়ে এলে যে... সাপখোপ থাকতে পারে তো..." হৈমন্তী বলে।

— "থাকতে পারে কেন? আছে তো। সেই সঙ্গে ভূতও আছে।"

— "ধুর! ওসবে বিশ্বাস করি না। বিষাক্ত সাপে কামড়ালে কী হবে বলতো?"

— "উঁহু, কামড়াবে না, সেইজন্যেই তো সিংহাসনের ব্যবস্থা।"

— "সিংহাসন! সেটা আবার কোথায়?"

— "ওই যে..." আঙুল তুলে ঝিলের ঠিক মাঝখান'টা দেখায় অশ্বিনী। সেদিকে চেয়ে হৈমন্তী দেখতে পায় জলের উপরে একটা আধমিটার ব্যাসের উঁচু ঢিবি জেগে আছে। সম্ভবত কাদামাটি জড় হয়ে শক্ত ঢিবিটা দ্বীপের মতো তৈরি হয়েছে। ঢিবির গা'টা এবড়ো-খেবড়ো হলেও উপরিতলটা মসৃণ। সেটাকেই কি সিংহাসন বলছে অশ্বিনী?

— "ওর উপরে গিয়ে বসব আমরা?" অবিশ্বাসের গলায় বলে হৈমন্তী।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আজ্ঞে হ্যাঁ, এত বছর আমি একাই বসে এসেছি। দু'জন বসার জায়গাও হয়ে যাবে, চলে আসুন।"

হৈমন্তীর শরীরটা খারাপ লাগতে শুরু করেছে, মাথাটা ঘুরছে অল্প অল্প, একটু পরেই হয়তো আবার জ্ঞান হারাবে সে। এ অবস্থায় বাইরে থাকা বিপদজনক, তাও ভয় করল না হৈমন্তীর। সে মনে জোর এনে বলল, "কিন্তু যাব কী করে? মাঝে তো জল..."

অশ্বিনী কথাটার উত্তর দিল না। একটু দূরে পড়ে থাকা একটা ছোট গাছের গুঁড়ি কুড়িয়ে নিয়েছে সে। অন্তত দেড়মিটার লম্বা হবে গুঁড়িটা, সেটা সশব্দে জলের উপরে ছুঁড়ে ফেলল সে। প্রথমে ডুবে গিয়ে তারপর জলের উপরে ভেসে উঠল গুঁড়িটা। সেটা দেখিয়ে হাসি মুখে অশ্বিনী বলল, "অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে। পার করো বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে। নিন, উঠে পড়ুন।"

— "নাঃ আগে তুমি।" হৈমন্তীর এবার ভয় ভয় লাগতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে খানিকটা মজাও।

অশ্বিনী ঝিলের পাড়ে গিয়ে ছোট লাফ দিয়ে গুঁড়ির উপরে উঠে পড়ে, তারপর শক্ত লাঠি কুড়িয়ে নেয়।

— "কী যে করো না, পড়ে গেলে কী হবে বলতো?"

— "আপনি নিতাইকাকাকে হাত দেখিয়েছিলেন নাকি?"

সাবধানে এগোতে থাকে হৈমন্তী, "কেন?"

— "ভাবলাম হয়তো বলেছেন জলে ফাঁড়া আছে। এখানে জল চারফুটও হবে না, গরম জল করে দেব, স্নান করে নেবেন বাড়ি ফিরে।"

কথাটা বলে একটা হাত বাড়িয়ে দেয় অশ্বিনী। সেটা ধরে কোনওরকমে টাল সামলে গুঁড়ির উপরে উঠে এসে বসে পড়ে হৈমন্তী। গুঁড়িটা একটু দুলে উঠে মোটামুটি শান্ত হয়ে যায়। মৃদু জলস্রোতের ধাক্কায় দুটো শরীর একই ছন্দে দুলতে থাকে। হৈমন্তীর দিকে পিছন ঘুরে বসে হাতের লাঠিটা বৈঠার মতো চালিয়ে ঢিবির দিকে এগিয়ে যায় অশ্বিনী।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "এখন বুঝতে পারছি কেন এই জায়গাটা ছেড়ে যাওনি তুমি। এখানে তোমার একটা নিজের জগত আছে, চেনা পরিসর আছে, যেমন ধরো গাছের গুঁড়িটা, ওই ঢিবিটা... ওগুলোর উপর মায়া পড়ে গেছে, তাই না?"

— "হতে পারে..." অশ্বিনীর মুখ দেখা যায় না, "আপনার কোনও কিছুর উপর মায়া পড়েনি?"

হৈমন্তী দুদিকে মাথা নাড়ে, "উঁহু, মায়া খুব বিপদ্দজনক জিনিস, বিশেষ করে আমার জন্য।"

— "আপনার জন্য?"

— "আমার একটা সিক্রেট আছে, যেটা তুমি জানো না।"

হৈমন্তীর মনে হয় অশ্বিনী নিঃশব্দে হাসছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না বলে নিশ্চিত হতে পারে না, নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, তোমার কোনও সিক্রেট নেই? যেটা আমি জানি না..."

— "কীরকম সিক্রেট?"

— "এই যেমন ধরো, তোমার জন্ম, বাবা-মা, কিংবা ছোটবেলার কোনও স্মৃতি, যার কথা কাউকে বলোনি তুমি? এমন কী কোনও বন্ধুকেও না।"

— "আমার কোনও বন্ধু ছিল না কোনওদিন।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে অশ্বিনী। জলের উপরে তার লাঠির আওয়াজ ভেসে আসে ছলাত্-ছলাত্ করে। হাওয়ার জোর বেড়ে উঠেছে এতক্ষণে, দাঁড় বাইতে বাইতে সে বলতে থাকে, "আজ দশ বছর আগে, এই ডোবাটার ঠিক পাশে একটা সাংঘাতিক বড় বটগাছ ছিল, জানেন? দিগন্তছোঁয়া এই মাঠের মাঝে একটা মাত্র ডোবা, তার পাশে একটা মাত্র বটগাছ।

লম্বালম্বা ঝুরি ছিল গাছটার। আর এই বড় দৈত্যর মতো চেহারা। রাত হলে আমি এখানে এসে ওর সব থেকে উঁচু ডালে উঠে শুয়ে থাকতাম, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম সারারাত। তখন আমার একটা ইচ্ছা করত, খুব ইচ্ছা করত, কিন্তু সেই ইচ্ছাটার কথা কেউ জানে না।"

— "কী ইচ্ছা করত তোমার?" হৈমন্তীর গলা শুকিয়ে এসেছে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আমার মরে যেতে ইচ্ছা করত তখন।"

— "ওয়াট রাবিশ! তোমার মতো মানুষের এসব কথা মাথায় আনাও পাপ।"

— "পাপ বলেই তো সিক্রেট, তাই না? অনেকের তো এমন সিক্রেটও থাকে যেগুলো পাপ নয়..." কথাগুলো বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ায় অশ্বিনী। গাছের গুঁড়িটা এসে ঠেকেছে ঢিবির একপ্রান্তে। লাফ দিয়ে সেটার উপরে এসে পড়ে আবার একটা হাত বাড়িয়ে দেয় সে, "আসুন।"

দু'জনে ডিবিটার উপর এসে বসে পড়ে। ঢিবিটা বসার জন্য খুব একটা ছোট নয়, কিন্তু কিছুটা সমতলের পরেই ঢাল শুরু হয়েছে। সেখানে বসলে গড়িয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। হৈমন্তী অশ্বিনীর গা ঘেঁষে বসে। তারপর দূরের দিকে চেয়ে থাকে।

দু'চোখ ভরে যাওয়া মাঠ জুড়ে গোটা চারেক হাওয়ার স্রোত খেলা করছে। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে তারা। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সব ক'টা ঝোপের মাথা নড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের।

ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে একটানা। তবে মশার উৎপাত নেই এখানে। এমন কি পোকামাকড় অবধি গায়ে এসে বসছে না। আকাশের একপাশে গোল চাঁদ উঠেছে। গোটা আকাশ দেখা যাচ্ছে বলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কিছুটা বড় দেখাচ্ছে তাকে।

— "গাছটার সঙ্গে তোমার ভারী মিল ছিল, বুঝলে।", থমথমে গলায় হৈমন্তী বলে, "যেখানে বীজ থেকে অঙ্কুর উঠেছিল সেখানেই রয়ে গেল চিরকাল। পৃথিবীর আর কোনও দৃশ্য দেখল না, অন্য কোনও পাতার স্পর্শ পেল না, মৃত্যু অবধি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।"

অশ্বিনী হাসে, "কিন্তু ওর পায়ের তলায় একটা এক বগ্গা মাটি ছিল যে, এতগুলো মানুষকে অক্সিজেন দিয়ে এল যে... এর মধ্যে সুখ নেই নাকি? সবার সুখের কারণ একরকম হয় না হৈমন্তীদেবী..."

মাথাটা ভারী হয়ে আসে হৈমন্তীর। কখন অজান্তেই সেটা অশ্বিনীর কাঁধের

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



উপরে হেলে পড়ে, তবে স্পর্শ করে না।

বাঁ হাতের একটা আঙুল তুলে পূবদিকের একটা কোণ দেখায় অশ্বিনী, ওইখানে তাকিয়ে থাকুন একটানা, একটু পরেই কিছু দেখতে পাবেন।"

— "আমি এইচ.আই.ভি পজিটিভ।"

অশ্বিনী উত্তর দেয় না। হৈমন্তী মুখ তুলে একবার তার মুখের দিকে তাকায়, তারপর ধরা গলায় বলে, "কিছু বললে না যে... এইচআইভি হল এক ধরনের..."

— "মারণরোগ... আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধকারি টি-সেলগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে এইচ.আই.ভি ভাইরাস। শুধু ধ্বংস করে দিচ্ছে তাই নয়, যে পদ্ধতিতে শরীরে টি-সেল তৈরি হয় সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েই নিজের বংশবিস্তার করছে সে। আপনার টি-সেল কাউন্ট এখন একশো আশির কাছাকাছি, মানে অ্যাকটিভ এইচ.আই.ভি। মানে খুব দ্রুত আপনার শরীর পারমানেন্টলি ইমিউনিটি হারাচ্ছে, মানে আপনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না।"

দিগন্তরেখার থেকে চোখ না সরিয়েই গড়গড় করে কথাগুলো বলে যায় অশ্বিনী। হৈমন্তীর মাথাটা এবার স্পর্শ করে অশ্বিনীর কাঁধ, প্রশ্ন করতে আর ইচ্ছা করে না তার। বাঁ হাতে ছেলেটার কবজির উপরটা আঁকড়ে ধরে সে। মসৃণ চামড়ার স্পর্শে আরাম লাগে। সাধারণ ছেলেদের চামড়া এমন মখমলের মতো হয় না, একটু আগেই নিবারণ বলেছে অশ্বিনী স্বাভাবিক মানুষ নয়, নাই বা হল, এই মুহূর্তে এই অলৌকিক পরিবেশে যে কোনও মানুষের থেকে তাকে বেশি প্রয়োজন হৈমন্তীর। কোনও অজ্ঞাত কারণে তার স্থির চোখ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে নামে, বিড়বিড় করে বলতে থাকে, "আমি এসব কথা কাউকে বলতে পারি না জানো, ট্রিট্‌মেন্ট করালে হয়তো আরও ক'টা বছর বেশি..."

— "শশশশ..." ঠোঁটের উপরে আঙুল রেখে ইশারায় হৈমন্তীকে চুপ করতে বলে অশ্বিনী, চাপা ফিসফিসে গলায় বলে, "ওই দেখুন, ওরা এসেছে..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



জলটা মুছে নিয়ে মুখ তোলে হৈমন্তী। ওদের থেকে অন্তত কয়েকশো মিটার দূরে বিস্তীর্ণ মাঠের ঝোপের উপরে কয়েকটা সাদাটে আলোর বিন্দু ফুটে উঠছে। মাটি থেকে কয়েক মিটার উপরে লাফিয়ে উঠছে আলোগুলো, তারপর আবার ফুরিয়ে গিয়ে নেমে আসছে মাটির বুকে। ঠিক যেন একদল অদৃশ্য জাদুকর মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আলোর গোলা নিয়ে জাগলিং করছে।

হৈমন্তী হতবাক হয়ে গেছিল, কয়েক সেকেন্ড এক মনে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেই বিস্ময় আর উচ্ছ্বাস এক সঙ্গে ফুটে উঠল তার মুখে, "আলেয়া! উইলো দ্য উইস্প!"

— "ব্যস, দিলেন সব মাটি করে।" অশ্বিনী ব্যাজার মুখে বলল, "ভাবলাম আপনাকে একটু ভূতের ভয় দেখাব..."

খুশিতে ঢিবির উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে হৈমন্তী, অবাধ খুশির ঢেউ এসে ভরিয়ে দিচ্ছে তার মুখটা।

— "কতদিনের ইচ্ছা ছিল আলেয়া দেখব... শুধু বইতে পড়ে এসেছি, উফফফ... তোমাকে যে কী বলে..."

— "শুধু ওইটুকুই ইচ্ছা ছিল না আরও কিছু..."

শিশুর মতো লাফাতে শুরু করেছে হৈমন্তী, "মা ছোটবেলায় বলতো যে মাঝিরা নৌকাডুবি হয়ে মরে যায় তাদের আত্মাই আলোর মতো দেখা যায় নদীর ধারে, আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করত সামনে থেকে।"

— "তাহলে চলুন, সামনে থেকে দেখবেন।"

একটু থমকে যায় হৈমন্তী, "কী করে যাব? জায়গাটা তো জলকাদা, তাছাড়া ঠান্ডা লেগে..."

— "আপনি তো বেশিদিন বাঁচবেন না, শরীরের এত ভয় কীসের?"

হৈমন্তী এবার হো-হো করে হেসে ওঠে, "এক্স্যাক্টলি, যে জিনিস বিক্রি হয়ে গেছে তা নিয়ে আবার দরদাম কীসের? চলো, আজ আলেয়া ধরতে যাব।"

অশ্বিনীও উঠে দাঁড়ায়, "আলেয়ার পিছনে ছোটা মানে জানেন তো? এমন

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কিছুকে ধাওয়া করা যা সত্যি নয়, এক কথায় মায়া... আপনি তো মায়া এড়িয়ে চলেন।"

উত্তর দিতে আর দাঁড়ায় না হৈমন্তী। তার শরীরটা টলে পড়ে যাচ্ছিল ঢাল বেয়ে, অশ্বিনী প্রায় বিদ্যুৎ গতিতে দু'হাতে ধরে নেয় তাকে। দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়। মাতালের মতো খিলখিল করে হাসে হৈমন্তী। ধরা গলায় ভুল লিরিকে গান গাইতে থাকে। অশ্বিনীর কান বন্ধ করার সুযোগ নেই। দু'হাতে ঠিক যেন একটা তুলোর বস্তা হাতে নিয়েছে সে। সেইভাবেই জলের উপরে নেমে আসে ধীরে ধীরে।

— "অশ্বিনী স্বাভাবিক মানুষ নয়... অন্তত কয়েকশো বছর ধরে বেঁচে আছে ও, নিবারণকে খুন করতে চায় ও, সুমিতাকেও হয়তো ওই খুন করেছে..." কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে হৈমন্তীর কানের কাছে। ছেলেটার মাংসল হাতের কনুইয়ের উপর ওর মাথাটা। ওর মুখের দিকে তাকালে অন্তহীন আকাশের আবখানা দেখা যায়। বাকিটা ঢাকা পড়েছে অশ্বিনীর নাক, ঠোঁট আর গালে। হৈমন্তীর ঘোর লাগে, মনে হয় মৃত্যু দূত এসে ওর অবিনশ্বর আত্মাকে সদ্যজাত শিশুর মতো বয়ে নিয়ে চলেছে মহাকালের দিকে।

ঘোরের মধ্যেই ওর ঠোঁটের কোণ থেকে অস্ফুটে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, "কে তুমি?" তারপর চোখ বুজে আসে।

ঝিলটা পেরিয়ে এসে হৈমন্তীকে নামিয়ে রাখল অশ্বিনী। মৃদু গলায় প্রশ্ন করল, "হাঁটতে পারবেন?"

— "পারব।"

হাঁটতে কিন্তু পারল না হৈমন্তী। তার মাথার ভিতরে সব গুলিয়ে যেতে শুরু করেছে। শরীরের ভিতরের সব শক্তি যেন শুষে নিয়েছে কেউ। চোখ দুটো কিছুতেই খোলা থাকতে চাইছে না। কিছুদূর গিয়েই মাটির উপরে গড়িয়ে পড়ল। মাটিতে বসেই অশ্বিনীর একটা হাত ধরে ফেলল। সামনের ঘাসের জমিটা দেখিয়ে বলল, "বসো এখানে।"

কথা না বাড়িয়ে বসে পড়ল অশ্বিনী, তার চোখে-মুখে কোনও অভিব্যক্তি

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হৈমন্তীর ক্লান্ত মুখের দিকে।

— "আমাকে দিয়ে হবে না, এ জীবনে আর হবে না..."

অশ্বিনী উত্তর দিল না, "পৃথিবীতে আর জন্মাবেন না আপনি। এ জীবনে না হলে আর হবে না কোনওদিন।"

বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি নামতে শুরু করেছে আবার। অশ্বিনীর মুখের উপর এসে পড়ল কয়েক ফোঁটা। চাঁদের আলোয় তরল স্বচ্ছ পারদের মতো চকমক করে উঠল তারা। হৈমন্তী একটা হাত দিয়ে মুছিয়ে দিল জলটা, তারপর অবসন্ন গলায় বলল, "আমার শরীর চলতে চায় না আর। গলা অবধি লাল দগদগে দাগে ভরে গেছে। চোখের তলা লাল হয়ে আসছে ইদানীং, ঘুমাতে ঘুমাতে কতবার রক্তবমি করি তুমি জানো না...।"

— "আমি জানি।"

— "কিছু জানো না, জানলে এভাবে কাছে আসতে না। আমার রক্ত বিষাক্ত, শরীরের সমস্ত তরল বিষাক্ত।"

হাত বাড়িয়ে হৈমন্তীর চোখের তলা থেকে নোনতা জলের কয়েকটা ফোঁটা মুছে দেয় অশ্বিনী, "এই তরলটা বিষাক্ত নয়। যাক গে, চলুন।"

— "কোথায়?"

— "আলেয়া দেখতে যাবেন না?"

তীব্র মাথা নাড়ায় হৈমন্তী, "বললাম তো, আমি পারব না। আমার শরীরে হাঁটার শক্তি নেই।"

কাঁধ ধরে হৈমন্তীকে দাঁড় করিয়ে দেয় অশ্বিনী। তারপর অবলীলায় তার প্রায় স্পন্দনহীন দেহটাকে পিঠে চাপিয়ে নেয়। দুটো হাত বুকের কাছে ঝুলতে থাকে। দু পা দিয়ে কোমর আঁকড়ে ধরে।

জোরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে এতক্ষণে। তার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকে অশ্বিনী। হৈমন্তী দুবলা হলেও একটা মানুষের ওজন কাঁধে নিয়েও অশ্বিনীর পা এতটুকু কাঁপছে না। যেন চাইলে এমন আরও দশটা মানুষকে নিয়ে নির্দ্বিধায় হেঁটে যেতে পারে সে। বৃষ্টিতে ওদের দু'জনের সমস্ত শরীর

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ভিজে ওঠে। হৈমন্তীর আধখোলা অসুস্থ চোখে চারপাশের দৃশ্য ভ্যান গখের ছবির মতো বিমূর্ত হয়ে ওঠে যেন।

মুশলধারে বৃষ্টি নেমেছে এখন। আর আলেয়া ফুটবে না। জলার উপরে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে অশ্বিনী। একটু আগে এখানেই জ্বলছিল আলেয়া। এখন পোড়া পাতার ছাই ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে কিছুটা মিলিয়ে আসা আগুনের গন্ধ।

ফাঁকা জায়গাটার উপরে শুয়ে পড়ে হৈমন্তী। অশ্বিনীও হয়তো হাঁপিয়ে গেছে এতদূর এসে। সেও পাশে শুয়ে পড়ে। দু'জনে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ঘন মেঘে ঢেকে যাওয়া মৃত তারাগুলোর শবদেহের দিকে। কেউ কোনও কথা বলে না। শুধু হৈমন্তীর অসুস্থ, তাল কেটে যাওয়া নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় একটানা।

— "আমার একটা ইচ্ছা আছে, জানো?"

— "কী?" আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে জিজ্ঞেস করে অশ্বিনী।

— "ইউজিন শুমেকারের নাম শুনেছ?"

— "না, কে ছিলেন?"

— "মহাকাশবিজ্ঞানী। ভারী জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। প্রায় সবকটা এপেলো অভিযানের নেপথ্য কারিগর..." হাঁফ ধরা গলায় বলতে থাকে হৈমন্তী, "চাঁদে পা রাখার ভারী শখ ছিল ভদ্রলোকের। যাওয়া একরকম নিশ্চিতও ছিল, কিন্তু এডিসন ডিজিজ নামে একটা রোগ হয় শুমেকারের, ফলে তার মহাকাশে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না..."

— "তারপর?"

এবার অশ্বিনীর মুখের দিকে তাকায় হৈমন্তী, "তারপর একদিন গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান ভদ্রলোক। ঘটনাচক্রে তার পরদিনই নাসার লুনার প্রস্পেক্টার স্পেসক্রাফটের চাঁদে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল। সেই স্পেসক্রাফটের সঙ্গে শুমেকারের খানিকটা শরীর পোড়া ছাই চাঁদে পাঠায় নাসা। চাঁদের বুকেই সমাহিত হন তিনি। তিনিই একমাত্র মানুষ যার দেহকণা মিশে আছে চাঁদের

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



মাটিতে... আমিও তাই চাই।"

শেষ কথাটা শুনে একটু অবাক হয় অশ্বিনী, "আপনি চান আপনাকেও চাঁদের মাটিতে কবর দেওয়া হোক?"

— "উঁহু..." আকাশের বুক জুড়ে ফুটে থাকা রুপোলি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমন্তী, "চাঁদে নয়, গোটা আকাশ জুড়ে... ধুলো হয়ে থাকতে চাই আমি..."

হৈমন্তীর বাকি কথাগুলো মিলিয়ে আসে, মনে হয় একটা কবিতা বলার চেষ্টা করছে সে, অশ্বিনীর কানে আসে শব্দগুলো —

And– when he shall die
Take him and cut him out in little stars
And he will make the face of heaven so fine
That all the world will be in love with night
And pay no worship to the garish sun.

রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে ক্রমশ। হৈমন্তীর ঘুম পায়। শীতের রাতে, খোলা আকাশের নিচে, ভেজা মাটিতে পিঠ রেখে, অশ্বিনীর শরীরের স্পর্শে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

একবার অজান্তেই চোখ খুলে যায় তার, মনে হয় রক্তে ভিজে গেছে মুখের পাশের ঘাসগুলো। পাশে তাকিয়ে দেখে অশ্বিনী কোথাও নেই। মাঠ জুড়ে কেবল একটা দুরন্ত হাওয়া খেলা করছে।

— "অশ্বিনী, কোথায় তুমি?" অসহায় কণ্ঠে চাপা চিৎকার করে ওঠে সে।

— "আমি আছি, আপনি ঘুমান।" গম্ভীর আওয়াজটা ঠিক কোথা থেকে আসছে হৈমন্তী বুঝতে পারে না। তবে গলাটা চেনা লাগে তার। নিশ্চিন্তে আবার ঘুমিয়ে পড়ে...

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# দশম অধ্যায়

কার্নিশ থেকে ঝাঁপিয়ে নিচে নেমে এল গনশা। ভোর হয়ে আসছে। গ্রামের দিকে লোকের ঘুম তাড়াতাড়ি ভাঙে। ফলে আর দেরি করলে যে কেউ দেখে নিতে পারে। অবশ্য চুরি সে করছে না। যেটা করছে সেটা আদৌ যে কী তা গনশা নিজেও জানে না। তবে জানলার একেবারে উপর থেকে লোহার বাক্সটা নামাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে তাকে। পায়ের কয়েক জায়গায় নুনছাল উড়ে গেছে। সমস্ত গা জুড়ে ধুলোর একটা পরত জমেছে।

মাটিতে নেমে গা'টা ঝেড়ে নিল। ভাসানবাড়ির পাঁচিলের বাইরে লোকজনের যাতায়াতের শব্দ আসছে এখন। কেউ দেখে ফেলেনি তো?

কাঁধ থেকে একটা ব্যাগ ঝুলছে গনশার। সেটা কাঁধ থেকে হাতে নিয়ে ভিতর থেকে একটা বাক্স বের করে আনে সে। ভারী সুন্দর দেখতে বাক্সটা। পিতলের মতো রঙ, আর তেমনই ভারী। উপরে একটা সিন্দুকের মতো ডালা আছে, সেই ডালার উপরে আর বাক্সের চারদিকে নানা রঙের কয়েকটা পাথর বসানো আছে। নিশ্চয়ই অনেক দাম হবে পাথরগুলোর? একবার লোভও লাগে গনশার, কিন্তু সে চোর নয়।

গনশার মা, বাবা কেউ বেঁচে নেই। আপন কাকার কাছে মানুষ হয়েছে সে, কাকা মানুষটা খারাপ নয়, কিন্তু বেজায় গরীব। গনশাকে ইচ্ছা থাকলেও পড়াশোনা শেখাতে পারেনি সে।

বছর পাঁচেক আগে কাকা গনশাকে নিয়ে কলকাতায় গেছিল টুকটাক কিছু কাজের খোঁজে, কাজ তেমন কিছু পায়নি। দিনে রিকশা চালাত, রাতে একটা মাংসের দোকানে হেল্পারের কাজ করত। কয়েক মাস সেখানে থেকে তেমন জুত করতে পারেনি বলে আবার গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু তার মধ্যেই একটা আজব নেশা চড়ে বসেছে গনশার ঘাড়ে— শহরের নেশা। এখানে এত রকম কলকারখানা, এতরকম ব্যবসা, এত মানুষ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাস্তাঘাটে,

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



এখানে খুঁজলে নিশ্চয়ই কোথাও গুপ্তধন পাওয়া যায়। ওইতো রাস্তার ধার জুড়ে ঝাঁ চকচকে ঠান্ডা দোকানের কাউন্টারে বসে যারা হাত পেতে টাকা নিচ্ছে, তারা পেয়েছে। গনশা বুঝেছে মুরগি কেটে, রিকশা চালিয়ে শহরে বেঁচে থাকা যায় বটে, কিন্তু শহরের আসল মজা নেই তাতে। তার জন্যে অন্য খেলা খেলতে হয়। খেলাটা বোঝার আগেই কলকাতা ছাড়তে হয়েছে।

বাড়ির পেছন থেকে সামনের দিকে আসতেই থমকে যায় গনশা। বাগানের লাগোয়া কাঠের বেঞ্চে কেউ বসে আছে। মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে না গনশা, তবে গুনগুন করে একটা গান গাইছে লোকটা। বুকটা দুরুদুরু করে উঠল তার। দেওয়াল ঘেঁষে একবার উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হল, নিতাইকাকা। তবে যেই হোক না কেন, ঝোলার ভিতরে কী আছে সেটা জানানো যাবে না।

দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে চোখে না পড়ে উপায় নেই। কোনওরকমে ব্যাগটা আড়াল করে পার হতে যাচ্ছিল গনশা, কিন্তু এড়াতে পারল না।

— "হেই বান্দর পোলা, ইদিকে আয়..."

গনশা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় নিতাইয়ের সামনে। নিতাই ছলনা করে তার দিকে জ্বলন্ত বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, "টানবা?"

গনশা দু'দিকে মাথা নাড়ে।

বাতাসে খানিক ধোঁয়া ছাড়ে নিতাই, "তাইলে? হালায় পড়ালিখা তো করস না, বিড়ি টানবা, লোকের পোঁদে লাগবা..." খানিক থেমে বলে, "তোর গার্জেন টাও একখান খাটাস, পোলার বেরেন ব্রাইট কেবল ঘষামাজা হয় নাই। ফাঁকা পইড়া আসে, আর ফাঁকা মাথা হইল..."

— "শয়তানের আস্তানা।" অপরাধীর মতো মুখ করে গনশা বলে।

— "কাম সারসে! জ্ঞান তো দেহি কম নাই, কই হাতখান দে তো..."

প্রায় জোর করেই গনশার হাতটা টেনে নেয় নিতাই, তারপর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রেখাগুলোর দিকে। কয়েকবার মুখটাকেও জরিপ করে নেয়। মনে হয় বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করছে। মুখ না তুলেই বলে, "শুন, তোর কাকারে গিয়া কইবি নিতাইকাকা বলসে তোর

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কপালে যশ আছে, কিন্তু তাইল্লিগা পড়ালিখা করা লাইগবে।"

গনশা উত্তর দেয় না, দু'দিকে মৃদু মাথা দোলায়। সেটা নিতাই লক্ষ্য করেনি তাই বলে, "কী অইল?"

— "হাত দেখে ভাগ্য বলা যায় না।"

নিতাই অপলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে গনশার দিকে, তারপর তার পিঠে একটা বড়সড় চাপড় মেরে বলে, "বড় হও বাপ, অনেক বড় হও... উতে কী আসে?"

কাঁধের ঝোলায় চোখ পড়েছে নিতাইয়ের। গনশা একটু সামলে নিয়ে বলে, "মা... মাটি।"

— "মাটি! কিল্লিগা?"

গনশা কাঁধ ঝাঁকায়, তারপর সন্দেহজনক ভাবেই উপরে দৌড় দেয়। মিথ্যে বলে বেশিক্ষণ নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারে না সে।

হৈমন্তীর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের দরজা বন্ধ। দরজার নিচ দিয়ে অন্ধকার উঁকি দিচ্ছে। গনশা বাইরে থেকেই দেখেছে দিদিমণি জানলা খুলে শোয়নি আজ। দরজার উপর হাত চালায় সে, "দিদি, ও দিদি... আমি গনশা..."

প্রায় মিনিট দশেক পর গনশা যখন ফিরে যাওয়ার উপক্রম করেছে ঠিক সেই সময়ে কাষ্ঠল শব্দ করে দরজাটা খুলে যায়। হৈমন্তীর চেহারাটার দিকে চেয়ে গনশা অবাক হয়ে যায়। শরীরের বেশিভাগটাই একটা চাদরে জড়ানো। চুল খড়ের গাদার মতো জট পাকিয়ে গেছে। ছেঁড়া পুতুলের কথা মনে পড়ে মুখের দিকে তাকালে।

— "কী রে? আজ এত সকাল সকাল?" ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করে হৈমন্তী। হাত দিয়ে মুখের সামনে থেকে চুল সরায়।

গনশা কথা না বলে ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বাক্সটা বের করে এনে তার সামনে তুলে ধরে। সেটা দেখেই হৈমন্তীর মুখে কয়েকটা সতর্ক রেখা খেলে যায়, দু'পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গনশার হাত ধরে একটা

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হ্যাঁচকা টানে তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নেয় সে। তারপর দরজাটা আঁটসাঁট করে বন্ধ করে দেয়।

ভিতরে এসেই অবাক হয়ে যায় গনশা। তার মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে, "নিবারণকাকা!"

নিবারণ একটা শুকনো হাসি হেসে মাটির উপরেই বসে পড়ে। হৈমন্তী একটা হাত গনশার মাথায় রেখে বলে, "উনি যে এখানে এসে আছেন সেটা কাউকে বলিস না কিন্তু, অশ্বিনীকে তো একেবারেই নয়। কেমন?"

গনশার মুখ থেকে বিস্ময়টা যায় না, সে আর কথা না বাড়িয়ে 'আচ্ছা' বলে মাথা নেড়ে দেয়।

এতক্ষণে বাক্সটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছে হৈমন্তী। ডালার ঠিক সামনে একটা ছোট চাবি ঢোকানোর গর্ত। ডালাটা শক্ত হয়ে এঁটে আছে। টানাটানি করেও খুলল না সেটা। কানের কাছে ধরে হৈমন্তী বলল, "কাগজপত্র ছাড়াও সলিড কিছু আছে মনে হচ্ছে। কিন্তু খুলতে গেলে তো চাবি লাগবে।"

— "চাবি!" নিবারণ নিচু স্বরে বলে, "একটা চাবির গোছা আমাকে দিয়েছিলেন বড়কত্তা। তাতে একটা এমন চাবি ছিল যেটা দিয়ে কিছুই খুলত না। তবে গোছের মধ্যে ছিল চাবিটা।"

— "চাবির গোছটা কোথায় এখন?"

নিবারণ কোনও কথা বলে না। কেবল ইশারা করে একটা। হৈমন্তী বুঝে যায় উত্তরটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। কী একটা মনে পড়তে নিবারণ বলে, "না, মনে পড়েছে। চাবিটা এখন আর গোছে নেই। আগের বছর আমিই খুলে নিয়ে রাখতে দিয়েছিলাম নিতাইকে।"

— "নিতাইকাকাকে! কেন?"

— "ও বলছিল চাবিটা নাকি লোহার নয়, অন্য কোন ধাতুর তৈরি। কোন ধাতু সেটা ও একটু পরীক্ষা করে দেখবে। কোনও কাজে লাগত না চাবিটা, আমি আর আপত্তি করিনি।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "নিতাইকাকা নিচে বসে আছে, আমাকে আসতে দেখেছে।" কেউ কিছু বলার আগেই গনশা বলল।

— "গিয়ে বল চাবিটা নিয়ে উপরে চলে আসতে। আর দাদার সঙ্গে দেখা হলে..."

— "কিছু বলব না..."

হৈমন্তী হাত বাড়িয়ে তার গাল টিপে দেয়। গনশা দৌড়ে নিচে নেমে যায়, বাক্সটা তার মনের ভিতরেও কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে।

দরজা বন্ধ করে আবার বাক্সের উপরে ঝুঁকে পড়ে হৈমন্তী। গলা ঠেলে বেরিয়ে আসা কাশির একটা দমক কাঁপিয়ে দেয় তাকে। কবজিটা মুখের সামনে ধরতে কিছুটা রক্ত এসে পড়ে। সেটা মুছে নিয়ে ডালার উপরটা ভালো করে লক্ষ্য করে বলে, "কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।"

— "কী?"

— "উপরের পাথরটার নিচে কোন ধাতু নেই, ডালার গর্তের মধ্যে চেপে বসানো আছে পাথরটা। নিচের হলদে কাগজে লেখা কিছু একটা শব্দকে রিফ্লেক্ট করছে।"

আরও কিছুটা অন্ধকারের মধ্যে বাক্সটাকে টেনে আনে হৈমন্তী। তারপর একটা টর্চ জ্বেলে তার আলোটা ফেলে পাথরের একেবারে উপরে। ভুরু দুটো কুঁচকে যায় তার, মুখ তুলে বলে, "একটাই ওয়ার্ড পড়া যাচ্ছে– চিড়িয়াখানা।"

— "চিড়িয়াখানা!"

— "হ্যাঁ, সঙ্গে আরও কিছু লেখা আছে হয়তো, কিন্তু পাথরের গায়ে ওটুকুই পড়া যাচ্ছে। এখানে কাছেপিঠে কোথাও চিড়িয়াখানা আছে নাকি?"

— "এখানে আবার কোথায় চিড়িয়াখানা থাকবে?" নিবারণ হাত উলটে বলে।

— "তাহলে এ-বাড়ির কোনও জায়গা যেখানে পশুপাখি থাকত।"

সজোরে মাথা দোলায় নিবারণ, "আমার তো পঞ্চাশ বছর কেটে গেল এই বাড়িতে, কই চিড়িয়াখানা বলে কিছুর কথা তো শুনিনি।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ঠান্ডা লাগতে শুরু করেছে হৈমন্তীর। ভোরের বাতাসে শিরশিরানি ভাব খেলা করছে। দূরে কোনও কুঁড়ে ঘরের সামনের চাতালে মোরগ ডেকে উঠছে। গোয়াল থেকে গরুর পাল বেরিয়ে এসে মাটির উপরে ঠকঠক শব্দ তুলে হেঁটে যাচ্ছে মাঠের দিকে।

পাশবালিশে পিঠ রেখে শরীর এলিয়ে দেয় হৈমন্তী, "আপনি পঞ্চাশ বছর এখানে আছেন, তার আগের কথা আপনার জানা নেই কিছু? মানে এ বাড়ি তৈরি হওয়ার সময়কার কথা?"

— "না! বাড়িটার দায়িত্ব যখন পাই তখন আমার বয়স পনেরো। ওসব নিয়ে সে বয়সে বড়কর্তাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।"

বিছানা হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নেয় হৈমন্তী, লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলে, "আমি কিছু জানি। তবে তার পুরোটা সত্যি নাও হতে পারে। মুরারিমোহন নামে এক নামকরা সায়েন্টিস্ট তৈরি করেন এই বাড়িটা। আমার ধারণা তার কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবত স্পেস, টাইম নিয়ে চূড়ান্ত গোপনীয় কোনও রিসার্চ করছিলেন তিনি।

তার কাছে ছিল ততোধিক গোপনীয় একটি রেলিক। লন্ডন মিউজিয়ামে ওই বছরই ইজিপ্ট থেকে একটি শিপমেন্ট আসে। আর্কিওলজিকাল সাইট থেকে যখন কোনও মিউজিয়ামে শিপমেন্ট আসে তখন তাতে কী কী জিনিস আছে তার একটা লিস্টও পাঠানো হয়। সময়টা দেড়শ বছর আগে, ফলে ডিজিটাল কিছুই ছিল না। সমস্তটাই হাতে লেখা।

ঘটনাচক্রে শিপমেন্ট খোলার ঠিক পরপরই সেই লিস্টটা খোয়া যায়। এবং দিনতিনেক পরে লিস্ট আবার মামুলি খোঁজাখুঁজির পর ফিরে আসে। এবার ভেবে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন এই তিনদিন লিস্টের গা ঢাকা দেওয়ার একটাই কারণ। শিপমেন্টের বিশেষ একটি আইটেম কেউ সরিয়ে নিয়েছে। তার বদলে সেই আইটেমের অনুরূপ একটি নকল তৈরি করে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েছে। খুঁজে পাওয়া লিস্টের সমস্ত জিনিস শিপমেন্টের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় কারও মনে কোনও সন্দেহ জাগেনি। এমনকী যে আর্কিওলজিস্টরা

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



শিপমেন্ট পাঠিয়েছিল তাদের মনেও নয়।"

সমস্ত ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ছকে নিতে একটু সময় লাগে নিবারণের, খানিক ভেবে সে বলে, "কিন্তু এর জন্যে লিস্টটা চুরি করার কী দরকার ছিল? জিনিসটা দেখে নিয়ে তার নকল বানিয়ে সেটা বদলে নিলেই তো সহজ হত।"

— "উঁহু, হত না। আর্কিওলজিস্টরা জিনিসটা ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তবে মিউজিয়ামে পাঠিয়েছেন। ফলে চোরকে যে নকলটা তৈরি করতে হবে সেটার ভয়ানক রকম পারফেক্ট হওয়া দরকার।"

— "কিন্তু জিনিসটা কী?"

টেবিলের উপর থেকে নিজের ল্যাপটপটা টেনে নিয়ে সেখানে একটা বিশেষ ছবি ওপেন করে হৈমন্তী, নিবারণের মাথা আরও খানিকটা ঘেঁটে যায়।

— "এই জিনিসটার নাম অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজম। ১৯০১ সালে গ্রীসে সমুদ্রের তলা থেকে উদ্ধার করা হয়। ভারী অদ্ভুত একটা যন্ত্র। পৃথিবীর প্রথম তৈরি হওয়া অ্যানালগ কম্পিউটার।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "কম্পিউটার!" অবাক হয়ে যায় নিবারণ।

— "হ্যাঁ। যীশু খ্রিস্টের জন্মের দু'শো বছর আগে তৈরি হওয়া কম্পিউটার।"

— "কী কাজ হত এতে?"

ছবিটার দিকে ঘুরে তাকায় হৈমন্তী, "সেটা বলা মুশকিল। তবে বিজ্ঞানীরা এর গঠন দেখে অবাক হয়ে যায়। বত্রিশটা ছোট-ছোট যন্ত্রের কারসাজি আছে এর মধ্যে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ধূমকেতুর আবির্ভাব, নক্ষত্রদের অবস্থান থেকে শুরু করে আরও হাজার রকমের মহাজাগতিক ঘটনা ঠিক কবে ঘটবে সেটা প্রেডিক্ট করা যায় এই যন্ত্র দিয়ে। সোজা কথায় বলতে গেলে একটা মহাজাগতিক ঘড়ি! আর সেখানেই সমস্যা, আমরা যাকে ঘড়ি বলি তা আবিষ্কার হয় এটা তৈরি হওয়ার হাজার বছর পরে।"

নিবারণ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না, হৈমন্তী একটু থেমে নিজে থেকেই বলে, "যন্ত্রটা যে বত্রিশটা যন্ত্রাংশ নিয়ে তৈরি সেগুলো ছাড়াও আরও অন্তত কুড়িটা যন্ত্রাংশ ছিল এর মধ্যে, যেগুলো সময়ের ধাক্কায় হারিয়ে গেছে। কিছু লোকের ধারণা এই সমস্ত যন্ত্রাংশ একসঙ্গে করলে এন্টিকাইথেরা মেকানিজমের কাজ শুধু মহাজাগতিক ঘটনাকে প্রেডিক্ট করা নয়...

এবার দেখুন এটা আবিষ্কার হয় ১৯০১ সালে। মুরারিমোহন এই বাড়ি তৈরি করেন তার পঞ্চাশ বছর আগে। অর্থাৎ এইটার কথা তখনকার মানুষ জানত না। ধরুন ওই আঠেরোশো পঞ্চাশ নাগাদ ইজিপ্ট থেকে ঠিক এইরকম একটা যন্ত্র কোনও পিরামিডের ভিতর থেকে পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা তখন মহাজাগতিক ঘড়ি বলে কিছু হতে পারে সেটা জানেন না। তারা ততটা গুরুত্ব দিলেন না। তখন সবে ক্যামেরায় ছবি তোলা শুরু হয়েছে। ছবি তোলা তখন ভয়ানক ব্যয়বহুল। ফলে ছবি না তুলেই প্রাথমিক কিছু দেখাশোনা করে তারা পাঠিয়ে দিল লন্ডন মিউজিয়ামে। এদিকে লন্ডন মিউজিয়ামের কোনও ক্ষমতাবান কর্তা সেটা সরিয়ে তার মতো আর একটা যন্ত্র বসিয়ে রাখলেন সেখানে। ভদ্রলোক এতই ক্ষমতাবান ছিলেন যে যারা বুঝতে পেরেছিল জিনিসটা ফেক তাদেরকেও মন্ত্রগুপ্তি শিখিয়ে দেওয়া হল।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "কিন্তু জিনিসটা চুরি করলেন কেন?"

— "কারণ..." সিগারেটে একটা বড় করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল হৈমন্তী, "কারণ অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের মতো এ যন্ত্রটা খোঁড়া ছিল না। এর সব ক'টা যন্ত্রাংশই সচল ছিল। সমুদ্রের তলায় হাজার বছর কাটিয়ে যন্ত্র ক্ষয়ে যেতে পারে, কিন্তু পিরামিডের তলায় গোপন আস্তানায় সেই সম্ভাবনা কম। সে যন্ত্র তখনও তার ইপ্সিত কাজটি করতে পারে। এবং আমার ধারণা এই যন্ত্রটিকে নিয়েই শহর থেকে দূরে এসে এই ভাসানবাড়িতে গবেষণা করছিলেন মুরারিমোহন। তবে তারপর কী হয় তা আমি জানি না।" হাতের বাক্সটার দিকে চেয়ে বলে, "এর মধ্যে হয়তো কিছু উত্তর পাওয়া যেতে পারে।"

বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলে না কেউ। মিহি সাদাটে ধোঁয়া শুধু নানা আকৃতির নকশা কাটতে থাকে বদ্ধ ঘরের বাতাসে। মিনিট পাঁচেক পর নিবারণ মুখ তুলে বলে, "কিন্তু আপনি এসব জানলেন কী করে?"

হৈমন্তী হাসে, "জানিনি। জানানো হয়েছে। আমি ভাসানবাড়িতে কোনও সোসাইটির কাজে আসিনি। অস্মিতার সঙ্গে গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব পাতাই শুধু এ বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার জন্যে। আমার সত্যিকারের উদ্দেশ্য অন্য। মিথ্য যদি সত্যি হয়, আই মিন... জিনিসটা সত্যি যদি এ বাড়িতে থাকে তাহলে সেটা একটা সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে আমাকে। যাদের হাতে তুলে দেব তারা বড় সুবিধের লোক নয়।"

একটা লালচে ভাব ছড়িয়ে পড়ে নিবারণের মুখ জুড়ে, গলকষ্ঠটা বার কয়েক দপ্‌দপ্‌ করে থেমে যায়, "আমাকে এসব বললেন যে..."

হৈমন্তীর হাতের কাছ থেকে চাদর সরে গেছে, ডেভিল ট্যাটুর খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে, "আপনাকে বলা সেফ। কারণটা মনে হয় আপনিও জানেন।"

বাইরে দরজার উপরে আবার খট্‌খট্‌ শব্দ শোনা যায়। এবার নিবারণই উঠে দরজা খুলে দেয়। গনশা মুখ নামিয়ে বলে, "নিতাইকাকা বলল কাজ আছে, এখন আসবে না।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আর চাবি?" হৈমন্তী পিছন থেকে জিজ্ঞেস করে।

— "চাবি আনতে কাকার বাড়ি গেছিলাম। কাকিমা বলল ক'দিন আগে এসে দাদা নিয়ে গেছে চাবিটা, বলেছে কী একটা খুলতে নাকি কাজে লাগবে।"

— "শিট!" হৈমন্তী নিজের থাই-এর উপরে একটা চাপড় মারে, "চাবি অশ্বিনীর কাছে, ওর চোখ এড়িয়ে থেকে ওটা চুরি করে আনা অলমোস্ট ইম্পসিবল।" হতাশ দেখায় তাকে।

— "না..." বাইরের দরজাটা বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে আসে গনশা। ওর মুঠো করা ডানহাতটা খুলে এগিয়ে দেয় হৈমন্তীর দিকে, "তুমি বলেছিলে ওই গেমটায় জেলের চাবি খুঁজে দেবে আমাকে..."

গনশার হাতের মুঠোর মধ্যে শুয়ে রয়েছে একটা ইঞ্চি তিনেক লম্বা, অজ্ঞাত ধাতুর খাঁজকাটা চাবি। এতটুকু জং ধরেনি তাতে। হৈমন্তী সেটা হাতে তুলে মুখের সামনে ধরে। প্রশান্তির হাসি খেলে যায় তার চোখে। গনশা মিনমিন করে বলে, "এবার দাও..."

## একাদশ অধ্যায়

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে গাছে জল দেওয়ার বালতিটা নামিয়ে রেখে একবার পিছনে ফেরে অশ্বিনী। একগাল হাসে, সকালের রোদের রেখা মুখ ধুয়ে দেয় তার।

— "আমি হেল্প করতে পারি?" হৈমন্তী জিজ্ঞেস করে।

— "আপনার শরীর ঠিক আছে?"

— "এবার এই আপনি বলাটুকু ছেড়ে দাও না হয়..."

— "অভ্যেস হয়ে গেছে..." অশ্বিনী কাঁচি দিয়ে গাছের শুকনো পাতা ছাঁটতে ছাঁটতে বলে, "অভ্যেসের কথায় মনে পড়ল! আপনি আজ পঞ্চাশ মিনিট

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কম ঘুমিয়েছেন।"

— "মানে?"

অশ্বিনী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, "অন্য দিন আপনি বারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে, সাড়ে আটটায় ওঠেন। সাড়ে আটঘণ্টা। কাল তিনটেয় ঘুমিয়েছিলেন, মানে সাড়ে এগারোটায় ওঠার কথা... লোকটাকেও তাই বারোটায় আসতে বলেছিলাম..."

— "লোক! কোন্ লোক?" হৈমন্তী চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞেস করে।

— "একজন লোক দেখা করতে এসেছিলেন আপনার সঙ্গে। কোমরে একটা পিস্তল ছিল, তাছাড়া কথাবার্তায় মনে হল আপনার উপরে রেগে আছেন খানিকটা।"

একটু ইতস্তত করে হৈমন্তী বলে, "আমার অফিসের কেউ হবে। ফোন'টা খোয়া গেছে বলে যোগাযোগ করতে পারেনি। তাই হয়তো খুঁজতে চলে এসেছে।"

— "অস্ত্র নিয়ে?"

হৈমন্তী একটু অস্বস্তিতে পড়ে। জোর করে হেসে বলে, "তোমার রহস্যটা কী বলতো?"

অশ্বিনী গাছের গোড়ায় জল ছিটাতে ছিটাতে হাসে, "কী রহস্য?"

— "মানে আমি আজ অবধি যত সুপারহিরো দেখেছি তাদের সবাই প্রায় একইরকম জামাকাপড় পরে থাকে সবসময়। তুমিও সারাক্ষণ এই শাল আর সাদা পাঞ্জাবী, মানে তুমি সাধারণ মানুষ নও, তাহলে বলতো তোমার সুপার পাওয়ারটা ঠিক কী?"

— "সুপার পাওয়ার..." অশ্বিনী মন দিয়ে ভাবে, তারপর হঠাৎ আগের মতোই নিঃস্পৃহ মুখে বলে "অভ্যাস। আমার অভ্যাস সহজে ছাড়তে পারি না।"

— "বেশ, আমি আসছি দাঁড়াও।"

কথাটা বলেই ভিতরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় হৈমন্তী। অশ্বিনী একবার পিছন ফিরে দেখে। তারপর আবার নিজের কাজে মনে দেয়।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



খানিক পরে ফিরে আসে হৈমন্তী। হাতে ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেট, সেটা অশ্বিনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "নাও, এটা পরে দেখো হয় কিনা।"

— "কী এটা?"

— "পাঞ্জাবিই, তবে নতুন। অস্মিতা বলেছিল নিবারণবাবু হয়তো টাকা নিতে চাইবেন না। তাই বুদ্ধি করে ওনার জন্য কিনেছিলাম কলকাতা থেকে, উনি তো নেই, তুমিই পরো না হয়।"

— "আমি... মানে..." অশ্বিনী কী বলবে ভেবে পায় না। এর আগে কেউ এভাবে জামাকাপড় উপহার দেয়নি তাকে। হৈমন্তী নিজেই প্যাকেট খুলে পাঞ্জাবিটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলে, "তবে এটা সাদা নয়, ক্রিমসন কালার। তুমি তো আর রাজনীতিতে নাম লেখাওনি বাপু যে সাদা ছাড়া পরবে না..."

অশ্বিনী এখনও থতমত হয়ে তাকিয়ে আছে টুকটুকে লাল রঙের পাঞ্জাবির দিকে। চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে গেছে তার।

— "আর এইসব শাল-টাল আদ্যিকালের লোকেরা পরত। তাও এখন আবার বর্ষাকাল, এসব পরার দরকার নেই।"

— "আচ্ছা, আমি রেখে দিচ্ছি।"

— "আরে রেখে দিচ্ছি মানে'টা কী?" হৈমন্তী ভুরু কুঁচকায়, "পরে দেখো ঠিক ফিট হয়েছে কিনা..."

অশ্বিনীর মুখের পেশিতে অজ্ঞাত কোনও অনুভূতি খেলে যায়। সে কাঁধের শালে ভেজা হাতটা মুছে ভিতরে চলে যায়। হৈমন্তী বাগানের বাকি ফুলগুলোর দিকে তাকায়। নানা রঙের ফুল, কোন'টা টবে ফুটেছে তো কোন'টা ছোট কঞ্চির মাচার উপরে শুয়ে আছে। সদ্য বৃষ্টির জলে ভেজা বলে সব ফুলগুলোকেই বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে সে। সকালে যে লোকটা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাকে সম্ভবত চেনে হৈমন্তী। এই ক'দিনে ওদের কোনও খবরই জানাতে পারেনি সে। তাই হয়তো পথ খুঁজে চলে এসেছে। দুশ্চিন্তায় ওর মন'টা ভার হয়ে ওঠে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বাড়ির দিক থেকে পায়ের শব্দে পেছন ফেরে হৈমন্তী। বাগানে নামার সিঁড়ির ঠিক উপরে ওর চোখ আটকে যায়। মুগ্ধ হয়ে একটানা সেদিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

পাঞ্জাবিটা খানিক ছোট হয়েছে অশ্বিনীর গায়ে। হাতার কাছটা গোটাতে পারেনি ঠিক মতো। কলারটা ভিতর দিকে ঢুকে রয়েছে। তাও চোখ ফেরাতে পারল না হৈমন্তী। স্কুলফেরত ঘনায়মান সূর্যাস্ত দেখা কিশোরীর মতো একটানা তাকিয়ে রইল সে।

— "কেমন একটা লাগছে..." অশ্বিনী সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাতাটা টানাটানি করে ঠিক করতে লাগল।

— "কই দেখি, এসো এদিকে..." অশ্বিনীকে কাছে টেনে তার কলারটা বাইরে বের করে দিল হৈমন্তী। তারপর হাতাটা কনুই অবধি গুটিয়ে দিল। বুকের কাছে কুঁচকে যাওয়া ভাঁজগুলোর উপর হাত চালিয়ে কিছুটা পেছনে সরে এসে আগের মতোই স্থির নয়নে তাকিয়ে রইল ছেলেটার দিকে। কানের পেছন'টা অজান্তেই লাল হয়ে উঠল তার।

— "কী?" অশ্বিনী তার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

— "না, কিছু না।"

লাজুক হেসে মাথা নামিয়ে নিল হৈমন্তী।

— "এবার পালটে আসি।"

— "উঁহু। একটু পরে। এখন বুঝতে পারছি কেন আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকো তুমি..."

— "আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে দেখি না।"

— "তাহলে?"

অশ্বিনী প্রসঙ্গটা পালটে ফেলে, "মাঝে মাঝে আপনাকেও ভারী সুন্দর দেখায়..."

— "কখন বলতো?"

পরের কথাগুলো একটু ভেবে চিনতে বলে অশ্বিনী, "একটা কালো রঙ

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



এর শাড়ি আছে না আপনার? ধারটা লাল রঙের।"

হৈমন্তীর পা থমকে যায়। পাশ ফিরে অশ্বিনীর দিকে ঘুরে দাঁড়ায় সে, "ওটার কথা তুমি জানলে কী করে?"

— "ধরে নিন আমার আর একটা সুপারপাওয়ার..."

হৈমন্তী আবার সামনে হাঁটতে হাঁটতে বলে, "মা পুজোয় কিনে দিয়েছিল ওটা, এখন আর পরতে পারি না।"

— "কেন?"

— "আমার পেটের কাছে অনেকগুলো লালচে ব্রুজ আছে। শাড়ি পরলে ওগুলো দেখা যায়।"

— "সেই জন্যেই শাড়িটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, তাই না?"

এবার আর ফিরে তাকায় না হৈমন্তী। গলা নেমে আসে তার, অস্ফুট শব্দে বলে, "তোমার এই সুপার পাওয়ারটা ভালো লাগছে না আমার। আমার সম্পর্কে কেউ এত কিছু জানুক আমি চাই না।"

— "এর থেকে আরও বেশি কিছু জানি আমি..."

— "তাই নাকি? কই শুনি..."

— "আমি জানি আপনি প্রথম কবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আপনার নিজের মা আপনার শরীরে আঙুল ঢুকিয়ে কীভাবে আপনার সতীত্ব পরীক্ষা করেছিলেন, বা ধরুন সামাজিক কলঙ্কের দায় এড়াতে আপনার বাড়ির লোক কবে আপনাকে একটু বেশি পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল..."

আচমকাই একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় হৈমন্তীর দেহে। অশ্বিনীর বুকে, দুটো হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দেয় সে, গায়ে পা পড়া সাপের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। অশ্বিনীর আলগা শরীরটা দেওয়ালে চেপে ধরে, "হাও ডেয়ার ইউ, লজ্জা করে না একটা মানুষের দুর্বল জায়গার সুযোগ নিয়ে তাকে এক্সপ্লয়েট করতে?"

অশ্বিনী নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে না, "আমি আপনাকে এক্সপ্লয়েট

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



করিনি। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। আমি তো একবারও বলিনি কালো শাড়ি পরে ভালো লাগে আপনাকে। বলছিলাম এই সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েও যখন হেরে যান না, যখন আরও ক'দিন বেঁচে থাকবেন বলে ঠিক করেন তখন ভারী সুন্দর দেখায় আপনাকে। ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু লড়ে যাওয়া মানুষের থেকে বেশি সুন্দর কিছু আছে? বলুন?"

হৈমন্তীর হাত দুটো কিন্তু আলগা হয় না, সে আরও জোরে ধাক্কা দিতে থাকে অশ্বিনীর কাঁধে, "কে তুমি? কীভাবে জানলে এত কিছু আমার ব্যাপারে? বলো কে তুমি?" পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে হৈমন্তী।

— "আমি অশ্বিনী, নিবারণবাবু আমার..."

— "রাবিশ, অন্তত দেড়শো বছর ধরে বয়স পালটায়নি তোমার। কাল রাতে তুমি আমার পাশে ছিলে না তাও তোমার গলার স্বর শুনতে পেয়েছি। কেন তুমি ঘুমাও না কখনও? কেন তাকিয়ে থাকো আয়নার দিকে? কেন তোমার শরীরে কোনও বিপদের প্রভাব পড়ে না?"

— "কেন একজন মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ অন্য কয়েকটা মানুষকে বাঁচাতে নিজের শরীর কেটে রক্ত ঝরায় জিজ্ঞেস করলেন না তো..."

— "কারণ আমি মানুষ, আমার চেতনা আছে, প্রাণ আছে, মৃত্যু আছে, দুঃখ-কষ্ট আছে, আর তুমি কী?"

চোখ তোলে অশ্বিনী, "আমারও চেতনা আছে, প্রাণ আছে। আমি রান্নার ফাঁকে অবসর পেলে আপনার কথা ভাবি, রাতে আপনার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করি আপনি কাশছেন কিনা, আপনার জন্য অসময়ে জল গরম করতে ভালো লাগে, আপনি ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরলে আপনার চাদর পালটে দিয়ে আসতে ভালো লাগে..."

আচমকাই অশ্বিনীর বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হৈমন্তী। তার রোদলাগা খয়েরি চোখের পাতা আবার ভিজে যায়, শরীরটা কেঁপে উঠতে থাকে বারবার।

— "আর আমার এইডস কী করে হয়েছিল সেটাও জানো নিশ্চয়ই?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "না জানি না। দেখিনি।"

— "কেন? সবাই তো জানতে চায়..."

— "আমার কিছু যায় আসে না। আপনি আমার দেখা সব থেকে সুন্দর মানুষ। যতটা দেখেছি, যতটা দেখিনি, সবটা মিলে।"

— "কে তুমি? কেন এভাবে ভালোবাসছ আমাকে? যে জিনিসটা না চাইতেই পেয়েছি, পাব বলে কল্পনাও করিনি কোনওদিন সেটা কেন পেলাম জানতে ইচ্ছা করে না? তুমিই বলো..."

হৈমন্তীর মাথার উপরে একটা হাত রাখে অশ্বিনী, "বলব একদিন। শুধু আপনাকেই বলব। কিন্তু আজ নয়... আজ..."

— "আজ কী?"

— "আজ একজন দেখা করতে আসছে আপনার সঙ্গে..."

বুক থেকে মুখ তুলে বাগানের গেটের দিকে তাকায় হৈমন্তী, একটা বছর পয়তাল্লিশের লোক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আসছে। লোকটার মাথা জোড়া টাক। গায়ে একটা কালো রঙের শার্ট, চোখে সানগ্লাস। মুখ তুলে একবার হৈমন্তীকে দেখে একটা হাসি ফোটে তার মুখে। হাতটা উপরে তুলে এগিয়ে আসে ওদের দিকে।

— "তুমি ভিতরে যাও এখন।" হৈমন্তী বলে।

— "আপনারা দুজনে ভিতরে যান না হয়। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক হবে না। আমি বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

অশ্বিনী ভিতরে ঢুকে যায়। লোকটা হৈমন্তীর দিকে এগিয়ে আসে। হাত তুলে নমস্কার করে নরম সুরে বলে, "সকালে একবার এসেছিলাম। এই কেয়ারটেকার ছেলেটি বলল আপনি ঘুমাচ্ছেন। ভালো কথা, আমাকে চিনতে পারছেন নিশ্চই?"

হৈমন্তীর মুখ শক্ত হয়ে গেছে। উপরে নিচে মাথা নাড়ে সে, "হ্যাঁ। আমার ফোন'টা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে... তাই..."

— "আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আবার মাথা নাড়ায় হৈমন্তী। লোকটা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, ভিতর থেকে অশ্বিনীর গলা শোনা যায়, "আপনারা ভিতরে এসে কথা বলুন না হয়... চেয়ার রেখে এসেছি..."

— "আসুন।" হাত দেখিয়ে লোকটাকে ভিতরের রাস্তা দেখায় হৈমন্তী। দু'জনে বাড়ির ভিতরে ঢুকে আসে। উঠোন'টা পেরিয়ে একতলার একটা বন্ধ ঘর খুলে সেখানেই দুটো মুখোমুখি চেয়ার রেখেছে অশ্বিনী।

তার একটার উপরে বসতে বসতে হৈমন্তী বলে, "এতদূর পেরিয়ে এসেছেন মানে সিরিয়াস কিছু ব্যাপার..."

সানগ্লাস খুলে গলার কাছে ঝুলিয়ে রাখে লোকটা, তারপর পা জড় করে বসে বলে, "সিরিয়াস বৈ কী! ক'দিনে কিছু ইম্পরট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। আপনার ফোন'টা..."

— "দোতলার জানলা থেকে পড়ে ভেঙে গেছে।"

— "ওকে, বাট একটা ই-মেল অন্তত..."

— "ফোন'টা দিয়েই আমার ল্যাপটপে নেট কানেকশন আসত।"

কিছুক্ষণ থম মেরে থাকে লোকটা, চারপাশটা দেখে নেয় একবার, "জিনিসটার কোনও সন্ধান পেয়েছেন?"

— "এক্সাক্টলি সন্ধান নয়, তবে একটা সূত্র পেয়েছি।"

— "কীরকম সূত্র?"

— "সেটা আপনাদের বলতে হবে এমন কোনও ডিল হয়নি আমাদের। এটুকু এসিওর করতে পারি জিনিসটা এ বাড়ি বা বাড়ির আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে।"

খশখশে শব্দ করে হাসে লোকটা, "ওয়েল, দেন আপনার মিশন ইজ অলমোস্ট ওভার।"

— "মানে! কী বলতে চাইছেন?"

কপালের মাঝেখানে আঙুল দিয়ে টোকা দেয় লোকটা, তারপর চাপা গলায় বলে, "মানে জিনিসটা ঠিক কোথায় আছে সেটার সন্ধান দেওয়াটাই ছিল

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আপনার কাজ... বাট দেন আপনার থেকে এতদিন কোনও কমিউনিকেশান না পাওয়াটা আমাদের কিছু ভাবনাচিন্তা করতে বাধ্য করে..."

— "বেশ! তো কী ভাবলেন?"

— "উই হ্যাভ রিয়ালাইজড যে আপনার এই কাজটাতে আর সেরকম ইন্টারেস্ট নেই। বেটার হবে আপনি যতটুকু জানতে পেরেছেন সেটা আমাদের জানিয়ে কলকাতায় ফিরে যান। বাকি কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবো আমরা।"

— "বটে!" হৈমন্তী গালে একটা হাত রাখে।

— "ইয়েস, দেখুন আপনার শরীরের কন্ডিশন ভালো নয়। ইনফরমেশানের ব্যাপারে আপনার হেল্প নিয়েছি আমরা। কিন্তু এর পরের কাজ মেইনলি ফিজিকাল। মাটি খোঁড়া, পুরনো দেওয়াল, ইঁট, চুন, সুরকি ভাঙাভাঙি— এসব করার মতো ফিজিকাল এবিলিটি..."

— "আমার নেই, তাই তো?"

লোকটা ঠোঁট উলটায়, "সেটা তো আমার থেকে আপনি ভালো জানেন।"

হৈমন্তী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, "আমাকে এখান থেকে সরাবেন ভালো কথা কিন্তু এ বাড়ির কেয়ারটেকার ছেলেটি আমাকে যেতে দিতে চাইছে না। ও কিন্তু রেগে যাবে। আমার বদলে নতুন যিনি আসবেন তাকে যে ও ভালোভাবে নেবে সেটা ভেবে নিচ্ছেন কেন?"

প্রথমে একটু অবাক হয় লোকটা, তারপর খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে ওঠে, "কেয়ারটেকার! উই হ্যাভ বট দ্য হাউজ। ওয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ আ কেয়ারটেকার নাউ?"

— "কিনে নিয়েছেন বাড়িটা!"

হাসির বেগ আরও বেড়ে ওঠে, "দা ডিল ইজ ডান। বাড়ির সব ওয়ারিশ সই করেছে। ইনক্লুডিং অস্মিতা গোস্বামী। টাকার অঙ্কটাই যা আমাদের একটু বাড়াতে হয়েছে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হৈমন্তী। ঘরের দেওয়ালের দিকে মুখ করে কয়েক

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



পা এগিয়ে যায়। কিছু একটা ভাবনা চলছে তার মাথায়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে, "আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাব না।"

— "কী বললেন?"

— "আমার মায়া পড়ে গেছে। এ বাড়ির উপর, এ বাড়ির মানুষের উপর!"

— "এ বাড়ির মানুষ! আর ইউ কিডিং?"

— "আজ্ঞে হ্যাঁ, এ বাড়ির মানুষ, যারা এখানে আগে থাকত, এখন থাকে, তাদের কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারব না।"

— "মানে আপনি আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করবেন না?"

— "না।"

— "ইউ আর ডেড, বিচ।" কোমরের বন্দুকে হাত চলে যায় লোকটার। কিন্তু থেমে যায় সে, অশ্বিনী ঘরে ঢুকছে। তার এক হাতে চায়ের কাপ। অন্য হাতে একটা রোল করা মাদুর। শেষ শব্দটা হয়তো কানে গেছে তার।

— "আপনাদের চা, এ ঘরে তো টেবিল নেই, হাতে তুলে নিতে হবে।"

চায়ের কাপটা লোকটার দিকে এগিয়ে দেয় অশ্বিনী, অন্য কাপটা ধরিয়ে দেয় হৈমন্তীর হাতে। হৈমন্তী মাথা নিচু করে নিয়ে নেয় কাপটা।

— "ভালো কথা, এ ঘরে মাটি দিয়ে ড্যাম্প ওঠে। হাঁটা-চলা করছেন, পায়ে ঠান্ডা লাগবে হয়তো, এই চাটাইটা বিছিয়ে দি..." অশ্বিনী মিহি গলায় বলে। মুখে রাগের কোনও চিহ্ন নেই। একটু অবাক হয় হৈমন্তী।

উত্তরের অপেক্ষা না করে অশ্বিনী ঘরের একবারে মাঝখানে লম্বা করে বিছিয়ে দেয় মাদুরটা। কোনওদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

— "আপনি অকারণেই বন্দুকটা নিয়ে এসেছেন স্যার। আমি মরতে চলেছি ক'মাস পরেই। আমাকে বন্দুক দিয়ে ভয় দেখাতে পারবেন না।"

— "ওঃ! একদম ভুল হয়ে গেছি।" জিভ কাটে লোকটা, "বন্দুক নয়, তবে অন্য একটা অস্ত্র আছে আমার কাছে।"

পকেট থেকে নিজের স্মার্ট ফোন'টা বের করে লোকটা, তারপর ফোনের

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



গ্যালারি ঘেঁটে কয়েকটা ভিডিও ক্লিপ বের করে। সেটা সামনে এগিয়ে ধরে বলে, "দেখুন তো এই টিন-এজ মেয়েটিকে চিনতে পারেন কিনা... অনেকটা চেনা চেনা লাগছে..."

হৈমন্তী জানে কী আছে ভিডিও ক্লিপে, সে ছিনিয়ে নিতে যায় ফোন'টা, কিন্তু তার আগেই ফোন'টা সরিয়ে নিয়েছে লোকটা। সে বিড়বিড় করে বলে, "আই থিংক দিস গুড গো ভাইরাল, আন্ডার দ্যা টাইটেল – সফট রেপ অফ এন এইচআইভি পেসেইন্ট বাই থ্রি ওল্ডার মেন। এখানে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে... মাই গড! আজকালকার ছেলেরা কীসব উইয়ার্ড পর্ন দেখে ভাই!"

— "জাস্ট গিভ মি দ্য ফাকিং ফোন!" হৈমন্তীর মাথাটা দুলে উঠতে শুরু করেছে। লোকটা আবার তুলে ধরে ফোন'টা, "ওঃ, একটা ট্যাগলাইন ও আছে, হোয়াইল হার প্যারেন্টস ওয়াচিং..."

ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠে লোকটা, "আমরা চাইলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে পারি আপনাকে..."

— "হৈম, চোখ বন্ধ করো..."

লোকটার হাসির আওয়াজ ছাপিয়ে অন্য একটা গলা শোনা যায়। হৈমন্তী মুখ তুলে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে অশ্বিনী এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, তার হাতে বাগানের ঘাস কাটার লম্বা কাঁচিটা। কালো শার্ট পরা লোকটার ঘাড়ের কাছটা ধরে তাকে চাটাইয়ের উপরে টেনে আনে অশ্বিনী, ঠান্ডা নিরুদ্বিগ্ন গলাটা আবার শোনা যায়, "চোখ বন্ধ করো।"

লোকটার কপালটা হাতের তালু দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে পেটের উপরে একটা পা রেখে শরীরটা স্থির করায় অশ্বিনী। লোকটা হাঁ করে দম নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই হাঁ এর ভিতরে দিয়ে আমূলে ঢুকে যায় কাঁচিটা। চাটাইয়ের উপরে ঘিলু আর রক্ত মেশানো একটা থকথকে তরল নেমে আসে। গোটা মুখের উপরে আরও কয়েকবার কাঁচি চালায় অশ্বিনী। লাল পাঞ্জাবিটা ছেড়ে তার পুরনো সাদা পাঞ্জাবি পরে এসেছিল অশ্বিনী। সেটাই এখন লাল হয়ে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



গেছে রক্তে।

উঠে দাঁড়িয়ে মানুষটার দেহসমেত চাটাইটা রোল করতে থাকে অশ্বিনী। হৈমন্তী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়েছে ঘরের এককোণে। তার মুখ থেকে কান্না উধাও। স্থির পাথরের চোখ তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

রোলটা ঘরের একদিকের দেওয়াল বরাবর সরিয়ে রেখে হৈমন্তীর পাশে এসে বসে পড়ে অশ্বিনী। কাঁপা-কাঁপা হাতে তার পাঞ্জাবির একটা পাশ চেপে ধরে পায়ের উপরে মাথা রাখে হৈমন্তী। মুখে অস্পষ্ট কয়েকটা শব্দ ফুটে ওঠে, "এটা কী করলে তুমি? ওরা আবার আসবে..."

হৈমন্তীর চুলের ভিতরে অশ্বিনীর হাত খেলা করতে থাকে, কিছুক্ষণ পর কথা ফোটে তার মুখে, "একটা কথা তখন বলা হয়নি আপনাকে..."

— "কী?"

— "কালো শাড়িটা পরেও সত্যি খুব ভালো দেখায় আপনাকে..."

## দ্বাদশ অধ্যায়

— "১৯০৫ সালের এক সন্ধ্যা, বুঝলে? সারাদিনের কাজকাম শেষ করে এক পেটেন্ট ক্লার্ক বাড়ি ফিরছিলেন। দেশটা সুইটজারল্যান্ড। তো ভদ্রলোক ঠিক করলেন ট্রামে চেপে বাড়ি ফিরবেন। সেই মতো ট্রামে উঠে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন বাইরে। তো আমাদের এই পেটেন্ট ক্লার্কটি ভারী ভাবুক মানুষ ছিলেন। তবে বাঙালি তো নয়, তাই পদ্য, পার্টি-পলিটিক্স কিংবা আধ্যাত্মিক চিন্তা করতেন না। কাজের ফাঁকে সময় পেলেই তিনি এই ইউনিভার্সের রহস্য নিয়ে মেতে উঠতেন।

যাই হোক, সেদিন কিন্তু তার মনে কোনও ভাবনা এল না, কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে সব কিছু। মস্তিস্ক আর আগের মতো কাজ করছে না।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



মাথাটা একটু ঠান্ডা করতেই ভদ্রলোক ট্রামের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন।

বাইরে তাকিয়ে দেখলেন জাইভলগ ক্লকটাওয়ারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে ট্রামটা। টাওয়ারের ঠিক চূড়ার কাছে একটা মস্ত ঘড়ি। সেই ঘড়ির থেকে ক্রমশ দূরে চলে আসছে ট্রামটা।

ট্রামে বসে থাকা মানুষগুলো ঘুণাক্ষরেও বোঝেনি ওইদিন, ওই ট্রাম, ওই ঘড়ি আর ওই ছাপোষা ক্লার্ক মানবসভ্যতার বিজ্ঞানচর্চাকে কয়েক আলোকবর্ষ এগিয়ে দেবে।

যাই হোক, ট্রামে বসে ঘড়ির দিকে চেয়ে ভদ্রলোক ভাবলেন তিনি যে ট্রামে বসে আছেন সেটাকে যদি আলোর গতিবেগে চালানো যায় তাহলে ট্রামে বসে থাকা মানুষদের চোখে ওই ঘড়ির কাঁটা স্থির হয়ে থাকবে। কারণটা খুব সহজ, কাঁটা যে নড়ছে সেটা আলোই আমাদের চোখ অবধি নিয়ে আসে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যদি আমরা দৌড়াই তাহলে ঘড়ির কাঁটার বদলটা সে আর দেখাতে পারবে না আমাদের। কিন্তু ধরো যে লোকটা ওই টাওয়ারের ঠিক নিচে মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখে ঘড়ি নিজের নিয়মেই ঘুরছে।

এবার ভাবো, ঘড়িটা কিন্তু চলছে। সেটা মিথ্যে নয়। অর্থাৎ কেবল ট্রামে বসে থাকা মানুষের চোখে সময় থমকে গেছে। তা কী করে হতে পারে?

তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা তার আগে বলে গেছেন সময়ের চেয়ে বেশি একবগগা কেউ নেই। সে একই বেগে, একই ছন্দে, কারো তোয়াক্কা না করে বয়ে চলেছে সামনের দিকে।

ক্লার্কসাহেব পড়লেন আতান্তরে, শ্যাম রাখি না কুল রাখি?

তবে কী সত্যি তোয়াক্কা করে সে? ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝতে গিয়ে আরও বেশি ধন্দে পড়লেন তিনি।

ধরো একটা বিরাট ফাঁকা মাঠের একেবারে মধ্যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। মাঠের দু'দিক থেকে তোমার দিকে লক্ষ্য করে দুটো তীর ছোঁড়া হল। নিয়ম হল দুটো তীর যদি একসঙ্গে গায়ে লাগে তাহলেই তুমি মরবে। একটা লাগলে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কোনও ক্ষতি হবে না। যেহেতু তীর দুটো একই গতিবেগে একই দূরত্ব থেকে ছোঁড়া হচ্ছে তাই দুটো তীরের একইসঙ্গে তোমার গায়ে লাগার কথা...

এবার ধরো এই গোটা ঘটনাটা দেখতে দেখতে আমি মাঠের উপর দিয়ে আলোর গতিবেগে পার হয়ে যাচ্ছি। তাহলেই বুঝতে পারবে আমার চোখে কিন্তু দুটো তীর একসঙ্গে তোমার গায়ে বিঁধবে না। যে তীরটা আমার কাছে আছে সেটা আগে আগে বিঁধবে। ফলে তোমার মৃত্যু হবে না। অথচ বাস্তবে কিন্তু তোমার মৃত্যু হয়েছে।

মানে একটা মানুষ একই সঙ্গে কারো চোখে জীবিত এবং কারো চোখে মৃত্যু। এবং দুটোর কোন'টাই মিথ্যে নয়।

প্রকৃতি এ জিনিস হতে দেয় না। হতে না দেওয়ার জন্যে নিজের কোনও একটা অখণ্ডনীয় নিয়ম ভাঙতে হয় তাকে। কোনও একটা শিকলকে আলগা করতে হয়। এক্ষেত্রে যে শিকল আলগা হয় তার নাম— সময়। প্রকৃতির এই গ্লিচকে মেরামত করতে সময় নিজেকে মন্থর করে নেয়।

আমাদের সেই পেটেন্ট ক্লার্ক সময়ের এই মন্থর হয়ে যাওয়াকে একটা নাম দেন— টাইম ডায়ালেশান। অঙ্ক কষে তার একটা ফর্মুলাও আবিষ্কার করেন তিনি।

$$t' = \frac{t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

সোজা কথা হল তুমি যত দ্রুতগামী হবে, সময় তোমার জন্য তত বেশি মন্থর হবে। যদি পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে মহাবিশ্বের বুকে তুমি আলোর কাছাকাছি গতিবেগে চলতে থাকো তবে তোমার হাতে বাঁধা ঘড়িতে সময় মিলিয়ে চারবছর পর ফিরে এসে দেখবে পৃথিবীতে আট বছর কেটে গেছে। এবার ধরো যদি কোন ব্ল্যাকহোলের মধ্যে ফ্রি ফল করো..."

— "আমার মা খুব বকবে, ম্যাম..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "অ্যাঁ! ব্ল্যাক হোলের মধ্যে তোমার মা আবার কোথা থেকে আসবে?"

— "হোল-টোল নয় ম্যাম, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। এত লেট করে বাড়ি ফিরলে মা আলোর গতিবেগে জুতো ছুঁড়ে মারবে..."

নাকের ডগা থেকে চশমাটা চোখের সামনে টেনে আনলেন পূজারিণী পালিত, "ওঃ! সময়টারই খেয়াল থাকে না আজকাল। বেশ, তুমি বেরিয়ে পরো, বাকিদের তাড়া নেই তো?"

তাড়া থাকলেও বলতে পারে না বাকিরা। জনাচারেকের ছোট দলের অন্তত দুটো মুখ এতক্ষণে ঝিমিয়ে পড়েছে। তাও কোনওরকমে মেকি আগ্রহ দেখানোর চেষ্টা করছে তারা।

মেয়েটি চলে যেতে ছোট দশফুট বাই দশফুট ঘরের মধ্যে মোট পাঁচটি মানুষ পড়ে রইল। সন্ধ্যেয় স্কুল থেকে ফিরে প্রাইভেট টিউশন পড়াতে বসেছিলেন পূজারিণী পালিত। কিন্তু বইয়ের পড়ায় একদম মন বসছে না আজ। গল্পের ছলে কিছু শেখানোর চেষ্টা করছিলেন। এই মেয়েগুলো অন্যদের থেকে একটু ব্রাইট। নিজেই নিজেকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের দুরহ কিছু শেখানো যায় কিনা। এখন তিনি অবশিষ্ট চার মুখ সরেজমিন করলেন। নাঃ, মহাবিশ্বের অনন্ত রহস্যের মতো সত্য উদ্ধার করতে পারলেন না।

— "পেটেন্ট ক্লার্কটির নাম অ্যালবার্ট আইন্সটাইন, এবং তার যে থিয়োরির মাত্র চূড়াটুকুর ধারণা তোমরা পেলে তার পোশাকি নাম — থিওরি অফ রিলেটিভিটি। কারও কোনও প্রশ্ন আছে?"

চারটে মুখেই কোনও প্রশ্ন ফুটল না। পূজারিণী একটু হতাশ হলেন, এমন একটা কিছু এদের হাতে তুলে দিতে হবে যাতে এরা প্রশ্ন করে, প্রশ্ন না করলে শিখবে না। বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ হল অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

— "যাই হোক, টাইম ডায়ালেশান থেকে খুব সহজে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। মহাবিশ্বে আলোর থেকে বেশি গতিশীল আর কিছু হতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে সময় মন্থর হওয়ার গন্ডি টপকে ঋণাত্মক হয়ে যাবে। তাহলে কী হবে বুঝতেই পারছ।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "টাইম ট্রাভেল!" একেবারে বাঁদিকের একটা মেয়ে বলল।

— "এক্স্যাক্টলি, ফলে প্রোফেসর আইনস্টাইন টাইম ডায়ালেশানকেও নিয়মে বেঁধে দিলেন। শূন্যর থেকে কম সে হতে পারে না।"

— "কিন্তু আপনি এক্ষুনি বললেন প্রকৃতি তার অসংগতি মেরামত করতে নিজের নিয়মকে আলগা করে ফেলতে পারে..."

— "পারে। কিন্তু এ নিয়ম আলগা হওয়ার মতো নয়। ঘটে যাওয়া ঘটনাতে দ্বিতীয়বার ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। টাইম ট্রাভেল কেবলমাত্র সাইন্স ফিকশানেই সম্ভব। কিন্তু..."

পরের কথাগুলো বলতে গিয়েও থেমে যান পূজারিণী পালিত। ঘড়ির দিকে নজর পড়ে তার। সত্যি অনেক রাত হয়ে গেছে। এতগুলো মেয়ে এই অন্ধকারে বাড়ি ফিরবে। হাতের সামনে খোলা খাতাটা বন্ধ করে তিনি হাসলেন, "আজ আর ভেবে কাজ নেই আমাদের। আপাতত সাবধানে বাড়ি ফেরো সবাই। কাল স্কুলে দেখা হবে।"

চারজনেই উঠে পড়ে। পূজারিণী চশমাটা খুলতে খুলতে হৈমন্তীর দিকে চেয়ে বলেন, "তুমি একটু বসে যাও হৈম। এই ক'দিন তো ক্লাসে আসনি, নোটশগুলো লিখে নিয়ে যেও। হরেন বাড়ি দিয়ে আসবে তোমাকে।"

হৈমন্তী মাথা নাড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাকিরা চলে যেতে পূজারিণী হাত ধরে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। এ ঘরে এলেই ন্যাপথালিন আর পুরানো বইয়ের গন্ধ নাকে আসে।

— "তুমি গল্পের বই পড়ো?" পূজারিণী জিজ্ঞেস করে।

— "হ্যাঁ।"

— "এ ঘরে অনেক গল্পের বই পাবে। বাংলা, ইংরাজি সব। যেটা খুশি নিয়ে যেতে পারো, কেমন?"

হৈমন্তীর মুখে ঝিলিক খেলে যায়। লোভটা যাতে ম্যামের চোখের না পড়ে তাই মুখ নামিয়ে নেয় সে।

— "স্নিগ্ধার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তোমার রোগটার ব্যাপারেও আমি

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



জানি।" হৈমন্তীর কাঁধে হাত রাখেন পূজারিণী।

— "আইনস্টাইনের তত্ত্ব ঠিক হলে টাইম ট্রাভেল অসম্ভব, এটা সত্যি কিন্তু আইন্সটাইনের ছেলেবেলার স্কুলমাস্টারদের চোখে আইন্সটাইনের বিজ্ঞানী হওয়াটা তার থেকেও বড় অসম্ভব ছিল। বুঝলে?"

হৈমন্তী মাথা নেড়ে দিল, মুখে কিছু বলল না। পূজারিণী আর একটু এগিয়ে এসে বললেন, "তাছাড়া আরও একটা কথা তোমার জানা দরকার, আমাদের এই মহাবিশ্বে এমন একটা জায়গা আছে যার কথা মানুষের পক্ষে কোনওদিনই জানা সম্ভব নয়। সেখানে কী আছে আর কী নেই তা কেউ জানে না। আলোর থেকে বেশি গতিশীল কিছু যদি সেখানে থাকে তাহলে আমি তো মোটেই আশ্চর্য হব না।"

— "সেটা কোথায় ম্যাম?"

বইয়ের তাকের দিকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেলেন পূজারিণী পালিত তারপর একটা কোণা থেকে প্রায় আধমানুষ সমান একটা রোল করা ছবি তুলে মেলে ধরলেন হৈমন্তীর সামনে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "এই গ্লাসটা ভালো করে দেখো। এই হচ্ছে আমাদের নোন ইউনিভার্সের টাইমলাইন। ওই বাঁদিকের প্রান্তে যেখানে আলো জ্বলছে সেটা হল বিগ ব্যাং। তার আগে স্পেস, টাইম কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এই বিগ ব্যাং-এর কিছু পর থেকে প্রথম তারা জন্মানোর সময় অবধি চারশো মিলিয়ন বছর সময়কে বলা হয় ডার্ক এজ — মহাবিশ্বের অন্ধকার যুগ। অন্ধকার যুগ নাম হওয়ার দুটো কারণ আছে। এক, এ-সময় গোটা মহাবিশ্বের কোথাও কোনও আলো ছিল না। আর দুই..."

থেমে একবার মেয়েটার চোখের দিকে তাকান পূজারিণী পালিত, "এই সময়ে মহাবিশ্ব জুড়ে ঠিক কী ছিল তা আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কারণ মহাবিশ্বের সীমানা রোজ বর্ধিত হচ্ছে, দ্রুত গতিতে। ফলে 'ডার্ক এজ' আমাদের থেকে এতটাই দূরে চলে যাচ্ছে যে সে আলো আর কোনওদিনই আমাদের চোখে এসে পৌঁছাবে না। তাই এই চারশো মিলিয়ন বছরে ঠিক কী ছিল তা আমরা জানি না, যদি এমন কিছু থাকে যা আলোর থেকে বেশি দ্রুতগামী তাহলে টাইম ট্রাভেল ছাড়াও আরও অনেক নিয়ম ভাঙতে বাধ্য।"

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে হৈমন্তী। ছবিতে অন্ধকার দিয়ে চিহ্নিত করা ডার্ক এজের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আমতা আমতা করে বলে, "ওখানে কী ছিল ম্যাম?"

— "ওই যে বললাম, কেউ জানে না কী ছিল ওখানে, হয়তো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিংবা হয়তো সেই অসীম অন্ধকারের বুকে কোথাও প্রাণের স্পন্দন ছিল। যাই থাক না কেন, আমরা আর জানতে পারব না।"

হরেনের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হৈমন্তীর চোখ ঘুরে বেড়াতে থাকে অন্ধকার আকাশের কোণায় কোণায়। স্পেস-টাইমের বেড়া পেরিয়ে উড়ে যেতে চায় সে। তেরো বিলিয়ন বছরের প্রতিটা মুহূর্তকে সে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে। প্রতিটা মুহূর্তকে হাতের তালুতে তুলে এনে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে তার।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আঃ, দেখে চলো দিদিমণি। হোঁচট খাবে যে..." হরেন বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বাড়ি পৌঁছে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই একটা কষিয়ে চড় পড়ে হৈমন্তীর গালে। এত জোরে মাথাটা ঘুরে যায় যে ঘাড়ের কাছ থেকে খচ করে শব্দ আসে একটা। গাল গরম হয়ে ওঠে হৈমন্তীর।

— "কার বিছানায় পড়ে ছিলি হারামজাদি?" বীণাপাণিদেবী রগরগে গলায় চিৎকার করে ওঠেন।

— "ম্যাম আজকে একটু বেশি..."

আবার একটা চড় খেয়ে হৈমন্তীর মাথা ঘুরে যায়, "চুপ কর মাগি। তোর কোনও কথা আমি বিশ্বাস করি না।" চুলের মুটি ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দেন বীণাপাণি, "চরিত্রহীন লম্পট একটা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ..."

রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বিড়বিড় করেন তিনি, "আত্মীয়-স্বজনরা একবার জানতে পারলে আর আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না আমাদের। মেয়ের সবে ষোলো এরই মধ্যে শরীর নোংরা করে এসেছে... সোনাগাছির বেশ্যাদেরও এই রোগ হয় না..."

হৈমন্তী নিজের ঘরে ঢুকে আসে। গায়ে লেপ্টে যাওয়া স্কুলড্রেসটা খুলে এসে দাঁড়ায় আয়নার সামনে। নাঃ এখনও কোনও দাগ দেখা যায়নি শরীরে, আজও দেখা যায়নি...

স্নিগ্ধা ম্যামের দেওয়া হাত ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করে এগিয়ে চলেছে। পাশের ঘর থেকে হৈমন্তীর বোন সীমন্তিনীর পড়ার আওয়াজ আসছে। সেটা ছাপিয়ে বীণাপাণির গড়্‌গড়ানি কানে আসে, "লোক জানাজানি হলে ছোট মেয়েটার বিয়ে হবে না। এর থেকে ভালো ক্যান্সার বাঁধিয়ে আসতিস, নাহয় সব্বশান্ত হতাম, সমাজে মুখ তো দেখাতে পারতাম... ছিঃ এমন মাগি পেটে ধরেছি..."

সীমন্তিনীর পড়ার শব্দ থেমে যায়। কয়েক সেকেন্ড পরে সে হৈমন্তীর ঘরের দরজা খুলে ঢুকে আসে। বিছানার উপর বসে পা থেকে মোজা খুলছিল হৈমন্তী। তার ঠিক পাশটায় বসে পড়ে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "এসব তো কম ছিল কিছুদিন, আজ আবার শুরু করল কেন?" মোজা খুলে ছুঁড়ে ফেলে হৈমন্তী।

— "বাবা আজ সুইসাইড করতে গেছিল। আমার ঘরে পাখার ব্লেডে গামছা বেঁধে ঝুলছিল, টুলটা লাথি মেরে ফেলার আগেই আমি..." সীমন্তিনী থমথমে গলায় বলে।

— "মানে! কেন? সেসব তো..."

— "কাল একটা পার্টি ছিল অফিসে, প্রচুর মদ খেয়েছিল। মদের নেশায় তিন বন্ধুকে তোর ব্যাপারে ভুল করে বলে ফেলছে। তারা এখন থ্রেট করছে সবাইকে জানিয়ে দেবে।"

নিজের ঠোঁট কামরায় হৈমন্তী, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, "কতদিন আর লুকিয়ে রাখবে?"

— "তুই বুঝতে পারছিস না দিদি। রোগটা কীভাবে হয়েছে কেউ জানতে চাইবে না, কীভাবে সংক্রামিত হয় জানতে চাইবে না। আমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখবে, আমাদের এড়িয়ে চলবে..."

ব্যাগের ভিতর থেকে সিগারেট টেনে বের করে হৈমন্তী, কিন্তু ধরায় না, বলে, "তুই আমায় ঘৃণা করিস, সোমু?"

এগিয়ে এসে হৈমন্তীর হাতের উপরে মাথা রাখে সীমন্তিনী, "আমার খুব ভয় করে রে দিদি..."

— "কীসের ভয়?"

— "আমি জানি বাবার মতো একদিন তুইও আর সহ্য করতে পারবি না এতকিছু। আমি তো চিরকাল তোদের কাউকে ধরে বেঁধে রাখতে পারব না, কখনও একা হবি। আমি বাড়ি ফিরে শুনব তোদের মধ্যে একজন চলে গেছিস।"

বোনকে কোলের কাছে টেনে নেয় হৈমন্তী, "তোর দিদি অত নরম নয় রে, আমি নিজে থেকে কোথাও যাব না। যাই হয়ে যাক..."

বাইরে থেকে বীণাপাণির চিৎকার শোনা যায়, "তুই আবার ওই লম্পট

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



মাগিটার কাছে গেছিস! নিজেকে শেষ করেছে, তোকেও নষ্ট করে ছাড়বে, বেরিয়ে আয়।"

সীমন্তিনীকে সোজা করে বসিয়ে দেয় হৈমন্তী। তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলে, "আমি একটু ছাদে যাই। খোলা হাওয়া দরকার। তুই নিজের ঘরে যা এখন।"

কথা না বাড়িয়ে চলে যায় সীমন্তিনী। হৈমন্তী সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে ছাদে চলে আসে।

ভারী মিষ্টি একটা এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে ছাদে। হৈমন্তীদের বাড়ির চতুর্দিক বেশ নির্জন। অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে যাওয়া রাস্তার মধ্যে মধ্যে হলদে সোডিয়ামের আলো জ্বলছে।

দূরে কোথাও থেকে ঢাক বাজার আওয়াজ আসছে কি? পুজো চলে এল মনে হয়। সারা কলকাতা শহর ঢেকে যাচ্ছে আলো, জমকালো কোল্ড ড্রিঙ্কের ব্যানার আর বাঁশের খুঁটি দিয়ে আলাদা করা ফুটপাথে। গড়িয়া, বউবাজার, বড়বাজার আর হাতিবাগানে লোকেদের কেনাকাটা চলছে জোরকদমে।

পুজোর আগে আগে এই সময়টায় অকারণেই মন খারাপ হয়ে যায় হৈমন্তীর। মনে হয় কী যেন একটা কাজ ওর করার আছে অথচ দেরি হয়ে যাচ্ছে খুব, করা হয়ে উঠছে না।

সিগারেট ধরিয়ে ছাদের একদিকের পাঁচিলের কাছাকাছি সরে আসে হৈমন্তী। ওদের বাড়িটা তিনতলা। নিচে দুটো তলায় ভাড়াটে থাকে।

নেড়া ছাদের একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়ায় ও। ঢাক বাজছে, হ্যাঁ, সত্যি ঢাক বাজছে, যে কোনও বড় কাজের আগে ঢাক বাজে, যে কোনও শুভ কাজের আগে, জমকালো কোনও কাজ, যুদ্ধ, অসুরনিধন, মৃত্যু...

হৈমন্তী চাইলেই ঢাকের আওয়াজটা থামিয়ে দিতে পারে, মন খারাপ থামিয়ে দিতে পারে এক নিমেষে। চারতলা থেকে নিচে পড়লে...

ছাদের বাইরে একটা পা বাড়িয়ে দেয় সে। গোটা শরীরটা দুলে ওঠে ওর। আর একটু বাড়িয়ে দিতে হবে পা'টা... তাহলেই সমস্ত শরীর ওর

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বাধ্য হয়ে উঠবে।

— "হৈম..." পেছন থেকে কি ডেকে উঠল কেউ? না কি হাওয়ার শব্দ? হৈমন্তী পেছনে ফেরে— কেউ নেই। ফাঁকা ছাদে আগের মতোই মৃদু শরতের হাওয়া বইছে।

ছাদের ধারেই গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে হৈমন্তী। দু'চোখ জলে ঢেকে যায় তার। আকাশের দিকে তাকাতে মনে হয় তেরো বিলিয়ন বছর পরে আবার একটা অন্ধকার যুগ নেমে আসছে সেখানে। তবে স্থির, নিশ্চল নয়, কেউ জেগে আছে তার মাঝে... চেয়ে আছে হৈমন্তীর দিকে...

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

— "আমি তো হ্যার আগামাথা কিছুই বুজতাসি না।" পার্চমেন্টগুলো হাত থেকে নামিয়ে রেখে নিতাই বলে। তারপর চোখ তুলে তাকায় হৈমন্তীর দিকে।

হৈমন্তির ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট, এই একটা দিনে আরও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। গায়ে একরোখা জ্বর, মুখে খাবার উঠছে না, অথচ কিছুতেই ডাক্তার দেখাবে না। নিতাই জিজ্ঞেস করে, "আপনি বুজসেন কিসু?"

গত দু'দিন ধরে নিতাই আর হৈমন্তী চেষ্টা করেছে মুরারিমোহনের রেখে যাওয়া হলদেটে কাগজগুলোর মর্ম উদ্ধার করার। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। সাধারণের বোঝার জন্য সেগুলো রেখে যাননি মুরারিমোহন। গোটা পঞ্চাশেক হলদেটে কাগজ। তার উপরে পদার্থবিদ্যার জটিল গাণিতিক ফর্মুলা আর হিসেব নিকেশ লেখা রয়েছে। সঙ্গে আঁকাবাঁকা ও অসমান্তরাল লাইনে বাংলা ইংরাজি মিশিয়ে কিছু লেখা। বেশ কয়েক জায়গাতেই 'চিড়িয়াখানা' শব্দটার উল্লেখ আছে। তবে সেটা ঠিক কোন্ প্রসঙ্গে ব্যবহার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

নিতাইয়ের প্রশ্নে হৈমন্তী দুপাশে মাথা নাড়ায়, "আমার পেটে এত বুদ্ধি নেই। তবে কয়েকটা জিনিস চেনা লাগছে। এই যেমন..."

কাগজের তাড়া থেকে একটা বিশেষ কাগজ টেনে বের করে হৈমন্তী, সেটার একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলে, "এই ফর্মুলাটা, এটা টাইম ডায়ালেশানের ফর্মুলা। আমাদের স্কুলে ম্যাম শিখিয়েছিল। এর মানে হল সময় বিশেষ বিশেষ কারণে মন্থর হয়ে যেতে পারে..."

— "মানে?" নিতাই হাঁ হয়ে যায়।

— "মানে ধরুন এই ভাসানবাড়ি, গোটা পৃথিবীতে সময় যে নিয়মে এগিয়ে চলেছে ভাসানবাড়িতে সে নিয়মে চলবেই তার কোনও মানে নেই..."

কিছু একটা কথা মনে পড়ে নিতাইয়ের, একটু ভেবে নিয়ে সে বলে, "আমি সেলেবেলায় একখান আলো দেখসিলাম আকাশে। বুড়োকত্তা বলসিলেন ওইটা হইল হ্যালির ধূমকেতু। সেইটার নাকি তহন আসার কতা ছিল না..."

— "আপনার ছেলেবেলা!" হৈমন্তী অসুস্থ শরীরেও উঠে বসার চেষ্টা করে, "মানে ধরুন সত্তরের আশেপাশে। তখন হ্যালির ধূমকেতু!"

— "হ,..." নিতাইয়ের চোখ দেখে মনে হয় এখনও দৃষ্টিপটে অন্ধকার আকাশের বুক চিরে ধূমকেতু ছুটে চলেছে।

— "কিন্তু সেটা তো এইট্টী সিক্সে এসেছিল। আপনি সেটা পনেরো বছর আগে দেখেছিলেন মানে..." হৈমন্তী পরের কথাগুলো বলার আগে একটু থামে, যেন কোনও নিষিদ্ধ বেড়া টপকানোর আগে একটু ইতস্তত করছে, "কোনও জিনিস ঘটার আগে দেখা মানে সময় এখানে মন্থর নয়, টাইম ডায়ালেশান ঋণাত্মক, সময় এখানে দ্রুতগামী! ইম্পসিবল!"

— "ক্যান?" নিতাই আপত্তি জানায়, "আপনি তো কেবল কইলেন যে দুইজনের লইগ্যা টাইম সেইম গতিতে চলবে তার কুনো মানে নাই, তাইলে যার কাসে টাইম স্লো চলবে তার তো মনে হইবে অন্যজনের টাইম ফাস্টার..."

হৈমন্তীর মাথায় গুলিয়ে যায় ব্যাপারটা, কী উত্তর দেবে সে বুঝতে পারে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



না। থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স তার সাবজেক্ট ছিল না কোনওদিন। তার মাথায় অন্য একটা ভাবনা খেলা করছে এখন। বিড়বিড় করে বলে, "এ বাড়িতে যে জিনিসটা মুরারিমোহন এনেছিলেন সেটাই সম্ভবত সময়ের গতিকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। সে জন্যেই ভাসানবাড়ির ছাদ থেকে অন্য সময়ের আকাশ দেখা যায়। কিন্তু জিনিসটা আছে কোথায়?"

হৈমন্তী এবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, "এ বাড়িতে এসে থেকে প্রায় রোজই কিছু না কিছু স্বপ্ন দেখি, জানেন? আমার ছোটবেলা, বড়বেলার নানা ঘটনা। তবে কাল রাতে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম... যার সঙ্গে আমার ছেলেবেলার কোনও সম্পর্ক নেই।"

— "কী দেখলেন?" এবার নিবারণ জিজ্ঞেস করেছে। সে একটু দূরে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল।

— "মনে হল যেন একটা থিয়েটারে বসে আছি। সামনে বিরাট বড় একটা পর্দা ঝোলানো। পর্দার ওপারে মঞ্চসজ্জার কাজ চলছে। নামানো পর্দার উপরে মাঝে-মধ্যে ওপাশের ঘুরে ফিরে যাওয়া আলো চোখে পড়ছে, লোকজনের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সেটা থেমে যেতে পর্দা উঠে গেল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি পর্দার পেছনে কোনও স্টেজ নেই আর। শুধু একটা একটা করে বিন্দু-বিন্দু আলোর মতো তারা ফুটে উঠছে, মঞ্চের উপরে কেউ কোথাও নেই। শুধু অন্তহীন মহাবিশ্ব জেগে আছে।"

— "সে কী! এর মানে কী?" নিবারণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

— "জানি না, মনে হল অন্ধকার জগতের ভিতর থেকে যেন কেউ ডাকছে আমাকে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি না, তাও মন বলল কেউ ওর ভিতরে অপেক্ষা করে বসে আছে আমার জন্য।"

— "পুরাই মিনিংলেস..." নিতাই বলে।

হৈমন্তী কপালে হাত বুলিয়ে একবার নিজের জ্বরটা দেখে। নিবারণ একটা কাপড় ভিজিয়ে এনে তার কপালে জলপট্টি দেয়। একটু আগেই অশ্বিনী এসে ব্রেকফাস্ট আর ওষুধ খাইয়ে গেছে তাকে। একটু পরে জ্বর ছাড়ার কথা।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "স্বপ্নটা ভেঙে যেতে আমারও মনে হয়েছিল মিনিংলেস... তবে এই জ্বরের ঘোরে পড়ে আছি তো সারাদিন... একটা কথা মাথায় আসছে।"

— "কীরকম কথা?"

— "স্বপ্নটার একটা মানে আছে। আমাকে হয়তো ইশারায় কিছু বোঝাতে চাইছে স্বপ্নটা..."

— "কী বোঝাতে চাইছে?"

বাইরে সকালের আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেঘ করে আছে। বৃষ্টি নামবে হয়তো একটু পরে। সেই কালচে ছোপ লাগা আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হৈমন্তী বলে, "এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার বেশ কিছুটা সময় পরে একটা অন্ধকার যুগ এসেছিল, যাকে বলা হয় ডার্ক এজ। মহাবিশ্বের সেটা জন্মলগ্ন। ফলে এখনকার মতো এত বড় আর বিস্তৃত ছিল না সেটা। ধরে নিন মহাবিশ্বটা ছিল একটা বাটির মতো, কিন্তু আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম মহাবিশ্বের সমস্ত ভর তার জন্মলগ থেকে একই আছে, বাড়েওনি কমেওনি। ফলে এই বিপুল পরিমাণ ভর জমা হয়েছিল ওই ছোট্ট জায়গাটার মধ্যে। এবার ভাবুন, এক হাঁড়ি ভাতকে যদি জোর করে একটা বাটির মধ্যে ধরাতে চান তাহলে কী হবে? বাটির ভিতরে ভয়ানক চাপ তৈরি হবে। সেই চাপ থেকে প্রচণ্ড উত্তাপ তৈরি হবে। এবং সেই উত্তাপে ভাতের পরমাণু ভেঙে ইলেকট্রন প্রোটনে পরিণত হয়ে ইতস্তত ছুটে বেড়াবে হাঁড়ির ভিতরে।

এই মুক্ত নেগেটিভ চার্জড ইলেকট্রন মহাবিশ্বের যাবতীয় আলোকে আটকে দিত। ফলে মহাজগত অন্ধকারে ডুবে থাকল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাবিশ্ব বেড়েও উঠল, সঙ্গে ঠান্ডাও হল কিছুটা। এই সময় থেকেই শুরু হল আমাদের ডার্ক এজ। চারশো মিলিয়ন বছর চলার পরে যেদিন মহাবিশ্বের প্রথম তারা ফুটল সেদিন এসে শেষ হল ডার্ক এজ। কিন্তু মাঝের এই চারশো মিলিয়ন বছর ঠিক কী ঘটেছে?

বিজ্ঞানীদের কাছে উত্তর নেই। যেন মহাকালের ওইটুকু অংশে কেউ পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এমন মনে হতে পারে যে কিছুই ঘটেনি এর মধ্যে। পরমাণু

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



নিজের নিয়মে দানা বেঁধে প্রথম নক্ষত্র তৈরি করেছে। কিন্তু তা হবার নয়। নক্ষত্র কেবল অণু-পরমাণু জমে তৈরি হতে পারে না। তাকে একটা নির্দিষ্ট আকারে গঠিত হতে হবে। নির্দিষ্ট জটিল গাণিতিক নিয়ম মেনে তাকে আবর্তিত হতে হবে। মহাকর্ষ মেনে কক্ষপথ নির্ণয় করতে হয়, এসব এমনি এমনি হবে কী করে?

এই ডার্ক এজের পর্দা যখন মঞ্চে নেমে এসেছিল তখন মহাবিশ্ব ছিল একটা কেওস। কোনও অর্থ ছিল না তার, চারশো মিলিয়ন বছর পরে পর্দা উঠতে আমরা দেখলাম এই সম্ভাবনাময় মহাবিশ্ব, যেখানে এত জটিল প্রাণ অবধি সৃষ্টি হতে পারে। শুধু মঞ্চসজ্জার কারিগরদের আমরা দেখতে পেলাম না। তাদের হাঁকডাক শুনলাম, ইতস্তত আলো দেখতে পেলাম। যেন একটা মানুষের স্মৃতি থেকে তার ছোটবেলার একটা বিশেষ অংশ মুছে দিতে চেয়েছে কেউ, এরকম কখন হয় বলুন? যখন সেই ছোটবেলায় এমন কেউ থাকে যার কথা মনে রাখলে তার বেড়ে ওঠায় কোনও ক্ষতি হতে পারে...”

একটু দূরে মেঝের উপরে বসেছিল গনশা। সকাল থেকে গেম খেলে চলেছে সে। একটু আগে ক্ষান্ত দিয়েছে। আপাতত তার চোখ গিয়ে পড়েছে মুরারিমোহনের গবেষণার কাগজগুলোর উপরে। একটা বিশেষ জায়গা চোখে পড়তে তার ভুরু কুঁচকে যায়। কাগজটা হৈমন্তীর দিকে তুলে ধরে সে বলে, “এই চিহ্নটা... একটা জায়গায় দেখেছি।”

হৈমন্তী দেখে কাগজের একটা কোণের দিকে ছোট্ট একটা গোলের উপর প্রায় বিন্দুর মতো আর একটা উপবৃত্ত আঁকা রয়েছে। ভারী সহজ চিহ্ন। সদ্য পেনসিল ধরতে শেখা বাচ্চাছেলেও অবলীলায় আঁকতে পারবে সেটা।

— “কোথায় দেখেছিস?”

— “এই বাড়িতেই দেখেছি। একদিন দাদা ছিল না, তখন...”

— “মনে পড়লে আমাকে দেখাতে পারবি?”

গনশা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই দরজায় টোকা পড়ে। ওপাশ থেকে অশ্বিনীর গলার আওয়াজ শোনা যায়, “শুনছেন? শরীর কেমন আছে?”

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আওয়াজটা শুনেই বিছানা থেকে নেমে পাশের ছোট ঘরে লুকিয়ে পড়ে নিবারণ। এই ক'দিন অশ্বিনী উপরে এলে ওখানেই থাকে সে। গনশা উঠে দরজা খুলে দেয়।

অশ্বিনী নিতাইকে বসে থাকতে দেখে একটু থমকে যায়। কাগজগুলো এতক্ষণে বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেলছে হৈমন্তী।

সেই বালিশের ঠিক পাশেই এসে বসে অশ্বিনী, হৈমন্তীর কপালে একটা হাত রাখে, মিহি স্বরে বলে, "জ্বরটা কমছে। খাবেন কিছু?"

— "উঁহু," অশ্বিনীর হাতের উপরে একটা হাত রেখে নিতাইয়ের দিকে চায় হৈমন্তী, "শুনছি এ বাড়ি নাকি বিক্রি হয়ে যাবে। তো কেয়ারটেকারটিকে আমি কলকাতায় নিয়ে গেলে আপত্তি করবেন না তো?"

— "আপত্তি করনের কী আসে আর, এই পোলা একখান হ্যাডেক..."

— "আর আপনার আকাশ দেখার কী হবে? বাড়ি ভেঙে হোটেল হলে তারা আপনাকে আর দূরবীন নিয়ে ছাদে অ্যালাউ করবে বলে তো মনে হয় না।"

নিবারণের মুখটা করুণ হয় ওঠে। বোঝা যায় এ ব্যাপারটা আগে ভেবে দেখেনি। বিছানার চাদরের উপরে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে থাকে।

— "আমার কী মনে হয় জানেন?" হৈমন্তী আবার জানলার দিকে তাকায়, "আমরা কেউ এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না। আমাদের শখ, আহ্লাদ, ভালোবাসা সব নিয়ে এখান থেকেই বিলীন হয়ে যাব..."

— "কে বলেছে আপনাকে?" অশ্বিনী জিজ্ঞেস করে।

— "তুমি বলেছিলে না দেড়শ বছর আগে এখানে একটা পুকুর ছিল, সেখানে সবাই ভাসান দিত বলে নাম ছিল ভাসানপুকুর?"

— "হ্যাঁ বলেছিলাম। তো?"

— "মানুষ ঠাকুরকে পুজো করার পর কেন ভাসান দেয় জানো?"

গনশা মাটিতে বসে থাকতে থাকতেই জবাব দেয়, "দুর্গাঠাকুর তখন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আবার বাপের বাড়ি ফিরে যায়।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "ধুর পাগল! ওসব তো শুধু বলার জন্য। আসল কারণ হল মানুষ অত বড় ঠাকুর সারাবছর রাখবে কোথায়? কোথাও রাস্তা আটকে পুজো হয়, কোথাও খেলার মাঠ জুড়ে, তাছাড়া রেখে দিলে ঠাকুরের রঙ উঠে যাবে, চুল নষ্ট হবে, খড় বেরিয়ে পড়বে, তাই নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অনেকদিন ধরে ভাসান হতে হতে সেই পুকুরটার মনে হয় অভ্যাস হয়ে গেছিল ব্যাপারটা। এই সমাজে যাদের ঠাঁই হয় না, যারা ঠিক সমাজের মাপে তৈরি নয়, যাদের সবাই ভয় পায়, ঘৃণা করে, তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত পুকুরটা, নামের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের আত্মাটাও হয়তো এই ভাসানবাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে..."

বড়সড় একটা বাজ পড়ে বাইরে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়, মাটির গন্ধ এসে লাগে নাকে। ভারী চমৎকার একটা সকাল আজ।

বৃষ্টির শব্দ শুনেই দ্রুত খাট থেকে নেমে পড়ে নিতাই, "বৃষ্টি আইসা গেল, বাড়ি জাইতে হইব।" গনশার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলে, "সাতা তো নাই তোর কাসে, আমার লগে বাইরাইরা আয়..."

গনশা আর বাক্যব্যয় না করে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে বাইরে। হৈমন্তী আটকে থাকা কান্নার দমকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্বিনীর বুকের উপরে, "আমার ভয় লাগছে খুব অশ্বিনী..."

— "কীসের ভয়?"

— "ওরা আবার আসবে, ওদের লোক কম নেই। বাড়িটাও কিনে নিয়েছে ওরা, তোমাকে বাঁচতে দেবে না ওরা..."

— "আমাকে বাঁচতে দেবে না!" চাপা হাসি খেলে যায় অশ্বিনীর মুখে।

— "হাসছ কেন তুমি?"

— "না এমনি। আপনিও হাসুন, হাসলে ভালো লাগে আপনাকে দেখতে।"

— "প্লিজ অশ্বিনী, আমার চিন্তা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে, তুমি একা আটকাতে পারবে ওদের সবাইকে? গায়ে ছুরি চললে রক্ত পড়বে না তোমার? গুলি লাগলে..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "কিচ্ছু হবে না। আপনি চিন্তা করবেন না।" হৈমন্তীর মাথায় একটা হাত বোলাতে থাকে অশ্বিনী। তার চোখ দুটো আকাশ থেকে নেমে আসে বিছানার চাদরে।

একটা ঠান্ডা হাওয়া শিহরণ খেলিয়ে দেয় হৈমন্তীর শরীরময়। অশ্বিনীর দুটো গালে দুটো হাত রাখে সে। চোখে চোখ রেখে বলে, "অশ্বিনী আমি জানি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চেয়ে এই মহাবিশ্বকে অনেক বেশি করে চেনো তুমি, আমি শুধু জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কী হবে? তোমাকে আর দেখতে পাব না আমি? আমার আত্মা..."

— "আত্মার কথা বলে গনশাকে ভয় দেখানো যায় হৈম। কিন্তু আত্মা বলে কিছু হয় না। আমাদের শরীর হল আপনার হাতের এই ঘড়িটার মতো, যন্ত্রের কারসাজিতে চলছে। আপনি ভাবতেই পারেন ওর ভিতরে এমন একটা কিছু আছে যেটা ও থেমে গেলে মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু..."

— "তাহলে আমার মৃত্যুর পর..."

— "আপনার শরীর মিশে যাবে মাটিতে। শরীরের সমস্ত কণা ধুলো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে প্রকৃতিতে..."

হৈমন্তীর মাথাটা আবার নেমে আসে অশ্বিনীর বুকে। পেটের কাছে পাঞ্জাবির কিছুটা অংশ টেনে ধরে সে, "তাহলে সব কিছুর অর্থ কী? কেন যত্ন নিচ্ছ আমার? যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল সেদিন কেন এসে উঠেছিলে এই বাড়িতে?"

হৈমন্তীর পিঠে হাত রাখে অশ্বিনী, "আপনি একটু শান্ত হোন।"

জানলা বেয়ে আসা বৃষ্টির ছাটে হৈমন্তীর মুখ ভিজে গেছিল। সেটা একটা হাত দিয়ে মুছে দেয় সে। তারপর একটানা বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার চোখে। হৈমন্তীও চোখ ফেরাতে পারে না। ওর মনে হয় অশ্বিনীর কালো ভরাট চোখের মণির মাঝে অচেনা আশ্রয়ের ছায়া পড়ে আছে।

হৈমন্তীর পেটের কাছে জামাটা বেশ খানিকটা উঠে আছে। কোমর আর পিঠের একটা বড় অংশ বেরিয়ে পড়েছে সেখান থেকে। তুলতুলে চামড়ার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



উপরে লালচে ছোপের দাগ ফুটে রয়েছে কয়েকটা। কান্নার দমকের সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠছে তারা।

— "আমি মরতে চাই না অশ্বিনী, আমি বিসর্জনের জলে ভেসে যেতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই, এখানে, এইভাবে, তোমার কাছে..."

— "থাকবে হৈম, আমার কাছে থাকবে। কয়েক কোটি বছর আগেও ছিলে যেমন, আবার আমি ফিরে আসব, তোমার জন্য..."

কথাগুলোর মানে বুঝতে পারে না হৈমন্তী। পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই, আত্মা বলেও। কিছু নেই তাহলে কী করে ফিরে আসবে অশ্বিনী।

ফিসফিসে শব্দগুলো কানে আসে তার, "সকালে ঘুমিয়ে বিকেলে উঠে কী আর খুঁজে পান না আমাকে? বুঝতেই পারেন না এতটা সময় কোথা দিয়ে চলে গেছে। চেতনা না থাকলে সময়ের হুঁশও থাকে না হৈম। আমি আবার ফিরে আসব তোমার কাছে..."

— "কিন্তু কী করে?" হৈমন্তীর চোখের জলে অশ্বিনীর বুক ভিজে যায়। মাথাটা আলগা করে বালিশের উপরে রেখে উঠে দাঁড়ায় অশ্বিনী, "এখন ঘুমান, আমি বিকেলে আবার আসব।"

— "সত্যি আসবে তো? ভুলে যাবে না?"

অশ্বিনী হেসে মাথা নাড়ে, "ভুলব না। কিন্তু আপনি যে একটা জিনিস ভুলে গেছেন।"

— "কী?"

— "আপনি যেদিন জন্মেছিলেন সেদিন আমি এ বাড়িতে এসেছিলাম, এই কথাটা যে আপনি জানেন সেটা আমাকে বলা উচিত হয়নি আপনার। কারণ ও কথাটা বাবা ছাড়া কেউ জানে না... নিতাইকাকাও না..."

হৈমন্তী উঠে বসার চেষ্টা করে। অশ্বিনী বালিশটা ঠিক করে তার মাথাটা নরম হাতে শুইয়ে দেয় তার উপরে। ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, "বিকেলে আসব আবার। এখন ঘুমান..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# চতুর্দশ অধ্যায়

রাত সাড়ে ন'টা বাজতেই দোকান বন্ধ করার তোরজোড় করছিল সুজয়। নামানো তেরপলের বাইরে রাস্তার উপর একটা গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ শুনে মাথা বের করল। দোকানের বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়েছে মানে দু পয়সা আমদানির সম্ভাবনা আছে। গাড়িটা দেখে তার মন'টা আরও খুশি হয়ে গেল। বড় টাটা সুমো জাতীয় গাড়ি। অন্তত জনাদশেক লোক তো আছেই ভিতরে।

কাঁধের গামছাটা দিয়ে দোকানের বেঞ্চগুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিল সে। মুখে একটা আদিখ্যেতার হাসি ঝুলিয়ে নিল।

দাঁড়িয়ে থাকা সুমো থেকে দুটো লোক নেমে এল। সুজয় বুঝল এরা ছাড়াও আরও লোক আছে গাড়িতে। চায়ের দোকানের বাইরে বাল্বের হলদে আলো জ্বলছিল। সেই আলোতেই সুজয় দেখল লোকদুটোর গায়ে ব্র্যান্ডেড ফুলহাতা শার্ট, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। ঝাঁ চকচকে চামড়া, যেন এক্ষুনি দোকান থেকে কিনে লাগান।

— "হেল্লো..." দু'জনের মধ্যে একজনের শার্টের রঙ নেভি ব্লু। সে সুজয়ের দিকে চেয়ে বলল কথাটা। চায়ের দোকানে এসে কাউকে 'হেল্লো' বলতে শোনেনি এর আগে সুজয়। প্রথমে একটু অপ্রস্তুতে পড়ল। তারপর বোকা হাসি হেসে বলল, "অ্যাঁ? ইয়ে... বসুন না..."

— "গাড়িতে ছ'জন আছে, আর আমরা দু'জন, মানে আট কাপ চা হবে।"

— "এক্ষুনি দিচ্ছি স্যার। গাড়িতে কি দিয়ে আসব?"

লোকটা মাথা নাড়ে, অন্য লোকটাকে দেখিয়ে বলে, "একটা প্লেটে করে অরিন্দমের হাতে দেবেন, ও ভিতরে নিয়ে যাবে।"

আর কথা না বাড়িয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেয় সুজয়। লোকটা রোবটের মতো সোজা হয়ে বসে থাকে বেঞ্চের উপরে। এমন যান্ত্রিক হাবভাব যেন

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



লোকটার শরীরের ভিতরে রক্ত-মাংস নয়, কলকব্জা আছে। সুজয় একবার গাড়িটার দিকে তাকায়। জানলার কাচ নামানো। অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না।

— "কোথায় যাবেন আপনারা?" গদ্‌গদ্ স্বরে জিজ্ঞেস করে সে।

লোকটা মুখ ফেরায়, "কোথাও না। আসলে একজনকে খুঁজছি আমরা।"

— "খুঁজছেন! কাকে?"

— "এ গ্রামে রিসেন্টলি খুন জাতীয় কিছু ঘটেছে?"

সুজয় একটু ঘাবড়ে যায় আগে, তারপর মনে করে উত্তর দেয়, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো গেল সপ্তাহে। বাজারের ঠিক সামনে একটা লোকের কাটা গলা পাওয়া গেছিল...

— "খুনি এই গ্রামেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তাকে আইডেন্টিফাইও করেছি আমরা। তবে ঠিক কোথায় আছে জানি না।"

দুধ উথলে উঠেছে। সুজয় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। সেটা কমিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আপনারা পুলিশের লোক?"

— "বলতে পারো।"

সুজয়ের মুখে হাসি ফোটে, "যাক, নিশ্চিন্ত হলাম স্যার। আমাদের গ্রামে আগে কোনওদিন খুন-টুন হয়নি। যেদিন শুনলাম বাজারের মুখটায় কেউ খুন হয়েছে তার পর থেকে ভারী ভয় লাগছিল। দোকানই তো খুলিনি টানা চারদিন। কিন্তু..." পরের প্রশ্নটা করার আগে একটু থামে সুজয়, "লোকটা খুন হল কেন স্যার? গা ঢাকা দিয়েছিল এখানে?"

— "নাঃ, সেও একজনকে খুঁজতেই এসেছিল।" পকেট থেকে একটা হাতের তালুর সাইজের ছবি বের করে সুজয়ের সামনে ধরে লোকটা, "এই মহিলাকে খুঁজতে এসেছিল। এই মহিলাই খুনি।"

সুজয়ের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ছবির মেয়েটাকে সে চেনে, আগের সপ্তায় ইনিই সুজয়ের দোকানে ভাসানবাড়ির খোঁজ করছিলেন, কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় সুজয়। খুনের মামলার মাঝে জড়িয়ে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



যাওয়া উচিত হবে না। বাড়িতে ছেলে বউ আছে তার।

— "কিন্তু খুন করল কেন স্যার? দেখে তো মনে হয় না..."

— "শি হ্যাজ কোয়াইট আ লাইফ!" মনে মনেই বিড়বিড় করে লোকটা, "ষোল বছর বয়সে এইডস ধরা পড়ে মহিলার। তবে রোগটা লুকিয়ে ছিলেন এতদিন। যিনি খুন হয়েছেন তিনি হলেন এর প্রাক্তন প্রেমিক। তার কাছে জানাজানি হতে ব্যাপারটা ডেঞ্জারাস টার্ন নেয়। শোনা যায় রোগের ডিপ্রেশান থেকে কিছু টেররিস্ট অরগানাইজেশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। শেষে কলকাতা থেকে পালিয়ে এখানে চলে আসেন। এবং তার পিছু ধাওয়া করে তার বয়ফ্রেন্ডও এখানে এসে পৌঁছাতে তাকে গলা কেটে খুন করেন।"

— "এ তো ডেঞ্জারাস মহিলা স্যার!" কাঁপা-কাঁপা হাতে চায়ের কাপ তুলে দেয় সুজয়। গামছা নিয়ে ঘাম মোছে।

— "ভাসানবাড়িটা কোথায় জানো?"

সুজয় হাসে। সেটা লক্ষ্য করে লোকটা বলে, "হাসছ কেন বলতো?"

সুজয় মাথা নেড়ে বলে, "এতদিন বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। আমরা ভুলেই গেছিলাম অমন একটা বাড়ি এ গ্রামে আছে বলে। এদিকে এই এক সপ্তায় রাজ্যের লোক এসে খোঁজ করছে বাড়িটার।"

— "এর আগে কে খোঁজ করেছিল?"

অন্য লোকটার হাতে চায়ের প্লেট তুলে দিয়ে সুজয় বলে, "এই তো তিনদিন আগেই আর একটা লোক এসেছিল। আপনাদের মতোই দেখতে, সেও ভাসানবাড়ির খোঁজ করছিল। আমি তো নিজে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। কাজ মিটে গেলে ফেরার সময় একশো টাকা বকসিস দেবে বলে গেছিল। কিন্তু... আর এলই না দোকানে..."

— "হুম..." লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা একশো টাকার নোট তার হাতে ধরিয়ে দেয়। তারপর বলে, "ধরে নাও তার হয়ে আমিই দিলাম এটা। আমাদেরকে দেখিয়ে দাও বাড়িটা।"

লাজুক হেসে টাকাটা নিয়ে নেয় সুজয়, তারপর বলে, "বাড়ি দেখিয়ে দেব,

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কিন্তু গাড়ি নিয়ে তো যেতে পারবেন না সেখানে। জল পেরিয়ে যেতে হয়।"

লোকটা এবার চিন্তায় পড়ে, "জল পেরিয়ে এতগুলো লোক..."

— "জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা আছে। একটু ঘুরপথ, কিন্তু গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই..."

— "তুমি দেখিয়ে দিতে পারবে? দোকান তো বন্ধই করে দিচ্ছ।"

একটু ইতস্তত করল সুজয়। এত রাতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব। তার উপরে আবার একটা খুনিকে ধাওয়া করে। তাকে দোনোমনো করতে দেখে লোকটা আর একটা নোট চাপিয়ে দিল তার হাতে। এটা আগের থেকে পাঁচগুণ বেশি ভারী।

সুজয়ের হলদে আলোয় ভরা মুখ রঙিন হয়ে উঠল, "এক মিনিট দাঁড়ান স্যার, দোকান'টা বন্ধ করে নিই..."

* * * * * * * * *

— "কলকাতায় থাকলে আকাশ বলে যে একটা জিনিস আছে খেয়ালই হয় না, জানো?"

— "তাহলে ছিলেন কেন এতদিন?"

ভাসানবাড়ির ছাদে শুয়েছিল অশ্বিনী আর হৈমন্তী। ছাদের ঠিক মাঝে একটা শতরঞ্চি পাতা আছে। নরম আদুরে হাওয়া বইছে তার উপরে। দু'জনের চোখই আকাশের বুকে স্থির। কয়েক সহস্র আলোকবর্ষ দূর থেকে আসা তারাদের আলো মেখে দুটো শরীর একই রঙের প্যালেটে মিশে গেছে যেন। হৈমন্তীর একটা হাত পড়ে আছে অশ্বিনীর বুকের উপরে। সে আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

— "আচ্ছা তুমি তো জানতে আমি কবে জন্মেছি, একবারও কলকাতা এসে দেখা করতে পারলে না?"

অশ্বিনী হাসে, "কে বলেছে আমি যাইনি?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "গিয়েছিলে?" অশ্বিনীর দিকে পাশ ফিরে শোয় হৈমন্তী, "স্কুলের মাঠে জ্বরের ঘোরে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম তখন তুমি জাগানোর চেষ্টা করেছিলে আমাকে? যেদিন আত্মহত্যা করতে গেছিলাম সেদিন তুমি ডেকেছিলে আমাকে?"

— "ব্যাস! ওইটুকু? হৈম তোমার জীবনে এমন কোনও মুহূর্ত নেই যেখানে আমি ছিলাম না।"

— "তাহলে আমি তোমাকে চিনতে পারি না কেন বলতো?"

তারা ভরা আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখায় অশ্বিনী, "দেখুন তারাগুলোও রোজ একটু একটু করে সরে যায় নিজের কক্ষপথে। রোজ একটা নতুন আকাশ দেখি আমরা, কিন্তু অচেনা লাগে না। আমারও তাই অচেনা লাগে না আপনাকে। আবার ভাবুন আজ থেকে কয়েক কোটি বছর পরে আকাশের তারাগুলো এতই পালটে যাবে যে আজকের সঙ্গে আর মিল পাবেন না। তখন আর চিনতে পারবেন না আকাশটাকে।"

— "মানে তোমার আর আমার মধ্যে ব্যবধান শুধু সময়ের?"

হৈমন্তীর মাথায় একটা হাত রাখে অশ্বিনী, "না হৈম, আমার কাছে সময়ের কোনও অস্তিত্ব নেই। তোমার কাছে আছে।"

— "তুমি কী বল আমি বুঝি না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। যেমন কিছু না বুঝেও ঝলমলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।"

দু'জনের হাত খেলা করতে থাকে শতরঞ্চির উপরে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার কাশি এসেছে হৈমন্তীর। কাশি চাপতে গিয়ে মুখে রক্তের স্বাদ গিলে নিয়েছে। কাশলে এই মুহূর্তটা নষ্ট হয়ে যাবে। অশ্বিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে।

— "নিবারণকাকা কোথায় আছে জিজ্ঞেস করবে না?"

— "না..."

— "একটা প্রশ্ন করব কিছু মনে করবে না?"

— "না, করুন।"

— "তোমাকে উনি ভয় পান কেন? তুমি ওর ক্ষতি করতে চাও?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



অশ্বিনীর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়, সে কোনও উত্তর দেয় না। হৈমন্তী বোঝে প্রসঙ্গটা পছন্দ হয়নি তার। দুটো হাত দিয়ে অশ্বিনীর হাত জড়িয়ে ধরে সে বলে, "আচ্ছা আমার একটা ইচ্ছাপূরণ করবে?"

— "কী?"

— "আমি ইলেকট্রিক চুল্লিতে পুড়তে চাই না। আমি মরে গেলে..."

— "এসব কথা এখন থাক।"

— "উঁহু। শুনে নাও। আমি একেবারে ট্র্যাডিশানাল পদ্ধতিতে পুড়তে চাই। সেই মাঠের উপর বটগাছটা যেখানে ছিল সেখানে চিতা সাজাবে আমার, তারপর নিজে হাতে মুখাগ্নি করবে... করবে তো?"

— "আচ্ছা।"

একটু উদাস হয়ে যায় হৈমন্তী, "আমার একটা বোন আছে, জানো। ভারী ভালোবাসত আমাকে। কিন্তু এখন কোথায় আছে জানি না।"

— "কেন?"

— "আমিই বলেছি যোগাযোগ না রাখতে। বিয়ে হয়ে গেছে শুনেছিলাম। সুখেই আছে মনে হয়।"

— "আপনি সুখে নেই?"

হৈমন্তীর চোখ দুটো ভিজে যায়, বাস্পমাখা স্বরে সে বলে, "পাগল ছেলে, সুখে আছি বলেই তো কষ্ট হচ্ছে..."

— "আপনি কী বলেন বুঝি না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে।"

অশ্বিনীর বুকের কাছে মাথা রেখে শোয় হৈমন্তী।

* * * * * * * * *

মেঠো পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভিতরে গাড়িটা এসে পড়তেই অস্বস্তি শুরু হয় সুজয়ের। তার অনেকগুলো কারণ হতে পারে। এত দামি গাড়িতে সে আগে চাপেনি, গাড়ির ভিতরে যে মানুষগুলো বসে আছে তাদের কারও মুখই দেখা

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



যাচ্ছে না, কেউ কোনও কথা বলছে না, এইসব কারণের সঙ্গে আর একটা অনুভূতি এসে মিশছে বারবার। থেকে থেকে তার মনে হচ্ছে গাড়ির পাশে পাশে আরও একটা কিছু ছুটে চলেছে। কিন্তু যে চলেছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে কালো জানলার ওপার থেকে ভিতরে চোখ রেখে সুজয়কে দেখার চেষ্টা করছে। এমন অদ্ভুত ভয় আগে কখনও লাগেনি সুজয়ের।

নেভি ব্লু শার্ট পরা লোকটা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছে ব্যাপারটা। মুখ ঘুরিয়ে বলে, "কী ব্যপার? উশখুশ করছ কেন?"

— "কেমন একটা যেন লাগছে স্যার।"

— "কেমন লাগছে? রাস্তা চিনতে পারছ না?"

সজোরে ঘাড় নাড়ে সুজয়। পকেটের ভিতরে দুটো নোট যেন ঘা দিয়ে হুঁশ ফেরায় তার, শুকনো হাসি হেসে বলে, "আসলে গ্রামের লোক বলে এ জঙ্গলটা ভালো নয়।"

— "কেন? ভূত আছে?" লোকটা বাঁকা হাসি হাসে।

— "না স্যার। ভূত নেই তবে... কিছু একটা আছে। আমার বাবার মুখে একটা গল্প শুনেছি... তিনি তখন ছেলেমানুষ..."

— "গারবেজ।" অন্ধকার মুখগুলোর মধ্যে একটা বলে ওঠে কথাটা। নীল শার্ট হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয়, "আহা বলতে দাও ওকে।" তারপর সুজয়ের দিকে চেয়ে বলে, "বলো কী বলছিলে?"

সুজয়ের চোখ জানলার বাইরে গাছগাছালির ফাঁকে জমে ওঠা অন্ধকারে স্থির হয়ে গেছে, "অনেককাল আগে এখানে একটা বড় বাজ পড়েছিল। তারপর থেকেই জঙ্গলের একটা জায়গায় আর গাছ গজায় না। সমস্ত জায়গাটা কেমন খয়েরি হয়ে গেছে। গ্রামের লোক কেউ যেতে চায় না ওখানে... যারা যায় তারা কেমন যেন হয়ে যায়..."

— "বাবা! মনে হচ্ছে ভূতের গল্প!" পিছনদিক থেকে কেউ কৌতুক মেশানো গলায় বলে।

— "না স্যার, ভূত নয়। অদৃশ্য কিছু। সে মানুষের কোনও ক্ষতি করে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



না। কেবল... রয়েছে ওখানে। চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ধরা যায় না, শুধু আছে এটুকু বোঝা যায়।"

— "স্টিল সাউন্ডস ঘোস্ট টু মি..."

এবার অন্য একটা গলা। সুজয় চুপ করে যায়। নেভি ব্লু শার্ট মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "সে তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার গল্পটা কী?"

— "আমার বাবা একবার স্পর্শ করেছিলেন তাকে।"

— "এই যে বললে অদৃশ্য... তাহলে স্পর্শ করলেন কী করে?"

সুজয়ের গলা দূরে ভেসে যায়, যেন জঙ্গলের গভীর থেকেই কথা বলছে সে, "বাবা ভারী সাহসি মানুষ ছিলেন। ওই পাগলাটে গোছের। মাঝরাতে জঙ্গলের ভিতরে ঘোরাঘুরি করতেন। আমরা ভোরে উঠে দেখতাম বাবার সারা গায়ে ঝোপঝাড়ের শুকনো পাতা। কোথাও বুনো কাঁটাগাছে চিরে গেছে।

একদিন সকালে বাবা বাড়ি ফিরতে দেখি তার ডানহাতের আঙুলের মাথাগুলো নেই। যেন ধারালো ব্লেড দিয়ে মাখনের মতো কেটে নিয়েছে কেউ। এদিকে রক্ত পড়ছে না, কোনও যন্ত্রণা নেই। যেন আঙুলগুলো আগে ছিলই না ওখানে... তারপর থেকে আর জঙ্গলে যেতেন না বাবা, কারও সঙ্গে তেমন কথাও বলতেন না। ঠিক কী করে তার আঙুলগুলো খোয়া গেল সে কথাও বলেননি কোনওদিন..."

এবার আর কোনও টিপ্পনি ভেসে এল না। তার বদলে পিছন থেকে একটা প্রশ্ন ভেসে এল, "আপনার বাবা বেঁচে আছেন?"

— "না স্যার... দশবছর হল মারা গেছেন।"

নেভি ব্লু শার্ট এবার পিছনে ঘোরে। অন্ধকার মুখগুলোর দিকে চেয়ে বলে, "এ জঙ্গলে ভূত নেই, কিন্তু কী আছে সেটা মনে হয় খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি।"

— "কী?"

— "ওই যে স্যার, দেখা যাচ্ছে বাড়ির মাথাটা, ওটাই ভাসানবাড়ি।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



* * * * * * * *

দূর থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসে। গ্রামের দিকে পথঘাট শুনশান থাকে। তাছাড়া এখানে অন্য গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ নেই। ফলে নরম মাটির উপরে চাকা ঘষ্টানোর যান্ত্রিক শব্দ দূর থেকেও শোনা যায়। হৈমন্তী আধো ঘুমে জড়িয়ে ছিল। সামান্য শব্দেই তার তন্দ্রা ভেঙে যায়। ওর কাঁধের ঠিক পাশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে অশ্বিনী। এই প্রথমবার ছেলেটাকে ঘুমাতে দেখল হৈমন্তী। ইচ্ছে করেই ডাকল না।

কিন্তু এত রাতে গাড়ি করে কে এল? চাপা কৌতূহল ঘিরে ধরল হৈমন্তীকে। গাড়িটা বড়সড়। ভাসানবাড়ির সামনে টায় এসেই হেডলাইট নিভিয়ে ফেলেছে গাড়িটা। মানে ভিতরে যারা আছে তারা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে চায় না। উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে হৈমন্তী অপেক্ষা করতে থাকে।

গাড়ির দরজা খুলে যায় ধীরে ধীরে। ভিতর থেকে কয়েকটা ছায়া নেমে আসে। তাদের হাতে বড়সড় কিছু ধরা আছে। অন্ধকারেও অবয়বটা ফুটে ওঠে— শটগান। বিড়ালের মতো সন্তর্পণে তারা এগিয়ে আসতে থাকে ভাসানবাড়ির দিকে।

অশ্বিনীর ঘুমন্ত মুখের দিকে ফিরে তাকাল একবার হৈমন্তী। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে তার। গলা শুকিয়ে আসছে বারবার। লোকগুলো তার খোঁজেই এসেছে সন্দেহ নেই।

দ্রুত শতরঞ্চির উপরে ফিরে এসে অশ্বিনীর গায়ে ঠেলা দিল হৈমন্তী, "প্লিজ একটু ওঠো, কারা যেন এসেছে... অশ্বিনী..."

ছেলেটা নড়ল না। যেন ঘণ্টাখানেক আগেই মারা গেছে সে। শরীর ঠান্ডা হয়ে আছে। সেটা রাতের কনকনে হাওয়ায় না সত্যি তার দেহে প্রাণ নেই বোঝা যায় না।

লোকগুলোর পায়ের আওয়াজও এবার কানে এল হৈমন্তীর। সে চাপা চিৎকার করে উঠল, "অশ্বিনী... এরকম করো না। তুমি বলেছিলে আমার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কিছু হতে দেবে না... ওরা আমাকে ছাড়বে না... প্লিজ..."

প্রাণের শেষ স্পন্দনটুকুও মুছে গেছে ছেলেটার শরীর থেকে। মুখ ফ্যাকাসে লাগছে। কাঁপা-কাঁপা হাত নাকের সামনে রাখে হৈমন্তী। নিশ্বাস বন্ধ। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

* * * * * * * *

— "দাঁড়ান স্যার। আগে আমি যাই।" এগিয়ে যাওয়া লোকগুলোর দিকে চেয়ে সুজয় বলল।

— "কেন?"

— "বাড়িতে একটা কেয়ারটেকার আছে। আমার সঙ্গে মুখ-চেনা। আমি গিয়ে বললে দরজা খুলে দেবে।"

নেভি-ব্লু শার্ট অরিন্দম বলে লোকটার কাছে গিয়ে কী যেন আলোচনা করে নেয়। তারপর ফিরে এসে বলে, "বেশ তুমি আগে যাও। আমরা জোর করে দরজা খোলাতে চাই না। গোলাগুলি, চিৎকার চেঁচামিচি যত কম হয় ততই ভালো।"

একটু আগের আদিখ্যেতার হাসিটা আবার হেসে সুজয় বলে, "একটা কথা বলি স্যার? কিছু মনে করবেন না। একজন মহিলা, যে আবার মারণরোগে ভুগছে, তাকে ধরতে আপনারা এত লোকজন আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছেন! মহিলার কিন্তু এলেম আছে!"

— "শি ক্যান বি আ বিচ আন্ডার সারকামস্টেন্সেস!"

কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে যায় সুজয়। জল-কাদা পেরিয়ে ভাসানবাড়ির বাগানের দরজার বাইরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর এগোয় না। প্রায় মিনিট তিনেক স্পন্দন খেলে না শরীরে।

দু'জন বন্দুকধারী সাবধানে ফলো করছিল তাকে। তারা কাছে এগিয়ে গিয়ে পিঠে খোঁচা দেয়, এই শালা, দাঁড়িয়ে গেলি কেন?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



সুজয় ঘুরে দাঁড়ায়। বন্দুকধারীরা সভয়ে পিছিয়ে আসে। সুজয়ের দুটো চোখের মণি উধাও হয়েছে। তার বদলে চোখ ঢেকে গেছে রক্তের মতো লাল রঙ্গে। মুখমণ্ডল তরল গলিত লাভার মতো ভেঙে-চুরে যাচ্ছে। যেন সুজয়ের শরীরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে অন্য কেউ, অন্য কিছু...

কিছু না বুঝেই পরপর দুটো গুলি চালায় দু'জন। সুজয়ের গলিত শরীরের মাঝে হারিয়ে যায় সেগুলো। শরীরটা লম্বায় বাড়তে শুরু করেছে। আর মানুষের মতো আকৃতি নেই তার। লাভার মতো তরল আগুনের রেখা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। যেন একটুকরো সূর্য কেটে এনে কেউ রেখে দিয়েছে ভাসানবাড়ির সামনে। হিংস্র নয়, অথচ ভয়াবহ, ধোঁয়ার মতো গ্রাস করছে চারিদিক, অথচ ধোঁয়া নয়, নিস্প্রাণ নয়।

গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে হইচই পড়ে যায়। একযোগে চিৎকার করতে গিয়েও পারে না তারা। মনে হয় সাঁড়াশি দিয়ে জিভ টেনে ধরেছে কেউ। পা আটকে দিয়েছে। স্থবিরের মতো সেই বেড়ে ওঠা কঠিন মেঘের কুন্ডলির দিকে চেয়ে থাকে তারা। সেটা বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় বাড়িটার সমান আকৃতি ধারণ করেছে।

সেই আকাশছোঁয়া মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন মানুষের উপরে। তারপর সরে আসে গাড়িটার দিকে। পাথরে পরিণত হওয়া মানুষগুলোর চোখে প্রতিফলিত হয় সেই আগুন।

নেভি ব্লুর টি-শার্ট পরা মানুষটার দিকে এগিয়ে আসে মহাজাগতিক সেই আগুন। তিনি চোখ বন্ধ করে নেন। চোখ খুলতেই দেখেন সুজয় দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক সামনে। তার মুখ-চোখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। রোবটের মতো খটখটে শব্দে কয়েকটা কথা বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে, "আমি চাই না আপনারা আর এখানে আসুন।"

লোকগুলোর মুখে আর কোনও কথা ফোটে না। সুজয় হাত বাড়িয়ে লোকটার পকেট থেকে হৈমন্তীর ছবিটা বের করে নিয়ে বলে, "উনি যতদিন বেঁচে আছেন এ বাড়িতে আসবেন না আপনারা। উনি মারা গেলে বাড়ি ভেঙে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



যা ইচ্ছা করতে পারেন। তার আগে না। বুঝতে পেরেছেন?"

ব্লু শার্ট মাথা নাড়াতে ভুলে গেছিলে। সুজয় তার কাঁধে হাত রেখে বলে,

— "বুঝেছেন তো?"

— "হ্যাঁ।"

— "এবার চলে যান।"

মিনিট তিনেক পর একটা ছোট ধাক্কা লেগে যেন জ্ঞান ফেরে সুজয়ের। সে অবাক হয়ে দেখে জঙ্গলের রাস্তা ধরে গাড়িটার আলো মিলিয়ে আসছে। এতক্ষণ কী হয়েছে কিছুই মনে নেই তার। পকেট চেপে ধরে নোট দুটো অনুভব করে সে।

* * * * * * * * *

— "অশ্বিনী... অশ্বিনী..."

পাগলের মতো কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে হৈমন্তী। হঠাৎই ধড়ফড় করে উঠে বসে অশ্বিনী। উদ্বিগ্ন মুখে বলে, "কী হয়েছে হৈম?"

হৈমন্তী ডুকরে ওঠে, "আমি ভাবলাম তুমি..."

অশ্বিনী হাসে। একটা হাত দিয়ে হৈমন্তীর মাথাটা কোলে টেনে নেয়।

— "বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকগুলো লোক এনেছে ওরা।"

— "তাই নাকি! কই দেখি তো..." দু'জনে মিলে গিয়ে দাঁড়ায় ছাদের ধারে। বাইরে অন্ধকার রাত আগের মতোই পড়ে রয়েছে। নিশ্চুপ। গাড়ি উধাও হয়েছে। কোনও মানুষেরও চিহ্ন নেই। হৈমন্তী হাঁ করে চেয়ে থাকে সেদিকে।

— "মিছিমিছি ভয় পান আপনি...।" অশ্বিনী নিচু গলায় বলে।

দু'হাতে তার কনুই চেপে ধরে হৈমন্তী। তারপর চোখ বোজে।

* * * * * * * * *

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "ড্রাইভ দ্যা কার... যত জোরে পারো চালাও গাড়িটা।"

গাড়ির বাকি লোকগুলো হতভম্ব হয়ে গেছিল, তাদের মধ্যে একজন উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করে, "ওয়াট দ্য ফাক ওয়াজ দ্যাট!"

— "আর যাই হোক, এই পৃথিবীর কিছু নয়।", অরিন্দমের হাত পা কেঁপে চলেছে এখনও, "এণ্ড ইট হ্যাজ ফাকিং শেপশিফটিং এবিলিটি।"

— "আর ওই জঙ্গলে?"

— "এই... প্রাণীটার সঙ্গে স্পেস থেকে আরও কিছু এসেছিল এখানে।"

— "কী?"

অরিন্দমের গলকণ্ঠটা ওঠানামা করে একবার, ঢোক গিলে সে বলে,

— "ডার্ক ম্যাটার। ম্যাটার যখন ডার্ক ম্যাটারের কন্ট্যাক্টে আসে তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই জন্যেই লোকটার আঙুলগুলো... কিন্তু..." একটু থেমে রাস্তার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আবার বলে সে, "ডার্ক ম্যাটার পৃথিবীতে পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র স্পেসের কোনও কোনও জায়গায় থাকতে পারে বলে ধারণা করতে পারি আমরা। এ জঙ্গলে সেটা আছে মানে কোনওভাবে সেটা এসেছিল..."

— "কীভাবে?"

— "হয়তো বিশেষ কোনও কারণে কেউ নিয়ে এসেছিল..."

— "কী কারণে?"

— "আই হ্যাভ নো ফাকিং আইডিয়া..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# পঞ্চদশ অধ্যায়

— "বিলেতে একটা ভারী অদ্ভুত গিফট দেওয়ার চল আছে, জানো, অ্যান্ট ফার্ম। আমরা যেমন অ্যাকোরিয়ামে মাছ পুষি সেইরকমই খানিকটা। তবে মাছের বদলে পিঁপড়ে। একটা বাক্সের মধ্যে অজস্র পিঁপড়ে জন্মায়, খায়, বড় হয়, মারা যায়, এমন করে চলতে থাকে। সেই জীবিত পিঁপড়ে ভর্তি বাক্সটা গিফট করে একে অপরকে।

কিছু দার্শনিকের মতে অ্যান্ট ফার্মের মধ্যে নাকি লুকিয়ে আছে মহাজগত সৃষ্টির তত্ত্ব। মানে আমাদের এই মহাজগত কেউ সৃষ্টি করেছিল স্রেফ আমাদের অবসার্ভ করার জন্য।"

কলকাতা প্রেস ক্লাবে টেড টকসের হয়ে বক্তৃতা রাখছিলেন গবেষক আনন্দ চৌধুরী। বক্তৃতার বিষয় ভারী গম্ভীর। তবে ট্যাগলাইন'টা জলের মতো সহজ — Where is Everybody

একটু আগেই সহজ ট্যাগলাইন'টার জটিল অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন ডক্টর চৌধুরী, "কেবলমাত্র আমাদের এই গ্যালাক্সিতেই, একেবারে আমাদের সূর্যের মতো কয়েক বিলিয়ন নক্ষত্র আছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই বয়স আমাদের সূর্যের চেয়ে কয়েক বিলিয়ন বছর বেশি। সেই সমস্ত সূর্যের আশেপাশে পৃথিবীর মতো আরও কয়েক বিলিয়ন পৃথিবী আছে। বুঝতেই পারছ খাতা কলম নিয়ে বসলে দেখা যাবে এই সমস্ত পৃথিবীতুল্য গ্রহে মানুষের চেয়ে অধিকতর জটিল প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিরানব্বুই শতাংশ। এতদুর হিসেব নিয়ে কোনও গোলমাল নেই। শুধু একটা প্রশ্নে এসে আটকে যাই আমরা।"

স্ক্রিনে ফুটে ওঠা ট্যাগলাইনের দিকে নির্দেশ করেন আনন্দ, 'Where is Everybody?' থাকার সম্ভাবনা যদি একশো শতাংশ হয়, তাহলে তারা নেই

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কেন? মানুষের চোখে এবং যন্ত্রে তাদের টিকিটিও ধরা যায় না কেন?'

এতক্ষণে জায়ান্ট স্ক্রিনের দৃশ্য পালটে গেছে। স্ক্রিন জুড়ে ফুটে উঠেছে অ্যান্ট ফার্ম, "আমরা পিঁপড়ে পুষি, কারণ পিঁপড়ে, মাছ এদের থেকে বিবর্তনে আমরা এগিয়ে গেছি। ঠিক তেমনই মানুষের থেকে বিবর্তনে কয়েক বিলিয়ন বছর এগিয়ে থাকা, মানুষের থেকে বহুগুণ বেশি বুদ্ধিধর, বহুগুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও প্রাণী ইচ্ছা করেই নিরীক্ষণ করে চলেছে আমাদের। এমন কী এও ধরে নেওয়া যায় পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির মূল কারিগর তারাই। বিজ্ঞানের ভাষায় এ তত্ত্বের নাম ফার্মি প্যারাডক্স। কিন্তু এই ফার্মি প্যারাডক্স নিয়েও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সে প্রশ্নটা আসে একটি পুরনো বাংলা প্রবাদ থেকে। সব বাপেরই একটি বাপ আছে। মানে, যদি কোনও এলিয়েন রেস মানুষকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তাহলে সেই রেসকেও নিশ্চয়ই কেউ পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। তাদেরকে আবার অন্য কেউ। সোজা কথায় আমরা যদি পেছতে থাকি তাহলে দেখতে পাব সমস্ত ব্যাপারটা একটা ধাপে ধাপে ভাগ করা ত্রিভুজের মতো। এই ত্রিভুজের একেবারে নিচের ধাপে পিঁপড়ে, তার ঠিক উপরের ধাপে মানুষ, মানুষের উপরের ধাপে কে আছে তা আমরা জানি না। ত্রিভুজের একেবারে চূড়াতে কে আছে সে সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই আমাদের। শুধু এটুকু জানি, তার বিবর্তন সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ সেই এই জগতের আদিমতম বাসিন্দা।"

একটু থেমে টেবিলের উপর রাখা জলের বোতল থেকে একটু জল খেয়ে নেন আনন্দ চৌধুরী। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলেন, "বেশ, এতদূর তো হল। কিন্তু এরপর প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ তো পিঁপড়েদের খেতে দেয়, পিঁপড়েদের থেকে লুকিয়েও থাকে না। তাহলে আমরা আমাদের বড়বাবুদের দেখতে পাই না কেন? এই উত্তরটা দেবার জন্যেও একটা তত্ত্ব আছে। আগে তত্ত্বটা বলি, তারপর নাম বলছি।

পিঁপড়েদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অনুন্নত, তারা খাবারটা বোঝে, কিন্তু কে খেতে দিচ্ছে বোঝে না। একদিন খেতে দিয়েছেন বলে তারা আপনার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায় না। একদিন পিঁপড়ের চাকে জল ঢেলে দিলে পরের দিন রাস্তায় কিছু ডেয়ো পিঁপড়ে আপনার মোজার ভিতরে ঢুকে পড়ে না। কিন্তু মানুষ উন্নত মস্তিষ্কের জীব। সে ভাবতে পারে, ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার রাগ, দুঃখ, অভিমান, প্রেম ইত্যাদি আছে, আমাদের থেকে উন্নত কোনও প্রাণী যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাহলে সে যোগাযোগ যতই সৌজন্যমূলক হোক না কেন, তার একটা প্রভাব পড়বে আমাদের সভ্যতার উপরে। যোগাযোগ না হলে ঠিক যা হত সেটা আর ঘটবে না। সব থেকে বড় কথা মানব সভ্যতা আর শুধু 'মানব' সভ্যতা থাকবে না। পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেটর যেমন উত্তর জানা সত্ত্বেও বলে দেন না, ঠিক সেভাবে আমাদের সভ্যতাকে কেবলমাত্র আমাদের নিয়মে এগোতে দিতেই বাইরের জগতের প্রাণীরা, অবসার্ভাররা, আমাদের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখে নিজেদের। চিড়িয়াখানার প্রাণীদের মতো সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের উপর কেবল নজর রাখে তারা। এই তত্ত্বের নামটাও তাই চিড়িয়াখানার সঙ্গে মিলিয়েই, জু হাইপোথিসিস।

জু হাইপোথিসিস নিয়ে মাতামাতি নতুন শুরু হলেও ধারণাটা কিন্তু বেশ পুরনো। বহু প্রাচীন দার্শনিকরা এর কথা বলে গেছেন। আমাদের মধ্যে যারা স্কেপ্টিকাল তারা ছোটবেলায় বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা, ঈশ্বর আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, তাও পৃথিবীতে এত খারাপ ঘটনা রোজ ঘটে চলেছে কেন? তিনি কি নেমে এসে কিছু ঠেকাতে পারেন না?"

টেবিল ছেড়ে একটু এগিয়ে এসে আনন্দ চৌধুরী বলেন, "এই উত্তরটা জু হাইপোথিসিস দিয়ে দেওয়াই যায়। কিন্তু মানুষ তখন আর ঈশ্বরের সন্তান নয়, ঈশ্বরের তৈরি চিড়িয়াখানার একটি স্পেসিমেন হয়ে যায়।"

ডক্টর চৌধুরী বোঝেন এরপর আলোচনা করতে গেলে মহাবিশ্বের অন্ধকারের থেকেও গভীর মানবমনের অন্ধকার অংশে আঘাত করবেন। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে একটা মৃদু রসিকতা করে বক্তৃতা শেষ করেন তিনি। তারপর রিমোটের বোতাম টিপে আলো নিভিয়ে দেন।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কেউ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাহলে?"

কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটু গম্ভীর হন ডক্টর চৌধুরী, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, "জু হাইপোথিসিস যদি সত্যি হয় তাহলে তা রুল অফ নেচার। নিজের নিয়ম বিঘ্নিত হলে নেচার সেই বিঘ্ন মেরামত করে নেয় নিজেই। এক্ষেত্রে কীভাবে করবে তা বলার ক্ষমতা নেই আমার।"

পোডিয়াম থেকে খানিক দূরে অস্মিতাকে দেখতে পায় হৈমন্তী। সেদিকে এগিয়ে যায় সে। একটা কাগজে মন দিয়ে কিছু লিখছিল অস্মিতা।

হৈমন্তী ঝুঁকে পড়ে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, "প্লিজ কিছু মাইন্ড করবেন না, আমার আপনাকে ভীষণ চেনা চেনা লাগছে।"

মুখ তুলে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে অস্মিতা, তারপর একটু সহজ হয়ে বলে, "আপনি কী নাটক-টাটক দেখেন?"

কপালে হাত দেয় হৈমন্তী, "শিট, একদম ভুলে গেছি, দেখলেন তো। এই তো আগের মাসেই অ্যাকাডেমিতে দেখলাম। কিং লেয়ার। আপনি মনে হয় গোনরিলটা করেছিলেন?"

অস্মিতা মিষ্টি করে হাসে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আসলে নেগেটিভ ক্যারেক্টার বরাবরই ভালো লাগে আমার। তাছাড়া ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে ওরকম একটা এগ্রেসিভ ক্যারেক্টার... লোভ সামলাতে পারিনি..."

— "বাবা! শেক্সপিয়ারের নাটকও করেন আবার মহাকাশ নিয়েও আগ্রহ আছে! বিরাট রেঞ্জ তো আপনার!" হৈমন্তী হেসে বলে।

— "এই শেক্সপিয়ার ভদ্রলোকও কিন্তু মহাকাশ নিয়ে রীতিমত লেখালিখি করেছিলেন। সে-সময়ে স্পেস সাইন্স এতটা এগোয়নি বলে ভুল্‌ভাল লিখেছিলেন তা ঠিক, কিন্তু আগ্রহ কম ছিল না।"

হৈমন্তী আর কিছু বলে না, অস্মিতা নিজে থেকেই বলে ওঠে, "তবে কী জানেন, আমি এখানে এসেছিলাম অন্য একটা উদ্দেশ্যে। ডক্টর চৌধুরী বিগ ব্যাং নিয়ে বিস্তর অনেক লেখালিখি করেন। কিন্তু এখানে এসে দেখি আজ সাবজেক্ট আলাদা।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হৈমন্তীর এই বিজ্ঞান আর ফিলোসফির কচকচানি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সে দেখা করতে এসেছে অস্মিতার সঙ্গে। যেভাবেই হোক মেয়েটার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে হবে।

পোডিয়াম থেকে নিচে নেমে আসতে ডক্টর চৌধুরীকে ঘিরে ধরে কিছু উৎসাহী টিনেজার। তাদের এক-এক জনের এক-এক রকম প্রশ্ন। সেসব সামলাতেই বিশেষ একজনের দিকে আঙুল তুলে দেখান চৌধুরী। সে খুশি হয়ে নিজের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, "স্যার আপনার সব কথাই বুঝেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন ভুল করে মাঝে-মধ্যে সিংহের খাঁচায় ঢুকে পড়ে, তেমনই এলিয়েনদের কেউ কী ভুল করে আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে ফেলতে পারে না?"

ডক্টর হাসেন, "ইউ.এফ.ও, লম্বা মাথার বেঁটে প্রাণী কিংবা ফ্লাইং সসার, এসব কী কম দেখা গেছে রে ভাই? এরিয়া ৫১ যাও না, দেখবে তেঁনারা রীতিমতো তল্পিতল্পা নিয়ে বসেছেন।"

— "ওসব তো আমেরিকায় স্যার। আমাদের দেশে দেখা যায়নি তেমন..."

— "কারণ আমাদের দেশে সাইন্স-ফিকশন নিয়ে মাতামাতি নেই, তাই এলিয়েনও নেই। যারা ভূতে বিশ্বাস করে, তারাই ভূত দেখে।" এগিয়ে এসে ছেলেটির কাঁধে হাত রাখেন চৌধুরী, "আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে যদি কোথাও প্রাণ থেকেও থাকে তাহলে সে আমাদের থেকে কয়েক বিলিয়ন বছরের বেশি প্রাচীন। ফলে ক্ষমতার তফাতটা বাঘ-মানুষের নয়। অস্ট্রালোপিথেকাস, মানে একেবারে বাঁদর থেকে আজকের মহাকাশচারী মানুষ হতে সময়ে লেগেছে কুড়ি লক্ষ বছর। এই হিসেবে আমাদের থেকে এক বিলিয়ন বছর আগে তৈরি হওয়া প্রাণীর সভ্যতার সঙ্গে আমাদের গ্যাপটা ওর পাঁচশো গুণ। মানে আমাদের থেকে তাদের পাঁচশোগুণ বেশি উন্নত হওয়ার কথা। তাহলে ভেবে দেখো, তারা যদি গা ঢাকা দিতে চায়, আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে, খালি চোখে তাদের চাকতি-টাকতি দেখে ফেলব?"

কথাটা শেষ হতেই আবার প্রশ্ন আসে, "কিন্তু যদি হয় স্যার? যদি সত্যি

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আর একদিন আসবেন না হয়।"

আগের মাসে অ্যাকাডেমিতে অস্মিতার নাটক ছিল সেটা তার ফেসবুক প্রোফাইল দেখেই জেনেছে হৈমন্তী। আলাপ জমানোর জন্য কাজে লেগে গেল ইনফরমেশান'টা।

দু'জনে হেঁটে কনফারেন্স হলের বাইরে বেরিয়ে আসে। অস্মিতা মেয়েটা ভারী সরল। নানারকম বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান আছে তার। হলের বাইরে একটা কফি-শপ দেখে তার ভিতরে এসে টেবিল নিয়ে বসে পড়ল দু'জনে।

এর মধ্যে শেক্সপিয়ারের নাটকে স্পেস নিয়ে বেশ কিছু ছেঁদো কথা বলে গেছে অস্মিতা। মেয়েটা মনে হয় বকবক করতে ভালোবাসে। হৈমন্তীর সুবিধাই হল। দু কাপ কফি টেবিলে এসে পড়তে, তাতে একটা বড়সড় চুমুক দিয়ে অস্মিতা বলে, "স্কুলে আমাদের শেখানো হয়েছিল পদার্থের সব থেকে ছোট কণা হল পরমাণু, ডাহা মিথ্যে কথা!"

— "নয়?"

ওই দেখুন, গলথফ্যায়মি। আমার মা, আমার বাবাকে ছাড়া থাকতে পারেন না, এমনকি সামনের দোকান বাজারে গেলেও ট্যাঁকে বেঁধে নিয়ে যান। এর জন্য কি মাকে আর আলাদা করে মানুষ বলা যাবে না?"

— "নিশ্চয়ই যাবে।" হৈমন্তী হাসে।

— "পরমাণুকে ভেঙে ফেললে আসে ইলেকট্রন, প্রোটন আউর নিউট্রন। এই তিনটে কণাও তৈরি হয় 'কোয়ার্ক' নামে এক ধরনের কণা দিয়ে। কোয়ার্ক একা একা থাকতে পারে না বলে এর কথা ভাবিই না আমরা। কিন্তু কোয়ার্ক ভারী মজার জিনিস, জানেন?"

— "মজার!" হৈমন্তীর ভুরু দুটো কুঁচকে যায়, "মজার কেন?"

— "আপনি, আমি বা সুনিতা উইলিয়ামস চারপাশে যা কিছু দেখে এসেছি এতদিন, তার সব কিছুই তৈরি হয়েছে কোয়ার্ক দিয়ে। বিগ ব্যাং যখন ঘটে তখন দুটো জিনিস তৈরি হয়। এক, সময় আর দুই, কোয়ার্ক। কিছু কোয়ার্ক মিলেমিশে তৈরি হয় প্রথম হাইড্রোজেন। সেই হাইড্রোজেন থেকে আবার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



একগাদা অন্য মৌল। সেখান থেকে এই এত্ত কিছু!"

— "সত্যি, ভীষণ মজার!" হৈমন্তী বাঁকা হাসি হেসে বলে, "কিন্তু আমি শুনেছিলাম তিনটে জিনিস তৈরি হয়েছিল। টাইম, স্পেস আর এনার্জি..."

— "আরে সেই হিটলারের তাড়া খাওয়া ইহুদি বুড়োকে ভুলে গেলেন। তিনিই তো বলে গেছিলেন স্পেস, এনার্জি আর ম্যাটার বলে আলদা করে কিছু নেই। এনার্জি আর ম্যাটার নিয়ত একে অপরে বদলে যাচ্ছে আর স্পেস বলতে..." বাকি কথাগুলো বলতে গিয়েও থেমে যায় অস্মিতা, সে বুঝতে পারে উলটোদিকের মানুষটার আগ্রহে ভাঁটা পড়েছে, প্রসঙ্গ পালটে সে বলে, "আপনি বোর হচ্ছেন, তাই না?"

হৈমন্তী লজ্জিত হয়, সেটা সামলে নিয়ে বলে, "উঁহু, অবাক হচ্ছি। স্পেস নিয়ে তোমার এত আগ্রহ দেখে।"

অস্মিতার মুখের সামনে থেকে চুল সরিয়ে বলে, "আমাদের শরীরটাও কোনও মৃত তারা ভেঙে বেরিয়ে আসা কোয়ার্ক থেকেই তো তৈরি হয়েছে। আমারাও মহাবিশ্বেরই অংশ। আমাদের মহাবিশ্বের রহস্য জানতে চাওয়া মানে আসলে আয়নায় নিজের দিকেই তাকিয়ে থাকা..." উদাস মুখে কথাগুলো বলেই জিভ কাটে অস্মিতা, আবার বোর করছে সে, "এঃ আপনার নামটাই তো জানা হয়নি। আমি অস্মিতা গোস্বামী। প্রফেশনাল বেকার।"

হৈমন্তী হাত বাড়িয়ে দেয়, "হৈমন্তী ঘোষ। একটা সার্ভে গ্রুপে কাজ করি। পুরনো হেরিটেজ বিল্ডিং দেখাশোনার কাজ মেইনলি!"

অস্মিতা হাঁ হয়ে যায়, "মানে?"

— "মানে এই ধরুন ভারতবর্ষে এত ছড়ানো-ছিটানো পুরনো বাড়ি আছে... সেগুলোর হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু আইডেন্টিফাই করি আমরা।"

ঠক করে কফির কাপ নামিয়ে রাখে অস্মিতা, "আর আপনার সঙ্গেই আলাপ হল আমার! হাউ এক্সট্রাওর্ডিনারি!"

হৈমন্তী মুখে কৌতূহল ফুটিয়ে তোলে, "কেন বলুন তো?"

— "আমার একটা এন্সেস্ট্রাল হোম আছে। একটা বাড়ি, বুঝলেন। সামথিং

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ভাসান বা পাষাণ কিছু একটা। আমি ছেলেবেলায় কয়েকবার গেছি, বড় হতে দীর্ঘদিন যাইনি। আপাতত ওখানে কেউ থাকে না।"

— "সে কী! পুরনো?"

— "পুরনো বলতে অলমোস্ট দেড়শো বছর!"

হাতের ব্যাগ থেকে একটা নোটবই বের করে টেবিলের উপরে রাখে হৈমন্তী, "আপনার কন্ট্যাক্ট নম্বরটা দিন প্লিজ!"

অস্মিতা থেমে যায়, "দিতে পারি, ইন ওয়ান কন্ডিশান।"

— "কী?"

— "এইসব আপনি আজ্ঞে চলবে না। আমি বছর দুয়েকের ছোট হব, তুই চলবে?"

মৃদু হাসে হৈমন্তী, "আচ্ছা বেশ। চলবে।"

অস্মিতার নম্বর আর ঠিকানা লিখে নেয় হৈমন্তী।

এ-সময়ে কফি-শপের ম্যানেজার এসে দাঁড়ায় ওদের টেবিলের ঠিক পাশে। কিছু একটা বলতে চাইছেন ভদ্রলোক, কিন্তু ইতস্তত করছেন। অস্মিতা তার দিকে মুখ তুলে বলে, "কিছু বলবেন?"

গদগদ মুখে ম্যানেজার বলেন, "একটা রিকোয়েস্ট আছে আসলে, যদি কিছু মনে না করেন..."

— "বলুন না..."

— "আমাদের একটি কাস্টমার আছে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। উনি রোজ মোটামুটি এইরকম সময়ে আমাদের দোকানের এই পার্টিকুলার চেয়ারে এসে বসেন।"

— "তাই নাকি! রোজ?"

— "আজ্ঞে হ্যাঁ। রোজ। একদিনও মিস করেননি।"

— "ইন্টারেস্টিং!" অস্মিতা অবাক হয়ে বলে।

ম্যানেজার আর একটু গদগদ গলায় বলে, "অন্য কেউ হলে আমরা এন্টারটেইন করতাম না কিন্তু উনি বলেই..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "বেশ তো," এবার হৈমন্তী বলে, "আমরা অন্য টেবিলে শিফট করে যাচ্ছি না হয়। নট আ বিগ ডিল।"

— "আরে নানা।" বাধা দেন ম্যানেজার, "আপনাদের উঠতে হবে না, আমি আর একটা চেয়ার এনে দিচ্ছি। উনি আপনাদের সঙ্গেই বসবেন। ভদ্রলোক খুব একটা কথাবার্তা বলেন না। আপনাদের যদি অসুবিধা না হয়..."

— "ওঃ শিওর। আপনি এখানেই বসতে বলুন ওনাকে..."

ম্যানেজার চলে যাওয়ার মিনিট দশেক পরে এক বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। ওদের দু'জনের দিকে একটা কৃতজ্ঞতার হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বসে পড়লেন বাড়তি চেয়ারে।

হৈমন্তী তাকিয়ে দেখল লোকটার সমস্ত মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, মাথায় চুলের কোনও চিহ্ন নেই। একটা নীল রঙের শার্ট আর ছিটের প্যান্ট পরেছেন বৃদ্ধ। হাতে একটা খয়েরি লাঠি। সেটা পায়ের উপরে হেলান দিয়ে রেখে দুটো কনুই টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর স্থির হয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে।

অস্মিতা তার দিকে চেয়ে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি রোজই আসেন এখানে?"

ভদ্রলোক মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ..."

— "কোনও কারণ আছে নিশ্চয়ই?" যেচে আগ্রহ দেখায় সে।

ভেবেছিল লোকটা চুপ করে থাকবে, তার বদলে অস্মিতার মুখের দিকে খয়েরি চোখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ, "অপেক্ষা করি একজনের। তার এখানে আসার কথা আছে।"

— "কার?" হৈমন্তী জিজ্ঞেস করে।

পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে কাঁপা-কাঁপা হাতে সেটা টেবিলের উপর রাখেন বৃদ্ধ। তারপর ভিতর থেকে একটা পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া ছবি বের করে বলেন, "আমার স্ত্রী... চারবছর আগে মারা গেছে। মৃত্যুর সময় আমাকে বলে গেছিল..." ভদ্রলোকের মুখ থেকে কথা হারিয়ে যায়।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "কী বলে গেছিল?"

— "রোজ এই সময়ে এই কফি-শপের ঠিক এই টেবিলে এসে বসতে।"

অস্মিতার মন'টা উদাস হয়ে গেছিল। হৈমন্তী মুখ নিচে নামিয়ে ঠিকানাটা দেখে নিচ্ছিল। ভাসানবাড়ি? ভারী অদ্ভুত নাম।

আচমকাই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যায়। বৃদ্ধের দুটো হাত টেবিল থেকে উঠে এসে আঁকড়ে ধরে হৈমন্তীর হাত দুটো। হৈমন্তী আঁতকে উঠে ফিরে তাকায় মানুষটার চোখের দিকে। এক আকাশ অবাক বিস্ময়ে যেন মানুষটা তাকিয়ে আছে হৈমন্তীর মুখে। মুখের প্রতিটা ক্ষুদ্রতম কণাকে পরম আগ্রহে লক্ষ্য করে চলেছেন। উষ্ণ হাতের স্পর্শ কিছুক্ষণের বিশ্রাম খুঁজছে ওর ঘামে ভিজে যাওয়া হাতের ভিতর। যেন কয়েক লক্ষ বছর ধরে সেইটুকুনি বিশ্রামের আশায় ছিল হাত দুটো।

— "এ কী! কী করছেন আপনি?" মৃদু চিৎকার করে অস্মিতা। ম্যানেজার ছুটে আসেন সেই ডাক শুনে।

দুটো মানুষ সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছে একে অপরের দিকে। মনে হয় তাদের ঘিরে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সময় জমাট মেঘের মতো ওদের আঁকড়ে ধরে থমকে গেছে। কণা, তরঙ্গ আর শক্তিতে ভাগ করা যায় না শরীরদুটোকে। সব কিছু গুলিয়ে গিয়ে জেগে আছে দুটো প্রাণ।

কয়েক সেকেন্ড পরে কয়েকটা অল্পবয়সী ছেলে এসে ছাড়িয়ে নেন বৃদ্ধের হাত দুটো। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ থেকে সম্মোহিত ভাবটা কেটে যায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকান ম্যানেজার আর হৈমন্তীর মুখের দিকে।

— "কী করছিলেন আপনি!" ম্যানেজার মৃদু তিরস্কার করেন।

— "আমি..." বৃদ্ধ উত্তর দিতে পারেন না, "আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?"

— "ঘুমাননি দাদু, তবে শুতে চাইছিলেন মনে হয়।" একটা ফচকে ছেলে পেছন থেকে রসিকতা ছুঁড়ে দেয়।

হৈমন্তী কিন্তু হাসতে পারে না। কী একটা যেন হয়ে গেছিল ওর মধ্যে, এই কফি-শপের ভিতরে বসে মনে হচ্ছিল একটা মস্তবড় অচেনা আকাশের

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বুকে শুয়ে আছে ও। বৃদ্ধের চোখ দুটো যেন তার দিকে চেয়ে আছে অন্য কোনও আকাশ থেকে। যেন এই অন্তহীন ইউনিভার্স মাতৃগর্ভের মতো ধারন করেছে ওকে। এ কেমন অদ্ভুত অনুভূতি!

— "তুই ঠিক আছিস তো?" অস্মিতা জিজ্ঞেস করে।

— "আমি..." উত্তর দিতে পারে না হৈমন্তী।

## ষোড়শ অধ্যায়

— "চিড়িয়াখানা!" ধড়ফড় করে উঠে বসল হৈমন্তী, "জু হাইপোথিসিস! সব মনে পড়েছে আমার..." বিছানার উপরে বসে হাঁপাতে থাকে হৈমন্তী। তার বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে।

নিবারণ মেঝেতে শুয়েছিল, তারও ঘুম ভেঙে গেছে। অবাক হয়ে বিছানার উপরে তাকিয়ে সে বলে, "চিড়িয়াখানা! কী বলছেন আপনি?"

— "অশ্বিনীকে জু হাইপোথিসিস মেনে চলতে হয়। তাই সে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। এমন কিছু করতে পারে না যাতে যা হবার ছিল তা হবে না..."

টেবিল থেকে জলের বোতল নিয়ে হৈমন্তীর দিকে এগিয়ে দেয় নিবারণ, এই ক'দিনে হৈমন্তীর শরীর আরও খারাপ হয়েছে। মুখের বেশ কয়েকটা জায়গার চামড়ায় লালচে ভাব এসেছে, এখানে আসার পর থেকে অন্তত দশ কেজি ওজন কমে গেছে তার। নাকের ডগাটা লেগে থাকা রক্তের মতো লাল হয়ে রয়েছে।

— "যোগাযোগ করে না কী বলছেন! আমরা তো..."

নিজের বুকে একটা হাত রেখে নিঃশ্বাসের গতি কমিয়ে আনার চেষ্টা করে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হৈমন্তী। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে তার। কয়েকটা সেকেন্ড সেইভাবে দম নিয়ে বলে, "আমি একটু নিচে যাচ্ছি। দরজাটা লাগিয়ে দিন।"

— "এই শরীরে আপনি সিঁড়ি দিয়ে..."

— "কিচ্ছু হবে না। একটু ধরুন আমাকে।"

নিবারণ আর বাক্যব্যয় না করে হৈমন্তীর একটা হাত কাঁধে নিয়ে তাকে এগিয়ে দেয় দরজা অবধি। তারপর ভিতর থেকে আটকে দেয় দরজাটা, হৈমন্তী কোনওরকমে দেওয়াল ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে। কয়েকবার পায়ের উপরে জোর হারায়। সবসময় একটা জ্বর-জ্বর ভাব, শরীর দুর্বল। মাথার ভিতর গুনগুন মৌমাছি ডেকে চলেছে একটানা।

আজ কিন্তু নিচে নামার আগেই সিঁড়িতে অশ্বিনীকে দেখতে পায় সে। হাতে কয়েকটা ওষুধ নিয়ে উপরে আসছিল। হৈমন্তীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

— "এ কী আপনি নিচে নামছেন কেন? ডাকতে পারতেন তো আমাকে..."

সিঁড়ি থেকে হাত তুলে অশ্বিনীর দুটো কাঁধে জোর দিয়ে দাঁড়ায় হৈমন্তী, "মাঝে-মাঝে আমি তোমার কাছে গেলাম না হয়..."

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ তোলে অশ্বিনী, একটা ট্যাবলেটের পাতা তুলে ধরে, "এইটা আপনার মাথার যন্ত্রণা হলে, আর বেশি একটু বাড়লে..."

— "আমার একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

— "বেশ। উপরে চলুন, বলছি।"

— "না, উপরে নয়।"

— "তাহলে?"

— "ওই ঝিলটার কাছে নিয়ে যাবে আবার?"

— "ওখানে!" অশ্বিনী অবাক হয়ে যায়, "এই শরীরে ওখানে যাবেন আপনি!"

— "আর কোনও শরীরেই যেতে পারব না। যতদিন শরীর আছে নিয়ে চল না হয়।"

মাথা নামিয়ে নেয় অশ্বিনী। হৈমন্তীর কবজিটা হাতে ধরে বলে, "বেশ,

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আসুন আমার সঙ্গে।"

আজ জোরালো হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। শুকনো বাস্পে বৃষ্টির কণামাত্র লেগে নেই। হৈমন্তীর একটা হাত অশ্বিনীর কাঁধের উপর দিয়ে ফেলা রয়েছে। কোনও রকমে হেঁটে শরীরটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সে, মাঝে মধ্যে থামছে। জোর নিশ্বাস নিচ্ছে, ঘোলাটে চোখে দেখে নিচ্ছে চারপাশ। মাটির উপরেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে তার। তাও প্রবল জেদে বারবার টেনে তুলছে নিজেকে। এখনও সে হাঁটতে পারে, যতদিন পারছে, এই ক্ষমতাটাকে লুটে পুটে নিতে চায়।

ঝিল অবধি কিন্তু পৌঁছাতে পারে না হৈমন্তী। তার আগেই মাটির উপরে বসে পড়ে সে। এখানে একটা ধান-জমির সীমানায় পানের বরজ করা আছে। সেই বরজের বেড়াতেই পিঠ দিয়ে সে শরীর এলিয়ে দেয়। পাশে জায়গাটাতে একটা চাপড় মেরে অশ্বিনীকে বসতে ইঙ্গিত করে।

— "আজ এখানেই বসুন একটু। কাল শরীর সুস্থ হলে ওখানে যাবেন।"

পাশাপাশি বসে থাকে দু'জনে। স্থবির মূর্তির মতো। হৈমন্তীর কাশির দমক ওঠে, ঠোঁটের কোল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। অশ্বিনী মুছে দেয়। হৈমন্তী আবার কাশতে কাশতে বলে, "আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব, তার সোজাসুজি উত্তর দেবে। কোনও কথার মারপ্যাঁচ নয়, কোনও গোপনীয়তা নয়, রাজি?"

— "যদি রাজি না হই কী করবেন?"

— "তাহলে আমি আর ভাসানবাড়িতে ফিরব না। সারারাত এখানে শুয়ে থাকব। সকাল হলে যেভাবেই হোক কলকাতা ফিরে যাব।"

— "কেন? কী আছে কলকাতায়?"

— "তা জানি না। কিন্তু তুমি নেই।"

মিহি হাসে অশ্বিনী, ঠোঁট উলটে বলে, আমি সব জায়গায় আছি হৈমন্তী দেবী। শুধু আপনি আমাকে দেখতে চান কি না সেটা আপনার ব্যাপার।"

তার গলায় একটা হাত রাখে হৈমন্তী, "উঁহু, প্রসঙ্গ পাল্টাবে না। আমার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে হবে তোমাকে।"

— "বেশ, দেবো, শুরু করুন।"

বুকে হাত রেখে আবার কাশি থামায় হৈমন্তী, "তুমি হাসতে-হাসতে মানুষ খুন করো, কিন্তু নিরামিশ খাও কেন?"

গম্ভীর মুখে উত্তর দেন অশ্বিনী, "আমার বেঁচে থাকতে খাবারের দরকার পড়ে না। আপনার আর গনশার সামনে কয়েকবার খেয়েছি যাতে আপনাদের অস্বস্তি না হয়। কেবলমাত্র খাওয়ার অভিনয় করছি। অযথা একটা প্রাণীর মৃত্যু আমি পছন্দ করি না।"

— "তুমি কী এলিয়েন?"

হাসিটা আবার ফিরে আসে অশ্বিনীর মুখে, দু'পাশে মাথা নাড়ায়, "না।"

— "মানে তুমি পৃথিবীতেই জন্মেছ?"

আবার মাথা নড়ে, "না।"

— "আবার কথার মারপ্যাঁচ। আমি কিন্তু বারণ করেছিলাম।"

— "আপনার প্রশ্নটা ভুল, আমি কোথাও জন্মাইনি। আমার জন্ম নেই।"

— "আচ্ছা বেশ, তুমি কি বাইরে থেকে পৃথিবীতে এসেছ?"

মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে অশ্বিনী, "কী মুশকিল, আপনার স্মৃতিশক্তি ভারী দুর্বল, বললাম যে আমি সব জায়গায় আছি। আমাকে কোথাও যেতে হয় না।"

হৈমন্তীকে অসহায় দেখায়। তার মুখের উপর কতগুলো বিজাতীয় রেখা খেলা করতে থাকে।

— "কী প্রশ্ন করবেন বুঝতে পারছেন না, তাই তো?" অশ্বিনী ব্যঙ্গ করে, "আমি একটু সাহায্য করি?"

— "করো..."

আচমকা হৈমন্তীর দিকে ঘুরে বসে অশ্বিনী, দু'গালে দুটো হাত রেখে সোজাসুজি তাকায় চোখের দিকে, "আপনি কে? আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনার জন্ম কোথায়?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "আমার জন্ম..." হৈমন্তী নিজের জন্মদিন মনে করার চেষ্টা করে। অশ্বিনী বাধা দেয়, "উঁহু, ওটা না। এই মহাজগতে সৃষ্টি একবারই হয়েছিল। আজ থেকে কয়েক লক্ষ কোটি বছর আগে। তারপর থেকে আর কিচ্ছু সৃষ্টি হয়নি। শুধু রুপ পালটেছে..."

— "কী বলছ তুমি আমি তো কিছুই..."

— "আর আপনার সমস্ত রূপে আপনাকে খুঁজে বেরিয়েছি আমি।"

অশ্বিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হৈমন্তীর মনে হয় তার চারপাশের পরিবেশ বদলে গেছে। গ্রামের মেঠো পথ আর ধানক্ষেত হারিয়ে গিয়ে ওদের পায়ের কাছে গোটা জমিটা প্লাবিত হয়ে গেছে জলে, অনন্ত জলরাশির মাঝে পা ডুবিয়ে বসে আছে ওরা দু'জনে। আর সেই জলের মধ্যে বিন্দু বিন্দু হয়ে ফুটে উঠছে কিছু আলোকোজ্জ্বল কণা। যেন তারাদের ছায়া পড়েছে জলে। ক্রমশ কেঁপে উঠছে তারাগুলো। একটু আগে অশ্বিনীর বলা কথাগুলো বেজে উঠছে হৈমন্তীর কানে — এই মহাজগতে সৃষ্টি একবারই হয়েছিল। আজ থেকে কয়েক লক্ষ কোটি বছর আগে। তারপর থেকে আর কিচ্ছু সৃষ্টি হয়নি। শুধু রূপ পালটেছে..."

শক্তি বদলে গেছে পদার্থে। পদার্থ থেকে আবার ফিরে গেছে শক্তিতে। সৃষ্টির শুরুতে সেই প্রথম কণা কোয়ার্ক। জলের উপরে ভেসে ওঠা বিন্দুগুলো ঠিক তেমনই কোনও কণা। হৈমন্তী অবাক হয়ে দেখল জল থেকে বাতাসে উঠে আসছে কণাগুলো। ক্রমশ একটা জায়গায় জমা হচ্ছে তারা। বিশেষ একটা রূপ ধারণ করছে। সে রূপ মানুষের নয়, পশুর নয়, গ্রহের নয়, নক্ষত্রপুঞ্জের নয়। সম্পূর্ণ অচেনা, তবু যেন কিছুর আকৃতি তৈরি করছে কণাগুলো। উজ্জ্বল রুপালি আলোয় জ্বলছে।

প্রাণ তৈরি হচ্ছে। জীবিত কিছু তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে... জলাভূমির উপর দিয়ে অস্থির হয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল সেই কণাগুলো। একবার ছুঁয়ে গেল হৈমন্তীর শরীরটাকে। চিনতে পারল কি?

হঠাৎ কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে ভেঙে ছড়িয়ে আলাদা হয়ে গেল কণাগুলো।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হাওয়ায় বয়ে গিয়ে জলের উপরে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল, আরও কয়েকটা কণা বয়ে যেতে লাগল জলের উপর দিয়ে। আবার ঝড় উঠল। রুপালি কণাগুলো কাছাকাছি এল কয়েকবার কিন্তু আগের মতো আকৃতি তৈরি করতে পারল না। ঝড় বাড়তে শুরু করেছে। কণাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে আরও দূরে।

— "অশ্বিনী..." হৈমন্তী অসহায়ভাবে ডেকে উঠল, "অশ্বিনী..."

— "আমি আছি আপনার সামনে।" শব্দটা কোথা থেকে ভেসে এল বুঝতে পারল না হৈমন্তী। সে বাতাস হাতড়াতে লাগল।

— "শরীরের মৃত্যু হলে শরীরের সমস্ত উপাদান ফিরে যায় প্রকৃতিতে। কালের নিয়মে ফিরে যাওয়া সেই উপাদানগুলো অস্থির হয়ে ছুটে বেড়াতে থাকে প্রকৃতির বুকে। কোনও কোনও কণা নতুন প্রাণ সৃষ্টি করে, সেই প্রাণেরও আবার মৃত্যু ঘটে, আবার তারা প্রকৃতিতে ফিরে আসে। যে কণাগুলো দিয়ে আপনার শরীর তৈরি সেগুলো আপনার মৃত্যুর পর প্রকৃতিতে মিশে যাবে। অঙ্কের হিসেবে সেই সমস্ত কণার আবার একসঙ্গে এসে প্রাণ সৃষ্টি করতে কয়েক লক্ষ কোটি বছর সময় লেগে যাবে।"

হৈমন্তীর মাথায় ঢোকে না ব্যাপারটা। সে ফ্যালফ্যাল করে দেখে মাঠের উপরে জমা হওয়া রুপালি কণাগুলো আবার একটা আকৃতি তৈরি করেছে। আবার চিনতে পারছে সে। হ্যাঁ, এবার একটা মানুষের ছায়া।

— "আজ থেকে কয়েক লক্ষ কোটি বছর আগে, মহাবিশ্বের জন্মলগ্নে আপনার শরীরের সমস্ত উপাদান একত্রে এসে প্রাণ সৃষ্টি করেছিল..."

— "এসব কী বলছ তুমি অশ্বিনী!"

— "এ মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টি হওয়া প্রাণ..."

— "তুমি কোথায়?"

— "এখানে থেকে কয়েক মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে... সমস্ত গ্যালাক্সি সৃষ্টির আগে, সদ্য চলতে শেখা মহাবিশ্বের বুকে চোখ মেলেছিলেন আপনি।"

— "কিন্তু কে সৃষ্টি করেছিল আমাকে?"

— "আমি..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হৈমন্তীর মনে হয় তার পায়ের তলায় জলের স্রোত বেড়ে উঠছে, ক্রমশ তাকে ডুবিয়ে নিয়ে যাবে সেই জল। এ কী অদ্ভুত মাদকতা গ্রাস করছে তাকে। বুক ছুঁয়ে ফেলছে জল। গলা বেয়ে উঠে আসছে, এক্ষুনি দম আটকে যাবে, মৃত্যু আসন্ন।

দু'হাতে জল সরাতে গিয়ে থেমে গেল হৈমন্তী। অশ্বিনীর দুটো হাত এসে চেপে ধরেছে তাকে। চোখ মেলে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে হাহাকারের মতো চিৎকার করে উঠল হৈমন্তী।

— "এটা... এটা কী দেখছিলাম আমি?"

— "যা জানতে চাইছিলেন..."

— "আমি... কয়েক লক্ষ কোটি বছর আগে..."

— "হ্যাঁ..." হৈমন্তীর কাঁধে একটা হাত রাখে অশ্বিনী।

— "কিন্তু এই বাড়িতে কী করে এলে তুমি? কে আনল তোমাকে? এমন কী আছে ওই বাড়িতে?"

হৈমন্তীর মুখের উপরে এবার ঝুঁকে পড়ে অশ্বিনী, "সেটা জানতেই তো এখানে আসা আপনার, তাই না?"

— "আর কিছু জানতে চাই না আমি। শুধু তোমার কথা জানতে চাই। কেন এভাবে জড়িয়ে রাখো আমাকে?"

আকাশের বুকে এখনও জেগে আছে কালপুরুষ। তার দিকে আঙুল তুলে দেখায় অশ্বিনী, তারপর বলে, "আমার আঙুলের সোজা তাকান। ওই যেখানে কালপুরুষের ধনুকটা শেষ হয়েছে তার ঠিক পাশ দিয়ে কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষ গেলে একটা ভারী সুন্দর জায়গায় এসে পড়বেন আপনি, জানেন? মানুষ কোওনদিন যেতে পারবে না ওখানে, জানতেও পারবে না জায়গাটার কথা। কালো আকাশের বুকে ধূমকেতুর লেজের মতো এক ধরনের উজ্জ্বল আলোর কণা দেখতে পাওয়া যায় ওখানে, মাঝে মাঝে তারাখসা উল্কা এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় আলোর চাদরটাকে। তারাগুলো এত ঘন হয়ে আছে যে মনে হয় চোখের সামনে বিন্দুবিন্দু সোনা দিয়ে বানানো একটা পর্দা ঝুলিয়ে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



দিয়েছে। ওখানে একদিন আপনি আর আমি শুয়েছিলাম..."

— "তারপর?"

— "গোটা মহাবিশ্বের কোথাও কেউ ছিল না তখন। ওইটুকুনি জায়গা ছাড়া আর কোথাও কোনও আলো ছিল না।"

— "ডার্ক এজ!" হৈমন্তী বিড়বিড় করে বলে, "তারপর? কী হল তারপর?"

— "তারপর..." অশ্বিনীর কণ্ঠ হারিয়ে যায়, "তারপর সময় এল। সে আমাকে ছুঁতে পারে না। সময় সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই তো আমি ছিলাম। কিন্তু আপনাকে তো আমি সৃষ্টি করেছি। তাই আপনাকে রূপ বদল করতে হবে, করতেই হবে... একদিন... একদিন আপনি হারিয়ে গেলেন... সোনালি ধুলোর মতো মিশে গেলেন মহাশূন্যে। আমি আপনাকে ধরে রাখতে পারলাম না।"

— "তারপর?"

— "তারপর আবার সময় এল। সময় ভারী মজার জানেন। সে জীব, জড় সব কিছুকে রূপ বদল করতে বাধ্য করে, কিন্তু একদিন তার নতুন রূপের ভাঁড়ারও শেষ হয়ে যায়। তখন আবার প্রথম থেকে শুরু করে সে, এই যেমন আপনি ফিরে এলেন..."

অশ্বিনীর মুখের দিকে তাকায় হৈমন্তী। তারপর আচমকায় রুগ্ন হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে, "কেমন ছিলাম আমি? এত বছর আগে কেমন দেখতে ছিল আমাকে?"

অশ্বিনী হাসে, "আসলে তখন খুব অন্ধকার ছিল তো, দেখতে পাইনি আপনাকে। এত বছরে এই প্রথম দেখছি আমি। তবে স্পর্শ করেছিলাম, জানেন... আজকের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য নেই..."

— "আমার এই শরীরটাও তো শেষ হয়ে যাচ্ছে অশ্বিনী, সময় এসে আবার ডেকে নিয়ে চলে যাবে আমাকে।" হৈমন্তী ফুঁপিয়ে ওঠে।

— "আপনি চিন্তা করছেন কেন? রূপ বদলাতে-বদলাতে আজ থেকে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আরও কয়েক লক্ষ কোটি বছর পরে, কয়েক বিলিয়ন ইউনিভার্সের ভাঙা গড়ার পর আপনাকেই ফিরিয়ে দেবে সে..."

— "ততদিন কী করবে তুমি?"

— "আমি অপেক্ষা করব!"

হৈমন্তীর মনে পড়ে যায় সে যখন প্রথম ভাসানবাড়িতে আসে, অশ্বিনী দেখা হওয়ার পর বলে, "আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম কখন থেকে..." সে অপেক্ষাটা ঠিক কত বড় তা ধারণা করতে পারেনি সে।

— "তুমি তো এত কিছু পারো, আমার শরীরটাকে ঠিক করে দিতে পারো না? যাতে আরও কয়েকটা বছর দেখতে পাই তোমাকে।"

— "আপনার শরীরে তো ভুল নেই কিছু। কেবল রূপ বদলাচ্ছে..."

— "আচ্ছা বেশ, তাহলে অন্য একটা কাজ বলি, যেটা তুমি পারবে?"

— "বলুন।"

— "আমি যখন হাঁটতে পারব না তখন রোজ কোলে করে ওই ডোবাটার কাছে নিয়ে আসবে আমাকে?"

— "উঁহু, কোলে করে নয়... অন্য একটা উপায় আছে..."

কথাটা বলে আর হৈমন্তীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার একটা হাত শক্ত করে ধরে বুকে টেনে নেয় তাকে। পরমুহূর্তে দুজনের শরীর মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে উঠে আসে। হাওয়ার গতি আগের থেকে আরও কিছুটা বেড়ে যায়। হৈমন্তী দেখে প্রায় দোতলা বাড়ির সমান উচ্চতায় উঠে শূন্যে ভেসে আছে ওদের শরীর দুটো। গোটা গ্রাম চোখে পড়ছে এখান থেকে।

— "এই পাগল! নামাও আমাকে..." ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে হৈমন্তী।

— "কেন? ভয় লাগে আপনার?"

— "খুব... এর আগে কোনওদিন এত উপরে উঠিনি।"

— "উঠেছেন, এর থেকে অনেক বেশি উঁচুতে, অনেকবার।"

দু'হাতে অশ্বিনীর গলা জড়িয়ে ধরে হৈমন্তী। সত্যি আজ পৃথিবীর মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে ও। এইডসের থেকে, সুমিতের থেকে,

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



মা-বাবা-বোনের থেকে...

ওর গোটা মুখ জুড়ে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। গলা ছেড়ে একটা চিৎকার করে উঠল। তারপর মুখ নেমে এল নিচের দিকে। ওর ঠোঁটের ঠিক সামনে অশ্বিনীর কপাল। সেখান ঠোঁট ছোঁয়াল হৈমন্তী।

একটু দূরে ভাসানবাড়ি দেখা যাচ্ছে, চারপাশ ঘিরে মিহি জঙ্গল, অশ্বিনীর সেই ঝিল, ঝিলের মাঝে উঁচু হয়ে থাকা মাটির স্তূপ, আকাশের বুকে আধভাঙা চাঁদটা— তাকিয়ে রইল শূন্যে ভাসমান দুটো মানুষের দিকে।

একদলা রক্ত কাশির দমকে বেরিয়ে এসে ছেয়ে গেল অশ্বিনীর কপালে, মুখটা ভরে গেল তার। হৈমন্তীর মনে হল আবার ফিরে এসেছে শ্বাসকষ্টটা, সে অসহায়ের মতো হাঁপাতে লাগল।

মাটিতে নেমে আসতে হাঁপানি কিছুটা কমে এল হৈমন্তীর। জামার হাতা দিয়ে অশ্বিনীর মুখ থেকে লাল রঙটা মুছে দিল সে।

— "আচ্ছা ওই বুড়ো লোকটা যে আমার হাত চেপে ধরেছিল, সেটা তুমিই ছিলে, তাই না?"

— "হ্যাঁ..."

— "আর ওনার স্ত্রী মৃত্যুর আগে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো তোমারই কথা, তাই না?"

— "হ্যাঁ..." অশ্বিনী লাজুক হাসে।

— "খামোকা অপেক্ষা করাতে মানুষটাকে।"

— "উঁহু, অপেক্ষা জিনিসটা এই পৃথিবীতে হাঁটার মতো। যতক্ষণ আপনি হাঁটবেন মনে হবে পৃথিবীটা একদম সমতল, ফ্ল্যাট। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে একদিন যখন আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরে আসবেন সেদিন বুঝবেন পৃথিবীটা আসলে গোল। যার জন্য অপেক্ষা করছেন সে যতদিন না আগের রূপে ফিরে আসছে ততদিন মনেই হবে না সে কোনওদিন ফিরবে বলে..."

কিছুক্ষণের জন্যে উদাস হয়ে যায় হৈমন্তী, তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, "তুমি

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আয়নায় কী দেখো বলতো?"

— "আপনাকে, আপনার জীবনের সমস্ত মুহূর্ত। বারবার দেখি, দেখতে ভালো লাগে আমার।"

— "এত আমাকে দেখার শখ যখন তখন এবার থেকে নিচে তোমার ঘরেই থাকব আমি..."

হঠাৎ অশ্বিনীর খুব কাছে চলে আসে হৈমন্তী। একটু সরে বসে অশ্বিনী। হৈমন্তী হেসে বলে, "কী হল? সরে গেলে যে..."

— "নাঃ মানে..." আগে কারও এত কাছে আসিনি আমি।"

ফিসফিস করে বলে হৈমন্তী, "এসেছ । এই জীবনে, এর থেকে অনেক বেশি কাছে..."

## সপ্তদশ অধ্যায়

— গল্পের বইটা বুকের উপরে ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল হৈমন্তী। সকালের রোদ অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে মুখটা ঘিরে। আজকাল ওর সহজে ঘুম ভাঙতে চায় না। কখনও চোখ খোলে, আবার নিজে থেকে বুজে আসে। শরীর শেষ হয়ে আসছে বলে কি ঘুম বেড়েছে? নাকি এই ক'দিন আগের থেকে মন'টা ভালো আছে হৈমন্তীর?

মন খারাপের নানারকম কারণ হয় না। একটাই হয়—আমরা যে জিনিসটাকে চিরকালীন সত্যি ভেবে এসেছি সেটা হুট করে একদিন মিথ্যে প্রমাণিত হলে। বেঁচে থাকতে মানুষ নিজেকে অবিনশ্বর ভাবে। রোজ কালকের প্ল্যান গোছাতে গোছাতে শুতে যায়। তারপর একদিন হুট করে মৃত্যু এসে ধাক্কা দিয়ে তার অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গেলে মেনে নিতে পারে না। যাদের বারবার এভাবে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বিশ্বাস ভেঙে যেতে থাকে তারা ভারী বেপরোয়া হয়ে খাঁটি কিছু খোঁজার চেষ্টা করে, এমন কিছু যা সাজানো নয়, কৃত্রিম নয়। যতক্ষণ সেটা না খুঁজে পাচ্ছে ততক্ষণ তার ভিতরে একটা হাহাকার চলতে থাকে।

ভাসানবাড়িতে এসে থেকে অবাস্তব সব ঘটনা ঘটে চলেছে হৈমন্তীর সঙ্গে, অথচ সেই অবাস্তবের কোথাও কোনও ভেজাল নেই, নকল নেই।

কলকাতায় থাকতে এমন একটা জিনিসই খুঁজে পেয়েছিল হৈমন্তী। জন ডেনভারের গান। এখন একটু দূরে খোলা ল্যাপটপ থেকে সেই গানই ভেসে আসছে। বই রেখে সেটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে হৈমন্তী।

All of her days have gone soft and cloudy
All of her dreams have gone dry
All of her nights have gone sad and shady
She's getting ready to fly..."

এতক্ষণ তার মুখে আলো পড়তে ঘুম ভাঙেনি। এখন আচমকা মুখ থেকে রোদ সরে গিয়ে ছায়া পড়তে ঘুমটা ভেঙে গেল হৈমন্তীর। চোখ খুলেই সে দেখতে পেল সামনে গনশা এসে দাঁড়িয়েছে। বিকেলের দিকে ছাদে এসে ঘুরঘুর করে গনশা। কখনও ঘুড়ি ওড়ায়। আজ কিন্তু হাতে লাটাই দেখা গেল না। তার দিকে চেয়ে হাতের বইটা বন্ধ করতে করতে হৈমন্তী বলল, "কী জোনসবাবু? হাতে বন্দুক ছাড়াই এনিমি টেরিটরিতে!"

হৈমন্তীর কোলের উপরে রাখা বইটার দিকে ইশারা করে দেখায় গনশা, "কীসের বই ওটা?"

— "এটা?" হৈমন্তী বইটা তুলে ধরে, "গল্পেরও বলতে পারিস আবার পড়ারও বলতে পারিস। তুই কীভাবে পড়ছিস তার উপর নির্ভর করছে।"

বইটা ভালো করে দেখতে থাকে গনশা। প্রচ্ছদের ছবিটা চোখ টানছে তার। সেখানে আঙুল রেখে বলে, "এটা পিরামিড! আমি চিনি।"

— "হুঁ তবে যে সে পিরামিড নয়। দ্য গ্রেট পিরামিড অফ গিজা। বিজ্ঞানীরা বলে তৈরি হতে কুড়ি বছর সময় লেগেছিল!"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "মাত্র!"

— "ইয়েস। গোটা পৃথিবীর মানুষ তখনও জন্তু-জানোয়ারের ছাল পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সময়ে মাত্র কুড়ি বছরে পাথরের ব্লক একটার উপর একটা চাপিয়ে এইটা তৈরি করেছিল ইজিপ্টের কারিগররা। মোট ক'টা ব্লক আছে আন্দাজ কর।"

পিরামিডটা ভালো করে খেয়াল করে গনশা বলে, "দশ হাজার!"

— "না হে, তেইশ লক্ষ। যার প্রত্যেকটা ব্লকের ওজন ছিল একটা গাড়ির সমান। আটশো কিলোমিটার দূরে আসওয়ান নামের একটা জায়গা থেকে ওদের কেটে আনতে হত ব্লকগুলো। তারপর সমান করে কাটো, একটার মাপ একটু এদিক ওদিক হলেই হুরমুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। ভাব, তখন তো ভেঙে পড়েইনি, তিন হাজার বছর পরেও আস্ত টিকে আছে। কী করে করল বলতো?"

গনশা হাঁ হয়ে থাকে। উত্তর দেয় না।

— "তার উপরে এরা নাকি আবার চাকার ব্যবহার জানত না। সম্বল বলতে কেবল ছেনি আর হাতুড়ি!"

— "কী করে করল গো?" এবার গনশা জিজ্ঞেস করে।

— "বলছি, তার আগে শোন্। এই কাজটা যদি আজকের লোক আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে করতে যায় তাহলে কতদিন লাগবে..."

— "কতদিন লাগবে?"

— "আমাদের সব থেকে অ্যাডভান্সড যন্ত্রপাতি হাতে সব থেকে বুদ্ধিমান ইঞ্জিনিয়ারদের গিজার পিরামিডের অবিকল একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে সময় লাগবে দেড়শো বছর।"

গনশার হাঁ এবার আর একটু বড় হয়, "ওরা তাহলে এত কম সময়ে করল কী করে?"

হৈমন্তী হাসে, "তোর অশ্বিনীদাদাকে জিজ্ঞেস কর। একেবারে আই উইটনেসের সাক্ষ্য পেয়ে যাবি মনে হয়।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "নাঃ। তুমি বলো।"

গনশার পিঠে হাত রাখে হৈমন্তী, "কী করে বলব বল? আমার কাছে তো আন্দাজ করা ছাড়া উপায় নেই। তবে কী মনে হয় জানিস? আমাদের কাছে নানারকম যন্ত্র আছে বটে, কিন্তু পিরামিডের কারিগরদের কাছে এমন একটা যন্ত্র ছিল যেটা আমাদের নেই।"

— "কী যন্ত্র?"

— "যে যন্ত্রটা এই বাড়িতে আছে। ওই যন্ত্রটা দিয়ে সময়কে মন্থর করে দেওয়া যায়। মানে ধর তোর এখান থেকে বাড়ি যেতে আধঘণ্টা লাগে। এখন আমি যন্ত্রটা ব্যবহার করে সময়কে কচ্ছপ করে দিলাম। আধঘণ্টা হয়ে গেল দুঘণ্টা। তুইও তাহলে ওই আধঘণ্টায় চারবার বাড়ি যাওয়া আসা করতে পারবি। ইজিপ্সীওরা হয়তো এভাবেই এত কম সময়ে শেষ করেছিল কাজটা..."

— "হ, আর মুরারিমোহন?" এ প্রশ্নটা এসেছে পিছন থেকে। হৈমন্তী ঘুরে তাকিয়ে দেখে নিতাইচরণ এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। এতক্ষণ মনে হয় কান পেতে হৈমন্তীর কথা শুনছিল। হৈমন্তী মুখ সামনে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "মুরারিমোহনের যন্ত্রটাও সে কাজটা করতে পারত।"

— "তাইলে গরমেন্টকে জানাইল না ক্যান? একখান ডিসকভারী হইত। কী কও ভাতিজা?" গনশার পাশের মেঝেতে এসে বসে পড়ে নিতাই।

— "জানাতে পারত। কিন্তু তার আগে মুরারিমোহন অন্য একটা পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিল মনে হয়।"

— "কী পরীক্ষা?"

ভাবুক গলায় পরের কথাগুলো বলে হৈমন্তী, "যন্ত্রটাকে দিয়ে উলটো কাজটা করানো যায় কিনা, মানে সময়কে স্লো-এর সঙ্গে সঙ্গে ফাস্টও করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এবং সম্ভবত সফলও হয়েছিলেন। সেই জন্যেই আপনি নির্ধারিত সময়ের কয়েক বছর আগে হ্যালির ধূমকেতু দেখতে পেয়েছিলেন।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "তা ক্যামনে হয়? সময় যদি দ্রুত চলে তাহলে আমিও তো দ্রুত চলব।"

— "তার কোনও মানে নেই। এই গোটা মহাবিশ্ব জুড়ে সময় এক নয়। এ বাড়িতে যে যন্ত্রটা আছে সেটার একটা রেঞ্জ আছে। সেই রেঞ্জের মধ্যে যা কিছু থাকে তাদের সময়ের হেরফের ঘটাতে পারে যন্ত্রটা। সেজন্যই একমাত্র এ বাড়ি থেকেই অন্য আকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রাম থেকে নয়।"

রোদ থেকে একটু সরে বসেছে নিতাই। তার মুখের উপরে ছায়া নেমেছে এখন। সে মাথার পিছনে একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, "কিন্তু জিনিসটা আছে কই?"

— "সেটাই তো প্রশ্ন..." গালে হাত দিয়ে বসে থাকে হৈমন্তী। এই প্রশ্নটা অশ্বিনীকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। করলে সে উত্তর দেবে কিনা জানে না হৈমন্তী, কিন্তু তার মনে হতে পারে হৈমন্তী এখনও জিনিসটা উদ্ধার করার কথাই ভাবছে। এই ভয়ে এখনও জিজ্ঞেস করে উঠতে পারেনি।

একটা বিড়ি ধরায় নিতাই, "ছাড়ান দেন। ওঃ জিনিস আর পাওয়া যাইব না। আদৌ আসে কিনা... তাসাড়া আপনার সরিলটা ভালো নাই..."

হৈমন্তী মিহি হেসে গনশার দিকে তাকায়, "আমার দৌড়ঝাঁপ করার শক্তি নেই বটে, কিন্তু আমার জোনসবাবু আছে। আমার হয়ে ওই খুঁজে বের করবে। আচ্ছা, তুই একদিন বলছিলি জঙ্গলের ভিতর থেকে তুই কীসব শব্দ শুনেছিস, এ বাড়ির কোথাও শুনিসনি?"

গনশা দু'দিকে মাথা দোলায়।

হৈমন্তীর কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ে, "যন্ত্রটা ইন-একটিভ হয়ে পড়ে আছে সন্দেহ নেই। মুরারিমোহন কোথায় রেখে যেতে পারেন সেটা?"

— "মাটির তলায়?"

— "না নিতাইকাকা। তিনি যন্ত্রটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। খুব গোপন কোনও জায়গায় লুকিয়ে রাখলে বারবার সেটা টেনে বের করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে নিজেরই অসুবিধা হবে। জিনিসটা অত গভীর কোথাও নেই। সম্ভবত

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আমাদের চোখের সামনেই আছে। কোথাও কেমোফ্ল্যাজ করে..."

— "ডাইরিতে কিসু নাই?"

— "থাকলেও আমি তো বুঝতে পারিনি।"

পাশ থেকে ল্যাপটপ তুলে নেয় হৈমন্তী। এন্টিকাইথেরা মেকানিজমের ছবিটা খুলে আবার চোখ বোলাতে থাকে। এ বাড়িতে আসার পর বাড়ির নানা জায়গার বেশ কিছু ছবি তুলেছিল। সেগুলো পরপর দেখতে থাকে, কোথাও নোনা ধরা দেওয়াল, কোথাও ভাঙা কড়িকাঠ, কোথাও স্রেফ ঝুলে থাকা আসবাবপত্র। নাঃ, এর মধ্যে কোথাও থাকতে পারে না এত বড় একটা যন্ত্র।

ল্যাপটপ বন্ধ করে গনশার পিঠে হাত রাখে হৈমন্তী, "আমাকে একটু ধর তো বাবা। বাড়িটা একটু ঘুরে দেখতে হবে।"

— "ঘুইরা দেখবেন! কন কী!" নিতাই চোখ গোলগোল করে বলে, "শরীরের কন্ডিশন দেকসেন?"

— "তা বললে হয় নিতাইদা? যন্ত্রটা একবার হাতে পেলে আমি কী করতে পারি জানেন?"

— "কী?"

হৈমন্তী কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, থমকে যায়, বলে, "কী করতে পারি বলুন তো? টাকাপয়সা পেয়ে ফুর্তি করব সে উপায়ও তো নেই। তাও কিছু একটা বড়সড় কাজ করে যেতে ইচ্ছা করছে, জানেন? আমি মারা যাওয়ার অনেক বছর পর অবধি যাতে লোকে হৈমন্তী ঘোষকে মনে রাখে।"

— "আমি মনে রাখব তোমাকে।" গনশা হৈমন্তীর একটা হাত কাঁধে নিতে নিতে বলে।

— "তুই ব্যাটাচ্ছেলে আবার কী মনে রাখবি?" হাত বাড়িয়ে গনশার গাল টিপে দেয় হৈমন্তী। তারপর ছাদের সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলে, "শোন্ ব্যাটা, আমাকে মনে রাখাটা অত দরকারি নয়। সারাজীবনে এত এলিবেলিকে মনে রাখতে গেলে মাথার কলসি উলটে যাবে। তখন আর

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আসল জিনিসটা মনে থাকবে না...”

— “আসল জিনিস কী?”

— “ওঃ! জানিস না?” দেওয়ালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হৈমন্তী। কয়েক পা হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে গেছে সে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলে, “এই গ্রামে থাকতে তোর ভালো লাগে না, তাই না?”

গনশা অধবদনে মাথা দোলায়। হৈমন্তী হাসে, “আমারও কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না আর। অথচ ভাগ্যের পরিহাস দেখ, তুই জন্মেছিস এখানে, আর আমি ওখানে। একটা ব্যবস্থা করা যাক, কী বল?”

— “কী?” গনশা অবাক চোখে চায়।

ট্রাউজারের পকেট থেকে কিছু একটা হাতড়ে বের করে আনে হৈমন্তী। গনশা চেয়ে দেখে একটা চাবির রিং ধরা আছে তার হাতে। সেটা থেকে তিনটে লম্বা চাবি ঝুলছে, “আজ থেকে এটা তোর।”

গনশা হাত দিয়ে স্পর্শ করে রিংটা, “কীসের চাবি?”

— “আমার কলকাতার ফ্ল্যাটের।”

— “তাহলে আমাকে চাবি দিচ্ছ কেন?”

— “আরে বাবা এতদিন আমার ছিল। আজ থেকে তোর। তবে শুধু চাবিটা দিয়ে হবে না। আরও কাজ আছে।” একটু ভেবে হৈমন্তী বলে, “এক কাজ করিস, কাল তোর কাকাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।”

গনশা এতটাই হতবাক হয়ে গেছে যে তার মুখে আর কথা ফোটে না। দু-একবার সংকোচ করে চাবির রিংটা হাতে নেয় সে। ঠান্ডা ধাতব স্পর্শে তার হাতটা কেঁপে ওঠে। যেন চাবিটা ওর হাতে আসতে আপত্তি করছে নিজেদের ভাষায়। শক্ত করে চাবিটা চেপে ধরে।

কসরত করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে হৈমন্তী, তার পা কেঁপে যাচ্ছে বারবার। একটা হাত দিয়ে ধরে রেখেছে সিঁড়ির রেলিং। খোলা চুলগুলো মুখের সামনে এসে পড়ছে, অন্য হাতটা গনশার কাঁধ থেকে সরিয়ে সেগুলো ঠিক করে নিচ্ছে বারবার।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



একধাপ সিঁড়ি নেমে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে পড়ল হৈমন্তী। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এই বাড়ি জিনিসটা, বুঝলি, ভারী অদ্ভুত।"

— "অদ্ভুত কেন?"

— "অদ্ভুত নয়? আমরা ভাবি বাড়ি বানাতে ইট, সিমেন্ট, রড এইসব লাগে, এদিকে বাড়ি কিন্তু আসলে তৈরি হয় মানুষ দিয়ে। মানুষের থাকা দিয়ে। তোর বাড়ির সব লোক যদি তোকে একা রেখে কোথাও বেড়াতে যায়। তখন মনে হয় না অন্য একটা বাড়িতে এসে আছি?"

— "হ্যাঁ, ভয় লাগে খুব।"

হাঁটু গেড়ে গনশার সামনে বসে পড়ে হৈমন্তী, দু গালে দুটো হাতে রেখে বলে, "একদিন আমি, তোর অশ্বিনীদাদা, নিবারণকাকা, নিতাইকাকা সবাই এই ভাসানবাড়িটাকে ফাঁকা করে দিয়ে চলে যাব। শহর থেকে অন্য লোক এসে ভেঙে ফেলবে বাড়িটাকে। তখন কষ্ট হবে তোর?"

গনশার ঠোঁট ফুলে ওঠে। চোখ ছল্‌ছল্‌ করে, তার মাথায় একটা আলতো চাপড় মারে হৈমন্তী, "আরে গাধা, কাঁদছিস কেন? বললাম না বাড়ি তৈরি হয় মানুষ দিয়ে। এই বাড়িটা ভেঙে ফেললে তুই বাবা-মাকে নিয়ে কলকাতায় আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবি। দেখবি ওখানে আমার অনেক চিহ্ন পড়ে আছে। কত্ত ছবি, আমার ছোট থেকে বড় হওয়ার। আমার স্কুল কলেজের বই, রাফখাতা, আঁকার খাতা, ফটো অ্যালবাম... সিগারেটের বাক্সগুলো সোজা ফেলে দিবি, ঠিক আছে?"

গনশা উপরে-নিচে মাথা নাড়ে।

— "আর একটা কাজ করতে পারবি?"

— "কী?"

— "ফোটো অ্যালবামে দেখবি আমার আর বোনের একসঙ্গে ছবি আছে। ওই ছবিগুলো ওকে দিয়ে আসবি। আর বলবি, ওর দিদি ভালো আছে। সত্যি খুব ভালো আছে।"

আবার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় হৈমন্তী, "বুঝলি গনশা, ইজিপ্টের

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



রাজাগজারা মরে গেলে পিরামিডগুলোর তলায় রাজার দেহের সঙ্গে তার সব ব্যবহারের জিনিসপত্র রেখে দেওয়া হত। ওরা বিশ্বাস করত মারা যাওয়ার পরে যখন মানুষের দ্বিতীয় জীবন শুরু হয় তখন কাজে লাগে ওইগুলো।"

— "দ্বিতীয় জীবন!"

— "ইয়েস, আর আমি আমার দ্বিতীয় জীবন'টা রেখে যাব তোর জন্য..."

দোতলার প্যাসেজে এসে পড়েছিল দু'জনে। হৈমন্তী পায়ে জোর এনে ভালো করে ঘুরে দেখার চেষ্টা করল ছাদের দেওয়ালগুলো। জিনিসটা মুরারিমোহনের আমলে যেখানে থাকত এখন সম্ভবত সেখানে নেই। মারা যাওয়ার আগে মুরারিমোহন নিজেই হয়তো নিরাপদ কোনও জায়গায় সরিয়ে রেখেছিলেন সেটা। কিন্তু আগে যেখানে ছিল সে জায়গাটা খুব একটা গোপন হওয়ার কথা নয়।

একতলা? দোতলা? নাকি ছাদ?

ছাদ নয়। সেক্ষেত্রে জিনিসটা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ক্ষয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। একতলায় নয়, কারণ রোজ রাতে দু ধাপ সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে সেটা ছাদে নিয়ে যাওয়া মুরারিমোহনের একার পক্ষে কষ্টকর।

মানে জিনিসটা দোতলাতেই থাকত একসময়। কোথায়?

হঠাৎ কী মনে পড়তে গনশার দিকে চায় হৈমন্তী, "এক কাজ কর। আমার ঘরে টেবিলে একটা পুরনো ছবি আছে। ওটা নিয়ে আয়।"

গনশা ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে ছবিটা। ক'দিন আগে নিবারণের ঘর থেকে এই ছবিটাই পেয়েছিল হৈমন্তী। এবার সেটাকে আলোর তলায় মেলে ধরে সে। আজ থেকে প্রায় একশো তিরিশ বছর আগের ভাসানবাড়ি দেখা যাচ্ছে তাতে। মুরারিমোহন হয়তো তখনও বেঁচে আছেন। মানে, ছবির সময়ে যন্ত্রটা দোতলাতেই ছিল।

অবশ্য ছবিটা বাড়ির সামনে থেকে তোলা। সেখান থেকে ভিতরের কিছুই প্রায় বোঝা সম্ভব নয়। তাও হৈমন্তী ভালো করে দেখতে থাকে ছবিটা।

আচমকা ছবির একেবারে ডানদিকের কোণে চোখ আটকে যায় তার।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ছবিতে পুরো বাড়িটা আসেনি। ডানদিকের কিছুটা অংশ ছবির বাইরে রয়ে গেছে। ছবির সেইদিকের ধার বরাবর দেওয়ালের উপর কালো রঙের চৌকো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ভালো করে তাকালে বোঝা যায় একটা জানলা। খোলা জানলা। ছবিটা সাদাকালো বলে কালো বাক্স মনে হচ্ছে।

বাঁদিকের ঘরটার দিকে হাত দেখায় হৈমন্তী, "এই ঘরটা, কিন্তু ওইখানে তো কোনও জানলা নেই। মানে কেউ বুজিয়ে দিয়েছে জানলাটা..."

আরও ভালো করে সেই অন্ধকার জানলায় চোখ রাখে হৈমন্তী। জানলার পিছনের দেওয়ালে খুব ঝাপসা হলেও বোঝা যায়, একটা ছোট আংটা লাগানো আছে। অর্থাৎ দরজা বা আলমারি।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরটায় ঢুকে আসে হৈমন্তী। আংটাটা নেই। কোন দরজা বা আলমারি জাতীয় প্রায় কিছুই নেই। কেবল একটা পাঁচফুট লম্বা ও একফুট গভীর খোপ করা আছে সেখানে। খোপটা খালি।

এগিয়ে এসে সেইখানের দেওয়ালে হাত রাখে হৈমন্তী। বিড়বিড় করে বলে, "আজ থেকে দেড়শ বছর আগে এই খোপের সামনে একটা কাঠের দরজা লাগানো ছিল। সেই দরজার ভিতরে রাখা থাকত প্রাচীন পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত রহস্যের চাবিকাঠি।"

মিনিটখানেক সেইখানে বসে থেকে উঠে পড়ে হৈমন্তী, "কিন্তু এখন কোথায় আছে?"

গনশা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভিতরে। তার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করে, "এ বাড়িতে এমন কোনও দরজা আছে যেটা খোলা হয় না?"

— "না তো..."

হৈমন্তী বিমর্ষ হয়। ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে বলে, "তাহলে এরকম কোনও খোপ আর কোথাও দেখেছিস?"

একবার ভেবে নেয় গনশা। তারপর সজোরে মাথা নাড়ায় দুদিকে। কিছু একটা মনে পড়ে হৈমন্তীর সে থেমে গিয়ে বলে, "কাগজে সেদিন চিহ্নটা

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



দেখে তুই বলেছিলি ওটা এ বাড়িতে আগেও কোথাও দেখেছিস। কোথায় দেখেছিল মনে পড়ছে না?"

এবার আরও জোরদার চেষ্টা করে গনশা। কিন্তু এবারও হতাশ হয়, "না দিদি, মনে পড়ছে না। অনেকদিন আগে..."

হৈমন্তীর মন বলে চিহ্নটা গনশা যেখানে দেখেছিল সেখানেই সম্ভবত লুকানো আছে যন্ত্রটা। গনশার উচ্চতা সাড়ে চারফুট। অর্থাৎ জিনিসটা মাটির কাছাকাছিই আছে। উপরের দিকে নেই।

— "কোথায় দেখেছিলাম মনে নেই দিদি। কিন্তু কেন দেখেছিলাম মনে পড়ছে।" গনশা ভুরু কুচকে বলে।

— "কেন?"

— "সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। নিবারণকাকা বাজারে গেছিল। কাকা না থাকলে আমাকে এ বাড়িতে আসতে মানা করেছিল। কিন্তু আমি সেদিন ছাদে এসেছিলাম। এমন সময় দেখি কাকা বাড়ি ঢুকছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে লুকিয়ে পড়েছিলাম... তখনই ওটা..."

— "কোথায় লুকিয়েছিলি?"

— "সেটা মনে পড়ছে না দিদি।"

হৈমন্তীর মুখে আবার ছায়া নামে, "লুকিয়ে পড়েছিলি, তখন চোখে পড়েছিল। মানে জিনিসটা কোন কিছুর পিছনে আছে... কিন্তু..."

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। শরীরটা ভারী ক্লান্ত লাগছে। আজকাল এইটুকু উত্তেজনাই আর সহ্য হয় না।

ঘর থেকে গনশাকে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল সে। এমন সময় তার পা আটকে যায়। গনশার জামাটা চেপে ধরে মুঠো করে। ঠান্ডা, ভয় জাগানো গলায় বলে, "একটু আগে কী বললাম তোকে মনে আছে?"

— "বললে তোমার বোনকে..."

— "উহু... ওসব না। বাড়ির ব্যাপারে কী বলেছিলাম?"

গনশা মনে করার চেষ্টা করে, "বলেছিলে বাড়ি তৈরি হয় মানুষ দিয়ে।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "ইয়েস। এবং সেইজন্য বাড়ির সমস্ত গোপন কথা জানতে পারা যায় বাড়ির মানুষের আচরণ লক্ষ করলে..."

— "মানে?"

গনশা আর কিছু উত্তর দেয় না। হৈমন্তী ধীর পায়ে ফিরে আসে নিজের ঘরে। জিনিসটা কোথায় আছে তা নিয়ে আর সংশয় নেই মনে।

গনশাকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে হৈমন্তী। নিবারণের দিকে চেয়ে বলে, "মুরারিমোহনের যন্ত্রটা কোথায় আছে আমি আপনাকে বলে দিয়ে যাব। তবে সেটা কী করে উদ্ধার করবেন আপনি জানেন।"

— "মানে আপনি জানেন কোথায় আছে?"

হৈমন্তী বাঁকা হাসি হাসে।

— "কোথায় আছে?"

হৈমন্তী বিছানায় পিঠ এলিয়ে দিতে দিতে বলে, "আপনার কখনও মনে হয়নি অশ্বিনী আয়নার সামনে বসে ধ্যান করে কেন? ওর যা ক্ষমতা তাতে অতীতে বিচরণ করতে সামান্য আয়নার দরকার হবে কেন ওর?

— "মানে... আমি কখনও সেভাবে..."

— "ধ্যান করার সময় অশ্বিনীর শরীরে সাড় থাকে না। সামনে কী হচ্ছে বুঝতে পারে না। তাহলে এইসময়ে ঘরের ভিতর ঢুকে কেউ কোন দরকারি জিনিস যদি চুরি করে নিয়ে চলে যায় তাহলে তাকে আটকাতে পারবে না ও। তাই ওভাবে আয়নাটার দিকে মুখ করে নিজেকে বসিয়ে রাখে। যাতে চোর ভাবে ও আয়নার দিকে চেয়ে আছে..."

— "কিন্তু কী আছে আয়নাতে?"

— "আয়নাতে নয়..." একটা সিগারেট ধরায় হৈমন্তী, "আয়নার পিছনে। একটা দরজা। এবং সেই দরজার ভিতরে..."

— "মুরারিমোহনের যন্ত্র..." নিবারণের মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# অষ্টাদশ অধ্যায়

— "বাবু, আপনি একটি ছেলে আনতে বলেছিলেন, সে এসছে।"

— "পাঠিয়ে দে।"

বসার ঘরে রাখা আরামকেদারায় পিঠ এলিয়ে বসলেন মুরারিমোহন। সবে ভোর হয়েছে। আকাশে নীল রঙ ধরতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। মুরারি এই ভোরের দিকটায় জানলার সামনে রাখা কেদারায় এসে বসেন। সকালে পাখির ডাক শুনলে সারাদিন মন'টা ভারী উৎসাহ পায়।

দরজার কাছে পায়ের আওয়াজ হতে ফিরে তাকান মুরারি। রঘুবীর পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে আসে। তারপর ঝুলন্ত পর্দার দিকে চেয়ে বলে, "কই খোকা, ভিতরে এসো। বাবু এ-ঘরেই আছেন।"

পর্দার আড়াল থেকে যে ছেলেটি ঘরে ঢুকে আসে তাকে আগে কখনও দেখেননি মুরারি। ভারী বলিষ্ঠ, ঋজু চেহারা। অথচ মুখে কেউকেটা ভাব নেই। বরঞ্চ শরীরের তুলনায় মুখটা শিশুসুলভ। চোখ দুটোয় একটা দ্যুতি খেলা করে যাচ্ছে। এখন জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। তার উপরে ভোর, তাও ছেলেটার গায়ে পাঞ্জাবির উপরে কেবল একটা পাতলা শাল ফেলা।

মুরারি তাকে উপর থেকে নিচ অবধি একবার দেখে নেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে আবার জানলার দিকে চেয়ে বলেন, "নাম কী তোমার?"

— "অশ্বিনী..."

— "পুরো নাম।"

— "ওইটুকুই। আর কিছু নেই।"

চোখ তুলে তাকান মুরারি, "থাকা হয় কোথায়?"

একটু কি হাসে ছেলেটা? বলে, "আপাতত থাকার জায়গা নেই।"

— "তাহলে চেনা পরিচিত কেউ?"

ছেলেটা মাথা নিচু করে, "একজন আছে। তার খোঁজেই এসেছি এখানে।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "কার কথা বলছ তুমি? কে থাকে এখানে?"

— "থাকে না। থাকবে। দেরি আছে।"

ছেলেটার কথাবার্তা স্বাভাবিক নয়। খানিকটা কি ছিট আছে তবে? মুরারি আবার জানলার বাইরে তাকিয়ে বলেন, "দেখো তোমার চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আমার কাজের জন্য তুমি উপযুক্ত, কিন্তু একটা অজ্ঞাত কুলশীল মানুষকে ঘরে থাকতে দেব... আচ্ছা, তুমি ঠিকানা রেখে যাও। আমি কিছু ভেবে উঠলে খবর দেব।"

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকে অশ্বিনী। তারপরের যা বলে সেটা শুনে মুরারি চেয়ারটা তার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বসেন।

— "বাইশ নম্বর হুইল, উত্তর পূর্ব কোণে সতেরো ডিগ্রী পোলার এক্সিস..."

— "মানে?" মুরারি প্রায় আঁতকে ওঠেন।

— "আপনি যে নক্ষত্রের গতিপথ দেখতে চাইছেন সেটা ওই যন্ত্র দিয়ে কীভাবে দেখতে পারবেন সেটাই বললাম।"

হাতের ইশারায় রঘুবীরকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন মুরারি। চেয়ারের ঠিক পাশে রাখা টুলটা দেখিয়ে অশ্বিনীকে বসতে বলেন। এক গ্লাস জল খান ঢকঢক করে, "যন্ত্রটার কথা তুমি জানলে কী করে?"

— "অজ্ঞাতকুলশীলকে চাকরি পেতে গেলে এটুকু তো জানতেই হয়..."

— "গ্রামে কেউ ও যন্ত্রের নামও শোনেনি। ভূ-ভারতে হাতেগোনা কয়েকজন জানে যন্ত্রটার কথা। সত্যি করে বলতো তোমার মতলবটা কী?"

— "আমি মিথ্যে বলি না। এ-বাড়িতে একজনের আসার কথা আছে। তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্যে নেই আমার।"

মুরারিমোহন ব্যাপারটাকে আর এগোতে দেন না। চশমাটা চোখের উপর টেনে এনে বলেন, "আমার যন্ত্রের ব্যাপারে আর কী জানো তুমি?"

— "এটা জানি যে আপনি যন্ত্রের প্রক্রিয়া বিপরীত করতে চাইছেন।"

এতক্ষণে অভিজ্ঞ মুরারিমোহন বুঝতে পারেন এ কোনও সাধারণ ছেলে নয়। ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে এর কাছ থেকে যন্ত্রের ব্যাপারে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আর কিছু তথ্য জানা যেতে পারে।

— "তোমার কি মনে হয় সেটা সম্ভব?"

ছেলেটা সরাসরি উত্তর দেয় না। উলটে একটা প্রশ্ন করে, "লাভ কী?"

— "লাভ কী! কী বলছো তুমি! দেখো, যন্ত্রটা ব্যবহার করে আকাশে সমস্ত নক্ষত্রের অতীত অবস্থা দেখতে পাই আমরা। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে সেখানে কী ছিল, আবহাওয়া কেমন ছিল, প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কিনা সব কিছু দেখা যায়। এখন ভাবো যদি নক্ষত্রের ভবিষ্যৎও এমন করে দেখা যায় তাহলে পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে এই যন্ত্র স্থাপন করলে ভবিষ্যতের পৃথিবীও দেখতে পাব আমরা। আর সেটা হলে কী হবে বুঝতে পারছ?"

— "আজ থেকে দুশো কি তিনশো বছর পরের মানুষদের দেখে আমরা তাদের প্রযুক্তি শিখে নিতে পারব।"

— "শুধু প্রযুক্তি? তাদের গতিময় বিজ্ঞান, তথ্য, শিল্প, ওষুধ..."

— "ওষুধ!"

— "হ্যাঁ, ওষুধ... পৃথিবীতে এমন অনেক রোগ আছে যার ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। হয়তো আজ থেকে পাঁচশো বছর পরে হবে। আমরা ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতাকে দেখে সেই অসুধের ব্যবহার এখনই শিখে নিতে পারি।"

— "মানে মানুষের আর মৃত্যু হবে না।"

— "হবে না নয়। কিন্তু কমে আসবে। কখন ভূমিকম্প হবে, কখন সাইক্লোন আসবে, সব আগে থেকে জানতে পারব আমরা।"

— "আপনার মনে হয় না ভবিষ্যতের মানুষকে জায়গা দিতে বর্তমানের মানুষের চলে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী? প্রতি বছর পুজোর শেষে প্রতিমাকে ভাসান দেন না আপনি?"

কপালে একটা হাত রাখেন মুরারিমোহন, "তোমার বয়স বেশি নয়। হয়তো এমন কাউকে এখনও দেখোনি যে রোগে ভুগে ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে..."

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে অশ্বিনী। শালটা গা থেকে খুলে আবার গায়ে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



চাপিয়ে নেয়। তারপর বলে, "আমি আপনাকে কাজটায় সাহায্য করতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে।"

— "কী শর্ত?"

— "যন্ত্রের প্রক্রিয়া বিপরীত করার উপায় আপনি আমার সাহায্যে আবিষ্কার করলেও অন্য কাউকে জানাতে পারবেন না।"

— "মানে! কেন?" মুরারিমোহন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

— "তাহলে যার এখানে আসার কথা তার আর আসার প্রয়োজন পড়বে না।"

একটু সময় নিলেন মুরারিমোহন, কেদারায় আবার পিঠ এলিয়ে দিয়ে বললেন, "শুধু আমি জেনে লাভ কী হবে? মানুষের তো কোনও উপকার হবে না তাতে।"

অশ্বিনী গম্ভীর, ভারী গলায় বলে, "মানুষের উপকার মানুষকেই করতে হবে। আমার পক্ষে তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।"

— "জু হাইপথিসিস..." অবাক গলায় বিড়বিড় করেন মুরারিমোহন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলেন, "যাই হোক, এসব নিয়ে পরে কথা হবে না হয়। এখন থেকে তুমি এ-বাড়িতেই থাকবে। ভালো কথা, তোমার খাওয়া-দাওয়ার কোনও বাধা-নিষেধ আছে কি কিছু?"

— "আমি আমিশ খাই না।"

— "বেশ, আর কিছু?"

— "আমার একার জন্য একটা ঘর চাই। আমি ভিতরে থাকলে ভিতর থেকে তালা দিয়ে থাকব।"

হাঁক দিয়ে রঘুবীরকে ডাকলেন মুরারি। সে এসে দাঁড়াতে অশ্বিনীকে দেখিয়ে বললেন, "একে আমার পাশের ঘরটা দেখিয়ে দে। আজ থেকে ইনি এখানেই থাকবেন।"

মাথা নেড়ে প্যাসেজে বেরিয়ে রঘুবীর অশ্বিনীকে দেখিয়ে দেয় ঘরটা। তারপর তালা চাবি হাতে দিয়ে বলে, "আপনি এখানে কদ্দিন থাকবেন?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "কেন বলো তো?"

ইতস্তত করে রঘুবীর, "বাবুর সঙ্গে যেনারাই কাজ করতে আসে তারা বেশিদিন টেকে নে।"

রঘুবীরের কাঁধে একটা হাত রাখে অশ্বিনী, "আমি অনেকদিন থাকব, বুঝলে? এই বাড়িটা ভারী ভালো লাগছে আমার।"

— "বেলা তো পেরিয়ে গেছে। আপনি খাবেন কিছু?"

অশ্বিনী মাথা নাড়ে, "না। ক্লান্ত লাগছে বেশ। একটু বিশ্রাম নেব।"

আর কথা না বাড়িয়ে দরজাটা টেনে দেয় রঘুবীর। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। অশ্বিনী দরজায় ছিটকিনি দিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সিলিঙের দিকে।

গোটা দুপুর কেউ ডাকাডাকি করে না অশ্বিনীকে। আজ প্রথম দিন বলে দুপুরে তাকে দিয়ে কোনও কাজ করাননি মুরারিমোহন। বিকেলের দিকে তার দরজায় টোকা পড়ে। সে ভিতর থেকে সাড়া দিতে দরজার ওপার থেকে রঘুবীর বলে, "বাবু আপনাকে নিচে ডাকছেন। ছবি তোলা হবে।"

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে অশ্বিনী। জিজ্ঞেস করে, "কীসের ছবি?"

— "বাবুর শখ হয়েছে। বাড়ির সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ছবি তোলা হবে। বাইরের চাতালে মেশিন বসিয়েছেন।"

— "আচ্ছা বেশ। তুমি যাও, আমি আসছি।"

রঘুবীর নিচে চলে যেতে প্যাসেজটা পেরিয়ে ডানদিকে চলে আসে অশ্বিনী। যে ঘরে যন্ত্রটা রাখা আছে সেখানে ঢুকে আসে। চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নেয়। তারপর ঘরের বন্ধ জানলাটার দিকে এগিয়ে আসে।

ছোট একটা ধাক্কায় খুলে দেয় জানলাটা। বাইরে তাকিয়ে দেখা যায় বাড়ির চাতালে সত্যি দুটো লোক একটা ক্যামেরা বসিয়েছে। তার সামনে ভিড় জড় হওয়া শুরু হয়েছে।

পিছনে তাকিয়ে অশ্বিনী যন্ত্রের খোপের দরজাটা খেয়াল করে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাইরের ক্যামেরাটার দিকে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "এ কী! তুমি এখানে কেন?" ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটা লোক। সম্ভবত এ বাড়িতেই থাকে। কিছু একটা নিতে এসেছিল বাড়ির ভিতরে। অশ্বিনীকে এ ঘরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ করেছে হয়তো।

— "হ্যাঁ, এই যাচ্ছি নিচে।"

মুখ দিয়ে চুকচুক করে একটা আওয়াজ করে লোকটা, বলে, "এ কী! এই শীতের বিকেলে জানলা খুলে দিয়েছ কেন? ঘরটা ঠান্ডা হয়ে যাবে তো।"

— "একটু খোলা থাক। সন্ধ্যা নামার আগে বন্ধ করে দেব।"

কথাটা বলে নিচে নেমে চাতালে চলে আসে অশ্বিনী। ছবি তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এতক্ষণে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। আকাশে হালকা মেঘ জমছে। আলো হয়তো কমে আসবে একটু পরে। তাই তাড়াতাড়ি তুলে নেওয়া হবে ছবিটা।

অশ্বিনীতে ক্যামেরার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। যে লোকদুটো ছবি তোলার দায়িত্বে আছে তাদের দিকে একবার হাসি মুখে চেয়ে নরম গলায় বলে, "আমার খুব চোখ রাখার ইচ্ছা ওতে..."

অশ্বিনীর হাসিটা সময়ে সময়ে কাজে দেয়। লোক দুটো যন্ত্রের একটা বিশেষ জায়গা দেখিয়ে বলে, "সামনে পেয়েছ যখন দেখে নাও। ওই ফুটো দিয়ে দেখতে পাবে, চোখ রাখো।"

অশ্বিনী চাদরটা মাথার উপর নিয়ে চোখ রাখে সেই আইহোলে। জানলা দিয়ে আংটাটা দেখা যাচ্ছে। মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে, "খুব সুন্দর।"

জমাট ভিড়ের একটা কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। তারপর একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ক্যামেরার দিকে।

ছবি তুলতে মিনিট দশেক সময় লাগে। কাজ শেষ হতে ক্যামেরাম্যান এগিয়ে আসে মুরারিমোহনের দিকে। তারপর একগাল হেসে বলে, "ব্যাস, আপনারা এতগুলো মানুষ এবার অমর হয়ে গেলেন। আপনাদের দেহ মিলিয়ে যাবে কিন্তু এ ছবি... কয়েকশো বছর পরেও থেকে যাবে। কি ভাই, তাই তো?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



শেষ কথাটা অশ্বিনীর দিকে চেয়ে বলেছে লোকটা। সে মৃদু হেসে মাথা নাড়ে।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মুরারিমোহনের ঘরে ডাক পড়ল অশ্বিনীর। সে ঘরে পৌঁছাতেই লক্ষ্য করল মুরারিমোহনের সমস্ত মুখ লাল হয়ে আছে। পড়ার টেবিলের উপরে কিছু কাগজপত্র ছড়ানো। দেওয়ালে আটকানো দেরাজের সমস্ত পাল্লা হাট করে খোলা।

অশ্বিনীকে দেখে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি, "তুমি সত্যি করে বলো তো কী উদ্দেশ্যে এসেছ এখানে?"

— "বলেছি আগে। আবার একবার বলছি না হয়।"

— "ওসব আমি শুনতে চাই না। আমার বাক্স কোথায় রেখেছ বলো?"

— "বাক্স!"

— "হ্যাঁ। যাতে আমার গবেষণার কাগজপত্র থাকত।"

আর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মুরারিমোহন। তার আগেই বিকেলে দেখা সেই লোকটা ঘরে ঢুকে আসে। ঘরের ওলট-পালট অবস্থা দেখে একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে মামাবাবু?"

— "হয়নি কিছু, তবে হবে... টের পেতে শুরু করেছি এর মধ্যে..."

— "কিছু চুরি গেছে?" লোকটা অশ্বিনীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে। তারপর মুরারিমোহনের দিকে এগিয়ে আসে।

— "একটা বাক্স। তুমি তো দেখেছো। নবগঞ্জের বাহাদুরসাহেব উপহার দিয়েছিলেন। তার উপরে রত্নটত্ন বসানো ছিল। সেইটা দেখেই ব্যাটা চুরি করেছে বাক্সটা।"

— "শুধু ওইটাই? নাকি আর কিছু..."

টেবিলের উপরে একটা চাপড় মারেন মুরারিমোহন, "আরে সেইটাই ভেবে তো তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। বাক্সের ভিতরে আমার গবেষণার কাগজ ছিল। সেগুলো দেরাজের মধ্যে রেখে গেছে চোর। তার বদলে দেরাজ থেকে কিছু সাদা কাগজ নিয়ে গেছে।"

— "সাদা কাগজ! সে আবার চুরি যায় নাকি?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "তাহলে বোঝো অবস্থা।" অশ্বিনীর দিকে চোখ ফেরান মুরারিমোহন, "মাংস ভক্ষণ করো না, এদিকে চুরি করতে হাত কাঁপে না।"

অন্য লোকটা এবার রক্তচক্ষু হয়ে ওঠে, "আজ বিকেলে যখন সবাই ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিল তখন একা ঘুরতে-ঘুরতে চুরি করেছিস তাই না?"

অশ্বিনীর দিকে এগিয়ে এসে তার গালে দুটো সপাটে চড় মারে লোকটা। পা থেকে চটি-জুতো খুলতে যাচ্ছিল, মুরারিমোহন, "থাক রমেন। তুমি এসো এখন।" বলে থামিয়ে দেন।

লোকটা আর একবার অশ্বিনীর দিকে হিংস্র দৃষ্টি হেনে গটগট করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

মুরারিমোহন নিজেকে একটু শান্ত করার চেষ্টা করেন। তারপর চেয়ারে বসে পড়ে বলেন, "অচেনা অজানা একটা মানুষকে ঘরে থাকতে দিয়ে বড় একটা ভুল করে ফেলেছি রে ভাই। বাক্সটার জন্যে দুঃখ নেই। ওটা আমার ফেরতও চাই না। শুধু কলকাতা থেকে এত দূরে এসেও শেষে ঠক জোচ্চরের উপর বিশ্বাস করে ঠকতে হবে ভাবতে পারিনি। নাঃ তুমি কাল সকাল হলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেও।"

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল অশ্বিনী। সে ধীরে ধীরে মুখ খোলে, "ঠিক আছে চলে যাব। কিন্তু আপনি দয়া করে চাকরি দিয়েছেন যখন তখন এ-বাড়িতে শেষ একটা কাজ করে যেতে চাই।"

— "কী কাজ?"

— "আমি যে ঘরটায় আছি তার জানলার উপর ভাঙা জায়গাটা খানিকটা চুন সুরকি পেলে আমি মেরামত করে দিতে পারি।"

— "জানলার উপরে ভাঙা জায়গা!" মুরারি একটু থমকান, "ওই জায়গাটা ভেঙে গেছে নাকি? আজ বিকেলেই তো দেখলাম..."

— "ভাঙেনি। ভাঙবে। আজ রাতে এ বাড়ির কাছে একটা বাজ পড়বে, তাতেই ভেঙে পড়বে জায়গাটা।"

মুরারিমোহন আর কিছু বলেন না। হাতের ইশারায় তাকে ঘর থেকে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



বেরিয়ে যেতে বলেন।

অশ্বিনী ঘরে ফিরে এসের দরজার ছিটকিনি তুলে দেয়। তারপর বিছানার তলা থেকে বের করে আনে রত্নখচিত বাক্স এবং সাদা কাগজগুলো। ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে সাদা কাগজের উপরে কিছু লিখতে শুরু করে সে। কয়েক জায়গায় কিছু চিহ্ন আঁকে। কোথাও নিজের ইচ্ছামতো আঁক কাটে। দু এক জায়গায় চিড়িয়াখানা কথাটা লিখে দেয়।

বাইরে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শীতকালে এমন ঝড়ের তান্ডব সচরাচর দেখা যায় না। মেঘ ডাকছে ক্রমাগত। দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল। ক্রমশ কাছে আসছে সেটা।

অশ্বিনীর মুখমণ্ডলে কিন্তু কোনও বিকার নেই। দ্রুত হাত চলতে থাকে তার। কাগজের উপরে ঘসঘস আওয়াজে ভরে ওঠে ঘরটা। যেন মুখস্ত কিছু লিখে চলেছে।

ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে লেখা শেষ হয়ে যায় তার। ভালো করে একবার দেখে নিয়ে সমস্ত লেখা কাগজগুলো বাক্সের ভিতরে ভরে ফেলে সেটার চাবি বন্ধ করে দেয়। বাক্সটা সরিয়ে রেখে আলো নিভিয়ে বিছানার উপরে শুয়ে পড়ে। ঝড় এখন প্রলয়ে পরিণত হয়েছে। ভীষণ বজ্রপাতের শব্দে কেঁপে উঠছে বাড়িটা।

অন্ধকারে শুয়ে অঝোর বৃষ্টির শব্দ শুনতে থাকে অশ্বিনী। মনে হয় সেই বৃষ্টির শব্দে একটা গানের সুর মিশে আছে। এ গান লেখা হতে এখনও দু দশক বছর দেরি আছে।

তোমার শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে...

অশ্বিনীর মনে হয় তার নিজের মতো এই শব্দগুলোও সময়ের নিয়ম মানে না, তারা অবিনশ্বর। তাদের কালের চাকায় ক্ষয় হয় না। কেবল সৃষ্টি আছে, ধ্বংস নেই।

তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিগমন,

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ...

অশ্বিনী চোখ বন্ধ করে নেয়।

* * * * * * * * *

চোখ খুলে হৈমন্তী দেখে একটা অন্ধকার ছায়া বসে আছে তার বিছানার পাশের চেয়ারে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। জানলাগুলো খুলে শুয়েছিল সে। এখন বন্ধ করা আছে।

— "ঘুম আসছে না?" হৈমন্তী ছায়াটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে।

— "আপনি জানেন আসে না।" ছায়া উত্তর দেয়।

— "তাহলে আয়নার সামনে বসে নেই যে... আমার অতীতের সব কিছু দেখা হয়ে গেছে?"

— "অনেকদিন আগে।"

— "হুম, মাঝরাতে প্যাঁচার মতো জেগে বসে থাকতে হবে না। আমার পাশে শুয়ে পড়ো।"

একটু ইতস্তত করে অশ্বিনী, "আমি আগে কোনওদিন..."

— "ধ্যাত..." বিরক্ত হয় হৈমন্তী, "আবার সেই ভাঙা রেডিও। আরে শোও, এডস রোগীর সঙ্গে শুলে এডস হয় না।"

— "মজা করছেন? হাসা উচিত ছিল আমার?"

— "উঁহু... ঘর অন্ধকার। হাসিটা না দেখে মিস করতে চাই না। শুয়ে পড়ো এখানে..."

কয়েক সেকেন্ড সময় নেয় অশ্বিনী। তারপর চেয়ার থেকে উঠে এসে শুয়ে পড়ে হৈমন্তীর পাশে। হৈমন্তী একটা হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "আজ একটা ব্যাপার জানতে পেরেছি, জানো?"

— "তাই নাকি?"

— "মহা মুশকিল তো! কী জেনেছি জানতে চাইবে না?"

— "নিশ্চই এমন কিছু যেটা আমাকে বলা বলা যাবে না।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ঠোঁট উলটায় হৈমন্তী, "ধুর কোনও মজা নেই। তুমি তো সব কিছুই জেনে বসে আছো। কিন্তু আজ যে কীভাবে ব্যাপারটা জেনেছি তা তুমি ভাবতেও পারবে না।"

— "বটে!" অশ্বিনীর গলায় একটা হাসির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, "তবে আমি একটা জিনিস খুব ভালো জানি।"

— "কী?"

— "আপনাকে কী করে এ-বাড়িতে আটকে রাখতে হয়..."

মাথা তুলে অশ্বিনীর মাথায় একটা চাঁটি মারে হৈমন্তী, "বাজে কথা। আমি কখনও যেতেই চাইনি ভাসানবাড়ি ছেড়ে..."

— "তিনদিনের মাথাতেই যেতে চেয়েছিলেন। তারপর কেন জানি না আটকে গেলেন..."

— "আরে জানলার উপরে ওই বাক্সটা..." কথাটা বলতে গিয়েও থেমে যায় হৈমন্তী। আর একটু হলেই বলে ফেলেছিল কথাটা।

— "কোন্ বাক্স?"

— "না কিছু না..." আর একটু জোরে অশ্বিনীকে জড়িয়ে ধরে হৈমন্তী। হাত বাড়িয়ে একটা জানলা খুলে দেয়। বৃষ্টির মিহি ছাট এসে লাগতে থাকে ওদের গায়ে, বিছানায়।

— "আচ্ছা একটা কথা বলতো..." হৈমন্তী জড়ানো গলায় বলে।

— "কী?"

— "এই আমার গোটা জীবন'টা চোখের সামনে না দেখে তুমি তো ছোট থেকে আমার সঙ্গে থাকতে পারতে। কোন বন্ধু হয়ে... পারতে না?"

— "না।"

— "কেন?"

অশ্বিনী সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে, "এই যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলি, স্পর্শ করি এটা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। সে নিয়ম মানলে আপনাকে শুধু দেখতে পারি আমি। দেখা দিতে পারি না। এই

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



পৃথিবীতে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে প্রকৃতির নিয়ম খাটে না, কেবল এই বাড়িটা ছাড়া। এখানে এমন একটা যন্ত্র আছে যেটা সময়ের স্বাভাবিক নিয়ম পালটে দিতে পারে... ফলে মহাবিশ্বের কোনও নিয়ম মানতে হয় না এখানে। তাই এ বাড়িতে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি।"

— "কিন্তু আমরা যে বাজারে গেছি এক সঙ্গে, তোমার সেই ডোবাটার উপরে গিয়ে বসেছি..."

— "সে তো দেখা হওয়ার পর। এখন আর কোথাও যেতে বাধা নেই..."

কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকে হৈমন্তী। একটা প্রশ্ন বারবার অমাবস্যার তারার মতো জেগে উঠছে তার মনের, "তুমি তো ভবিষ্যতেও যেতে পারো, তাহলে আমি মারা গেলে গেলে আমার জন্য অপেক্ষা না করে আমার দ্বিতীয় জীবনে চলে যেতে পারবে?"

— "না হৈম। আমি ভবিষ্যৎ জানতে পারি, সেখানে যেতে পারি না।"

বুক থেকে মুখ তোলে হৈমন্তী, "জানতে পারো। মানে আমি কবে মরব তুমি এখন জানো?"

— "জানি।"

— "বলো কবে?"

তার মাথাটা আবার বুকে টেনে নেয় অশ্বিনী।

— "বেশ, বুঝেছি বলবে না। তাহলে এটুকু অন্তত বলো যখন মরব তুমি কাছে থাকবে কিনা..."

— "এমন কোনও সময় আসবে না যখন আমি তোমার কাছে থাকব না।"

কেউ আর কোনও কথা বলে না। বৃষ্টির ফোঁটারা এখন কিছুটা শান্ত হয়েছে। সেই নিস্তব্ধতার সুযোগে শোনা যায়, সত্যি দূরের কোন রেডিও থেকে গান ভেসে আসে। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে লেখা কোনও গান। তার সুর বৃষ্টির ছাটের মতোই এসে ভিজিয়ে দিতে থাকে ওদের—

দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন
তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ...

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# উনবিংশ অধ্যায়

সকালে ঘুম ভাঙতে চোখ খোলে হৈমন্তী। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীর চোখে চোখ পড়ে যায়। ছেলেটা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। চোখ দুটো খোলা। বোঝা যায় সারারাত একবারও বন্ধ হয়নি তারা।

— "গুড মর্নিং।"

— "মর্নিং। আপনার গায়ে জ্বর আছে। ওষুধ খেয়ে নিন।" পাশের টেবিলে এনে রাখা ওষুধটা দেখায় অশ্বিনী। তারপর আবার চোখ রাখে তার মুখে।

ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে মুখে ফেলতে ফেলতে হৈমন্তী বলে, "কখন থাকে না বলতো? জ্বর আর তুমি, এই নিয়েই এখন আমার সংসার।"

— "আগে কী নিয়ে ছিল?"

হৈমন্তী হাসে, "সংসার আমার কোনওদিনই কিছু ছিল না। রোজকার বেঁচে থাকাটা চুরি করাকে, সংসার বলে না। রোগটা ধরা পড়া থেকেই..."

— "জিলিপি খাবেন? বাজারের সামনে ভাজা হচ্ছিল। এখনও গরম আছে..."

অশ্বিনীর বাড়িয়ে ধরা জিলিপির ঠোঙ্গা খুলে একটা জিলিপিতে কামড় বসায় হৈমন্তী। ধীরেসুস্থে সেটা চেবাতে চেবাতে বলে, "বাঃ, এমন রসভরা মোটা মোটা জিলিপি বহুদিন খাইনি... ছোটবেলায় আমাদের পাড়ার একটা লোক বানাত, জানো? তখন আমার বয়স পাঁচ কী ছয় হবে, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমার হাতে একটা করে দিত, রোজ। এদিকে পয়সা নিত না।"

— "তারপর?"

হৈমন্তী আর একটা জিলিপি তুলে নিয়ে বলল, "তারপর একদিন দেখলাম লোকটা দোকান-টোকান ফেলে রাস্তায় ভিক্ষা করছে। যদ্দুর মনে পড়ে আগুন

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



লেগে পুড়ে গেছিল দোকান'টা। গরিব মানুষ... তো আমার স্কুলে যাবার ভাড়া ছিল তিন টাকা, আসার তিন টাকা। বাবা আমাকে দিত দশটাকা। বাকি চার টাকা কিছু কিনে টিনে খাওয়ার জন্য। আমি ওকে ওই চার টাকা দিতাম রোজ... একদিন লোকটা আমার হাত চেপে ধরল খপ্ করে..."

শব্দ করে হাসে অশ্বিনী, "আমি একাই করিনি তার মানে।"

— "আরে শোনো না, ব্যাটা আমার হাত ধরে বলে, এই খুকি তুই আমাকে রোজ টাকা দিস কেন? আমি বললাম তুমি যে রোজ জিলিপি দিতে। সে বলল। তোর আবার জিলিপি খেতে ইচ্ছা করে? আমি খুব জোরে মাথা নেড়েছিলাম বুঝলে... তারপর..."

— "তারপর কী হল?"

ঠোঙা রেখে অশ্বিনীর দিকে এগিয়ে আসে হৈমন্তী, "কী হল সেটা তুমি বলো। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে আর দেখতে পেলাম না ওকে। তারপর থেকে আর দেখতেও পাইনি কোনওদিন..."

অশ্বিনী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। হৈমন্তী থামিয়ে দিয়ে বলে, "দাঁড়াও আর একটা লোকের কথাও জানতে ইচ্ছা করছে। হাওড়া ব্রিজের একদম গা ঘেঁসে, বুঝলে, একটা মাতাল থাকত। গাঁজা-টাজা খেত বোধহয়। তবে পঞ্চাশ টাকা দিলে সে ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাত। আমি একবার শুনেছিলাম, 'এক পেয়ার কা নাগমা...' বলেছিল কোনওদিন মদের টাকা না পেলে বেচে দেবে ভায়োলিন'টা... ওর কথাও জানতে চাই।"

— "ওরা দু'জনেই খুব খুশি আছে।" অশ্বিনী চোখ বন্ধ করে বলে, "এখনও যদি অন্ধকার শুনশান রাতে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ান, দেখবেন জ্যোৎস্নার আলোয় বসে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছে।"

— "তুমি যেতে পারো সেখানে?"

অশ্বিনী উপরে নিচে মাথা নাড়ায়।

— "আমাকে নিয়ে যেতে পারো? একবার? প্লিজ..."

চেয়ারে ছেড়ে উঠে পড়ে অশ্বিনী। তারপর নিজের দুটো হাত চেপে ধরে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



হৈমন্তীর চোখের উপরে। চোখ জুড়ে অন্ধকার নেমে আসে। পরমুহূর্তে কেটে যায় অন্ধকারটা। হৈমন্তী দেখে চারপাশের পরিবেশ বদলে গেছে। অন্ধকার একটা রাত নেমে এসেছে চারিদিকে। দমকা হাওয়া বইছে ওদের ঘিরে, গঙ্গার জলের গন্ধ সেই বাতাসে। সঙ্গে একটা নরম সুর খেলা করে চলেছে।

অবাক হয়ে হাওড়া ব্রিজের আকাশছোঁয়া চূড়া দুটোর দিকে তাকায় হৈমন্তী। এত গভীর রাতে এই ব্রিজটাকে আগে কখনও দেখেনি সে। ট্রেনের আওয়াজ নেই, স্টেশানের সামনে মোটবাহক আর ট্যাক্সিওয়ালাদের হাঁক-ডাক নেই, গোটা শহরটা যেন সারাদিনের হৈচৈ-তে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা ঘাটের সিঁড়ির ধাপের উপরে বসে আছে ওরা। সামনে জলের ছলছল শব্দ।

হৈমন্তী অশ্বিনীর কোলে ঠেস দিয়ে বসে। জলের উপরে তারাদের ছায়া এসে পড়েছে। সবকটা তারার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সুরটা।

একটু একটু করে ধাপের উপরে উঠে দাঁড়ায় হৈমন্তী। এগিয়ে যায় জলের দিকে। তার গোড়ালি অবধি ডুবে যায় জলে। কাশির দমকে কেঁপে ওঠে একবার। নিচু হয়ে আঁজলা করে জল তুলে নেয় হাতে। তারপর সেটা ছুঁড়ে দেয় অশ্বিনীর দিকে।

— "এ কী ভিজে যাব তো..."

— "তো? জলাতঙ্ক আছে তোমার? কুকুরে কামড়েছিল?"

— "কুকুর আমার ধারে-কাছে আসে না, ভয় পায়।"

হৈমন্তী মাথা নাড়ে, "শুনেছি কুকুর ছদ্মবেশী মানুষকেও চিনে নিতে পারে, আচ্ছা, তোমার আসল রূপটা দেখাও তো..."

— "সেটা কী আবার?"

— "মানে এই মানুষের শরীরটা তো তোমার খোলস, আসলটা কেমন সেটা দেখতে ইচ্ছা করছে..."

— "আমার কোনও আসল রূপ নেই। সবই খোলস..."

— "বাবা! তুমি মানুষ না পেঁয়াজ?"

— "কোনওটাই না, কাটলে যে চোখের জলটা বেরোই সেটা বলতে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



পারেন। আচ্ছা এবার উঠে আসুন।"

একটা হাত বাড়িয়ে দেয় অশ্বিনী। সেটা ধরে হৈমন্তী ঘাটের উপরে উঠে আসে। রাস্তায় ওঠার মুখেই গঙ্গার বাঁধানো পাড় জুড়ে লম্বা ফাঁকা রাস্তা। সেটা দেখিয়ে হৈমন্তী বলে, "এখানে একটু হাঁটব, তারপর ফিরি?"

— "চলুন।"

পাশাপাশি হাঁটতে থাকে দু'জনে। গঙ্গার জোলো হাওয়া বইতে থাকে ওদের ঘিরে। অশ্বিনীর গায়ে ঠেস দিয়ে হাঁটতে থাকে হৈমন্তী, "আমার রোগটা হওয়ার পর থেকে একটা কাজ খুব সহজে পারতাম, জানো?"

— "কী কাজ?"

— "এই সব কিছুর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এই গঙ্গার পাড়, কলকাতা, মানুষজন... সবকিছু..."

— "তারপর?"

— "তারপর হুট করে তুমি চলে এলে একদিন। আচ্ছা আমার একটা শেষ ইচ্ছাপূরণ করবে?"

— "কী? বলুন..."

* * * * * * * *

সকালের দিকে একটু পার্কে হাঁটতে বেরোন মিসেস ঘোষ। ষাটের কাছাকাছি বয়স হতেই ডাক্তার নিদান দিয়েছেন মর্নিংওয়াকের। নাহলে পায়ের জোর কমবে দিন দিন।

এমনিতে সকালে পার্কটা ফাঁকাই থাকে। গরমের দিন। একটু পরেই রোদ উঠে যাবে। তাড়াহুড়ো করেন মিসেস ঘোষ। পার্কের গেট খুলে হাঁটা রাস্তার দিকে এগোতেই খেয়াল করেন আজ ঘড়ি পরতে ভুলে গেছেন।

আটটা অবধি হাঁটেন তিনি। তার বেশি দেরি হলেই চিত্তির। স্কুলে যাওয়ার দেরি হয়ে যাবে। নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে সামনের পথে পা বাড়ান।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "ম্যাম..." পিছন থেকে ভেসে এসেছে ডাকটা। মিসেস ঘোষ ঘুরে তাকান। এই ঘুরে তাকানোটা কিছুটা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো হয়ে গেছে তার। তাকাতেই ঠিক পেছনে দুটো মানুষকে দেখতে পেলেন তিনি। দুজনেরই বয়স তিরিশের কাছাকাছি। একজন পুরুষ, অপরজন মহিলা। দু'জনের কাউকেই তিনি চেনেন না। অবশ্য পুরনো ছাত্রছাত্রী হলে...

হাঁটা থামিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন। মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকান। সম্ভবত অসুস্থ মেয়েটি। মুখ চোখের অবস্থা ভালো নয়।

— "চিনতে পারছেন না আমাকে, তাই না?" মেয়েটা হাসার চেষ্টা করে।

— "তুমি..." চশমার বাইফোকাল দিয়ে ভালো করে তাকান তিনি, "তুমি... হৈম... হৈমন্তী..." মিসেস ঘোষ অবাক হয়ে বারবার খতিয়ে দেখতে থাকেন মেয়েটির মুখ।

— "এ কী চেহারা হয়েছে রে তোর। গোলগাল ছিলি, এখন..."

হৈমন্তীর ওজন বেশ কিছুটা কমেছে আগের থেকে। রোগা যাকে বলে তা সে কোনওদিনই ছিল না। কিন্তু গোলগাল ছিল কি? ম্যামের স্মৃতিশক্তি বয়সের সঙ্গে কিছুটা ক্ষয়েছে বোঝা যায়।

— "কী একটা রোগ হয়েছিল যেন..."

— "এইডস হয়েছিল ম্যাম।"

এতক্ষণে স্নিগ্ধা ঘোষের মুখের উপর রঙ খেলে যায়। দু'হাতে হৈমন্তীর কাঁধের উপরে একটা ঝাঁকা দেন তিনি, "এই তুই... তুই এতদিন একবারও যোগাযোগ করলি না ম্যামের সঙ্গে, অ্যাঁ? আমার ছেলেকে কতবার বলেছি তোর নাম দিয়ে ফেসবুকে খুঁজতে, সে বলে তুই নাকি ফেসবুকে নেই..."

— "ওই... থাকি, থাকি না..." হৈমন্তী মন খুলে হাসে।

— "সে যাই কর বাবা, আমাকে ফোন নম্বরটা দে এক্ষুনি।"

— "ফোন নেই ম্যাম। হারিয়ে গেছে।"

— "সে কী রে!" হৈমন্তীর চিবুকে হাত দেন মিসেস ঘোষ, "তাহলে ঠিকানাটা অন্তত..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



একবার পিছন ফিরে অশ্বিনীর দিকে চায় হৈমন্তী। আবার মুখ ঘুরিয়ে বলে, "ঠিকানা বললেও তো আর দেখা হবে না ম্যাম... আমি আসলে... আপনার একটা জিনিস ফেরত দিতে এসেছি। আমার কাছে ছিল এতদিন..." নিজের হাত থেকে হলদে ব্যান্ডের ঘড়িটা খুলে নেয় হৈমন্তী। তারপর মিসেস ঘোষের হাতটা তুলে নিয়ে তাতে পরিয়ে দিতে দিতে বলে, "একদিন আপনি আমার হাতে এটা পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কোনওদিন খুলিনি হাত থেকে।"

ঘড়িটা চিনতে পারেন মিসেস ঘোষ। তার মুখে কোনও শব্দ ফোটে না।

— "আপনার কথাগুলো সেদিন বুঝতে পারিনি। আজ বুঝি। সময় সামনের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু পালিয়ে যায় না। ঘড়ির কাঁটা রোজ বারোটার কাছে ফিরে আসে। বারবার... আমাদের হাতে বন্দি হয়ে থাকে... আজ সেটা আমাকে মনে করাতে আর এই ঘড়িটা লাগবে না।"

অশ্বিনীর দিকে চোখ পড়ে ঘোষের। হৈমন্তীর সিঁথির দিকে একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নেন তিনি।

— "আমাকে মনে রাখবেন তো ম্যাম?"

সময়ের স্রোত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিক্ষিকার উপরে। হু হু করে পিছিয়ে যেতে থাকে দীর্ঘ বছরগুলো। সেই ছোট্ট বছর পনেরোর মেয়েটার কথা মনে পড়ে যায়। গোলগাল সরল একটা মুখ, দুটো উজ্জ্বল কাজলমাখা চোখ, সরস্বতী পুজোয় আলপনা দেওয়া মেয়েটা, হোমওয়ার্ক না করে এনে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা, রাফখাতার পিছনে কাকতাড়ুয়া আঁকা মেয়েটা আজ কী ভীষণ ধৃষ্টতায় বলে বসেছে, "আমাকে মনে রাখবেন তো ম্যাম?"

এ অপরাধের শাস্তি ঠিক করতে পারলেন না তিনি। হৈমন্তীর দু'গালে দুটো হাত রাখলেন তিনি, "সুখে থাক মা। যেখানেই থাক, সুখে থাক..."

হাঁটতে শুরু করলেন মিসেস ঘোষ। ওরা দু'জনে উলটো দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। হৈমন্তীর চোখ বেয়ে জল নামছিল। সেটা মুছে নিয়ে পাশে তাকিয়ে সে বলল, "চলো, বাড়ি ফিরব এবার।"

— "আপনার বোনের সঙ্গে দেখা করবেন না?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "না।"

— "কেন?"

— "আমার আর ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত হবে না।"

— "কেন বলুন তো?"

একটু হেসে হৈমন্তী বলে, "মানুষের মধ্যেও একধরনের জু হাইপোথিসিস কাজ করে, বুঝলে? আমাদের যতই ইচ্ছা হোক, সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। চলো তো, আমাদের জিলিপি ঠান্ডা হচ্ছে..."

* * * * * * * * *

— "তোমাকে অনেকবার বলেছি? এমন করলে শাস্তি পেতে হবে..." শশীর মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেয় রমেন। বাইরে থেকে টেনে দেয় ছিটকিনিটা, "আপাতত বন্দি থাকো। যা দেখবে জানলা দিয়ে দেখো।"

বন্ধ দরজার ওপার থেকে গটগট করে নেমে যাওয়ার শব্দ পায় শশী। একবার দরজার উপর চাপড় মারে সে। তারপর গোমড়া মুখ করে জানলার দিকে সরে আসে।

আজ সকাল থেকে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা গাছ কাটা হবে। কেন কাটা হবে তা অবশ্য বাড়ির হর্তাকর্তা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানে না। শশীর বয়স কম। তার ভারী ইচ্ছা সেও জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে গাছ কাটা দেখবে। এই মর্মে বাবার কাছে আগ্রহ দেখাতে গিয়েই কাল হয়েছে। ঘরের ভিতরে আটকা পড়তে হয়েছে। সে ভারী দুরন্ত ছেলে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারে না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দূরে জঙ্গলের ভিতরটা চোখে পড়ে তার। এখন অবশ্য গাছপালার সার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু একটু পরেই গাছের মাথা কেঁপে উঠবে। মানে তাদের গোড়া কাটা হচ্ছে। এটুকু যা দেখতে পাবে শশী।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



গাছগুলোর কাছে পৌঁছে মুরারিমোহনের দিকে একবার ফিরে তাকায় অশ্বিনী, "আপনি মানলেন না আমার কথা।"

চারপাশটা দেখতে দেখতে মুরারি বলেন, "তুমি আমাকে মাফ করো ভাই, ও কথা আমি রাখতে পারব না। সারাজীবন বিজ্ঞানসাধনা করে এসেছি, যা কিছুতে মানুষের উপকার হয় তাই করব আমি।"

— "সেক্ষেত্রে আমার সাহায্য নেওয়া উচিত হয়নি আপনার।"

— "থামো হে ছোকরা। আমি যা দেখেছি তা দেখলে তোমার পিলে চমকে যাবে। ভাসানবাড়ির ছাদ থেকে আমি দুশো বছর অবধি ভবিষ্যৎকালের আকাশ দেখেছি। তখনই বুঝেছি আমার গবেষণার কাগজ প্রকাশে আসার সময়ে এসে গেছে। এখন শুধু দেখতে চাই বাড়ির বাইরেও যন্ত্রটা কতদুর কাজ করে। বাড়ির বাইরে শেষ একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই... আজকের মধ্যে এ জায়গাটা সাফ হয়ে গেলে যন্ত্রটা এখানে এনে আজ রাতেই..."

— "বেশ..."

অশ্বিনী দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা গাছের কাছে এগিয়ে যায়। তারপর সেটার উপরে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "এই গাছটা আর এর পাশের চারটে গাছ কাটতে হবে, তাহলে যন্ত্রটার জায়গা হয়ে যাবে। তাছাড়া জায়গাটা থেকে এখনও সাধারণ আকাশই দেখা যায়। ফলে আপনার গবেষণার ফলও একেবারে নির্ভুল আসবে..."

— "খেঁটুরাম..." জোর গলায় ডাক দেন মুরারি। একটু পিছিয়ে হাঁটছিল খেঁটু আর তার দুই সাগরেদ। তারা এগিয়ে এসে হাত জোড় করতে মুরারি বলেন, "এই দাদাবাবু তোদের গাছ দেখিয়ে দেবে। আজ বিকেলের মধ্যে আমার জায়গাটা সাফ চাই একদম।"

— "জী হুজুর। আভি কাম শুরু করে দেব..."

বাড়ির আর জনাপাঁচেক লোক এসে জড় হয়েছে জায়গাটায়। গাছের গুঁড়িটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে তারা। শক্ত গুঁড়ি। তবে খেঁটু আর তার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



সাগরেদদের হাতের অস্ত্রও তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো। করাতের মতো দেখতে অনেকটা, কিন্তু তার থেকে ঢের বেশি ধারালো আর লম্বা। করাতের গায়ের হিংস্র কাঁটাগুলোকে দেখলে মনে হয় গাছকে কাটার আগে খানিকটা অত্যাচার করার অভিপ্রায় আছে তাদের।

দড়ি আর সেই করাত হাতে গাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। অশ্বিনী আচমকা বাধা দিয়ে ওঠে। উপরে তাকিয়ে কিছু একটা চোখে পড়েছে তার, হাত তুলে বলে, "একটু দাঁড়ান। গাছের উপরে কিছু একটা আছে।"

— "ক্যা হ্যায়?" অবাক হয়ে জিগেস করে খেঁটু।

আরও ভালো করে দেখে নিয়ে মুখ নামায় অশ্বিনী, "একটা পাখির বাসা। তাতে পাখির বাচ্চাও আছে। প্রাণীহত্যা উচিত হবে না।"

রমেন সামনে এগিয়ে আসে, "আরে গাছ কাটলে তার সঙ্গে কিছু প্রাণী তো যাবেই... তেমন হলে ঢিল ছুঁড়ে উড়িয়ে দাও পাখিকে।"

— "বাচ্চা পাখি। উড়তে পারে না।"

— "তাহলে কী করবে এখন?" মুরারি জিজ্ঞেস করেন।

— "ওদের নামিয়ে আনতে হবে।"

খ্যাঁক খ্যাঁক করে খৈনি খাওয়া গলায় হেসে ওঠে খেঁটু, "বাবুজি বাহেক গায়ে ক্যা..."

— "আরে এ কি আমগাছ নাকি যে উপরে উঠে নামিয়ে আনবে?" রমেন ঝাঁজিয়ে ওঠে, "কাণ্ডটা দেখেছ? একেবারে সিধে উঠে গেছে। এ গাছে ওঠার ঝামেলা অনেক..."

— "হাম পেড় কাটনে আয়ে হে, চড়েঙ্গে নেহি।" খেঁটু সাফ জানিয়ে দেয়।

মুরারি একটু এগিয়ে বলেন, "বেশ তো। অশ্বিনীর যখন মনে হচ্ছে বাসাটা নামিয়ে আনা উচিত তখন ও নিজেই নামিয়ে আনুক না হয়। তারপর আমরা গাছে হাত দেব।"

রমেন আবার আপত্তি জানাচ্ছিল। অশ্বিনী তার আগেই এগিয়ে গেছে গাছের কাণ্ডের দিকে। মাটির উপর দাঁড়িয়ে একবার কাণ্ডটা ভালো করে দেখে

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



নেয় সে। তারপর দড়ি-টড়ির তোয়াক্কা না করে কাণ্ড জড়িয়ে ধরে উপরে উঠতে থাকে।

জিভ দিয়ে চক্‌চক্ করে একটা শব্দ করে খেঁটু, "গিরনে পে বাচনেকা উম্মিদ নাহি। আজ কুছ গালাথ হোনেওয়ালা হ্যায়।"

মিনিট পনেরোর কসরতে অন্তত তিনতলা সমান গাছটার মাথার উপরে উঠে আসে অশ্বিনী। ডালপালার ফাঁকে পাখির বাসাটা তার চোখের সামনে চলে আসে। মা পাখিটা এখন নেই। তবে সদ্যজাত তিনটে বাচ্চা গোলগোল চোখে তাকায় অশ্বিনীর দিকে। এর আগে বাসার কাছে মানুষ দেখেনি তারা। অবাক হয়ে ঠোঁট বাড়িয়ে কয়েকবার চকচক করে আওয়াজ করে।

জানলা থেকে গাছের মাথায় মানুষ উঠতে দেখে চমকে যায় শশী। যে ছেলেটা গাছের মাথায় উঠেছে তাকে সে চেনে। ওদের বাড়িতেই থাকে। দাদুর কাজে কীসব সাহায্য করে। একবার নাকি দাদু তাড়িয়ে দেবেন ভেবেছিলেন। তারপর কিছু কারণে ফিরিয়ে এনেছেন।

ছেলেটার গায়ের শালটা এখন তার কোমরে বাঁধা। হাত বাড়িয়ে গাছের ডালপালার মধ্যে থেকে কী একটা যেন বের করে আনছে। শশী জানে ওদের বাড়ির প্রায় সব লোক ওই গাছতলায় গিয়ে ভিড় করেছে। ওকে একা শুধু বন্ধ করে রেখেছে বাড়িতে।

স্থির চোখে তাকিয়ে দেখছিল শশী। গাছে ওঠা ছেলেটা একটা হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে। যেন আকাশের দিক থেকে কাউকে ডাকছে সে। তাজ্জব হয়ে যায় শশী। কাকে ডাকছে ছেলেটা?

পরমুহূর্তে তার চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। পরিষ্কার রৌদ্রজ্জ্বল আকাশের বুক থেকে সাদা রঙের কিছু একটা নেমে আসে গাছটার ঠিক মাথার উপরে। ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে ওদের বাড়িটা। যেন আর একটু হলেই মাটি থেকে উপড়ে পড়বে সেটা।

বাজ পড়ল?

কিন্তু এমন মেঘহীন পরিষ্কার আকাশ থেকে কি বাজ পড়ে?

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



শশীর মাথায় এসব ভাবনা খেলার অবকাশ পেল না। পাতাল বিদীর্ণ করা একটা শব্দ ওর সমস্ত চেতনাকে কয়েক মিনিটের জন্য নিস্ক্রিয় করে দিল। জানলার সামনেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল ও।

মিনিট খানেক পরে চোখ খুলতে উঠে দাঁড়াল শশী। কানের ভিতরে এখনও একটানা স্থির রেডিও তরঙ্গের শব্দ হয়ে চলেছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল জঙ্গলের ওই বিশেষ জায়গাটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। জলছবির সবুজ ক্যানভাসের ওইটুকু অংশে ভুল করে কালো রঙ পড়ে গেছে যেন।

আর নড়ছে না গাছগুলো। গাছের মাথায় যে ছেলেটা উঠেছিল তাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। শশী বুঝতে পারে ওদের কাউকে আর কোনওদিন দেখতে পাবে না।

দরজায় খটখট করে শব্দ হতে সেদিকে ঘুরে তাকায় শশী। বাইরে থেকে ছিটকিনি খুলছে কেউ। দরজাটা খুলে একটা ছেলে ঢুকে এল ঘরের ভিতর। তার কোমরের শালটা এখন আবার আগের মতো কাঁধে ফেলা রয়েছে। শরীরের কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।

হাসিমুখে শশীর দিকে এগিয়ে এল সে। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম শশাঙ্কমোহন, মুরারিবাবুর নাতি। তাই তো?"

বিস্ময়ে শশীর মুখে কোনও কথা ফোটে না। সে চুপ করে তাকিয়ে থাকে ছেলেটার মুখের দিকে।

অশ্বিনী এগিয়ে এসে দুটো হাঁটু মাটিতে রেখে বসে পড়ে তার সামনে। তারপর আগের মতোই মিহি সুরে বলে, "তোমার জন্য একটা জিনিস আছে আমার কাছে।"

ধীরে ধীরে নিজের হাতের মুঠো খুলে ধরে অশ্বিনী। শশী তাকিয়ে দেখে সেই মুঠোর ভিতরে ধরা আছে তিনটে অক্ষত, জীবন্ত পাখির বাচ্চা। হাতের উপড়ে মাঝে মাঝে অপরিণত ঠোঁটে ঠোকর মারছে তারা।

— "ভয় নেই, হাত পাতো..."

শশী হাত পাততে তার উপর বাচ্চাগুলোকে রেখে দেয় অশ্বিনী। তারপর

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



শশীর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে বলে, "এদের যত্ন নিয়ো... আমি আবার আসব পরে..."

উঠে পড়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে যায় অশ্বিনী। শশাঙ্কমোহন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তারপর তার চোখ নেমে আসে পাখির বাচ্চাগুলোর দিকে।

## বিংশ অধ্যায়

সন্ধ্যার সময়। ভাসানবাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় নিতাইচরণ। বাড়িটা আগের থেকে কিছুটা বেশি ভেঙে গেছে। যেন বয়সের ভারে ক্লান্ত এক বৃদ্ধের হাড় বের করা পাঁজর।

প্রায় তিন মাস হল নিতাইচরণের আর এ বাড়িতে আসা হয়নি। নিজের বাড়িতে মেলা কাজ থাকে তার। নিবারণের খবরও নেওয়া হয়নি।

মত বদলে একবার বাড়ির ভিতরে ঢুকে তার সঙ্গে দেখা করে আসবে বলে ঠিক করে নিতাইচরণ। সত্যি বলতে ছেলেবেলায় নিবারণের সঙ্গে এক নাড়ীর টান ছিল তার। কবে জীবনের নিয়মে সে টান আলগা হয়ে গেছে বোঝাই যায়নি। আজ পুরনো বন্ধুত্বের কথা ভেবে নিতাইয়ের মন'টা উদাস হয়ে গেল।

বাগান পেরিয়ে দরজার কাছে আসতেই একটা গন্ধ পেল নিতাই। চেনা একটা গন্ধ, কেরোসিন। বাগানের কোথাও কি তবে কেরোসিনের বোতল উল্টেছে?

চারিদিকে তাকিয়ে দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে আসে নিতাই। একতলা থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না। আসেও না অবশ্য। তাও একবার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



অশ্বিনীর ঘরে উঁকি দেয়— কেউ নেই।

একতলার গোটাটা দেখে নিয়ে উপরে উঠে আসে। উঠতে উঠতে তার কপালের রেখায় কতগুলো ভাঁজ পড়ে। কেরোসিনের গন্ধটা এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। বরঞ্চ আর একটু বেশি জোরালো। দু জায়গাতেই কি বোতল উল্টেছে?

হৈমন্তীর ঘরে এসে টোকা দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় সে খেয়াল করে ঘরের দরজা খোলা। বিছানার ঠিক উপরে দরজার দিকে মুখ করেই বসে আছে নিবারণ। যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে একটু অবাক হয় নিতাই। এমন দরজা খুলে তো বসে থাকে না সে।

নিতাইকে দেখেই নিবারণের মুখে হাসি খেলে যায়, "মনে হচ্ছিল ব্যাটা, তুই আসবি..."

— "সমুন্দির পো, আর এইটা মনে হয় নাই যে গোটা বাসায় কেরোসিন ছড়ায়ে আছে?"

— "কেরোসিন! সে কী রে!"

— "হ, গন্ধ নাকে আসতেসে।" একটু রাগ দেখিয়েই কথাগুলো বলে নিতাই, "একখান দিশ্লাই জ্বালায়ে দিলেই আগুন জ্বলব বাড়িময়..."

— "দাঁড়া দেখছি।" নিবারণ দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে একবার ঘুরে আসে চারদিকটা। তারপর আবার হৈমন্তীর ঘরে ফিরে এসে নিতায়ের দিকে না তাকিয়েই বলে, "মনে হয় ছাদের ধারে কেরোসিন রেখেছিল কেউ। সেটাই খসে বাগানে গিয়ে পড়েছে?"

— "তাইলে গন্ধ বাড়ির ভিতরে আসে ক্যামনে?"

— "দেখছি, তুই আয় আমার সঙ্গে।"

দু'জনে মিলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। নিতাই ছাদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, "বাকি দুইজন কুথায়?"

— "বের হয়েছে। দিদির..." বাকি কথাটা বলতে গিয়ে একটু থামে নিবারণ, "মনে হয় আর বাঁচবে না।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



একটা বড় নিঃশ্বাস নেয় নিতাই, "তা আমরাই বা আর কয়দিন? চুলগুলা তো সব পাইক্কা গেল..."

— "হ্যাঁ, সে তো আর আজকের কথা নয়... পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, সেই বটগাছটার কথা মনে আছে তোর? যেটার ডালে টায়ার বেঁধে দোল খেতাম আমরা?"

— "আর বছর বন্যায় সেখানাও তো ভাইস্যা গেল। সুট থিকা দেকসি, কত ঝড়-জল, বন্যা পাড় কইরা দিসে... বয়স হইলে আর কিছু কওন যায় না রে ভায়া..."

সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে ছাদে উঠে আসে দু'জনে। দু'জনের নাকেই আসে গন্ধটা। এখানে জোরালো হাওয়া দিচ্ছে বলে গন্ধের তীব্রতা একটু বেশি। দু'জনে মিলে একবার ভালো করে দেখে ছাদটা। তেমন কিছুই পাওয়া যায় না কোথাও। ক্লান্ত হয়ে দুই বৃদ্ধ এসে দাঁড়ায় ছাদের ধারে। একজনের গোটা জীবন লেগে আছে তারাদের গায়ে, অন্যজনের সময় বয়ে গেছে পায়ের নিচের বৃদ্ধ বাড়িটার ইট পাথরে। আপাতত দু'জনের দৃষ্টিই দিগন্তরেখার দিকে স্থির। যে ত্রিলোকেশ্বর এই দুনিয়ার গোপন কলকব্জা নেড়ে তাকে পরিচালনা করে থাকেন তিনিই যেন দু'ভাগে ভাগ হয়ে দেখতে এসেছেন তার কর্মক্ষেত্র।

দু'জনের কারো মুখে কথা ফোটে না। এই গ্রাম, এই বাড়ি, এই জনমানবহীন পথ, ওই রহস্যঘেরা জঙ্গলের সার— সবই যেন ওদের ছেলেবেলার কোনও ফুরিয়ে যাওয়া বিকেলের উপর টেনে দেওয়া একটা পর্দা। সেটাকে ছিঁড়তে পারলেই সব আবার পঞ্চাশ বছর আগে ফিরে যাবে।

— "জাইগ গা..." বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে বলে নিতাই, "স, নিচে গিয়া..."

— "আমাকে ক্ষমা করো নিতাইকাকা..." নিবারণ থমথমে গলায় বলে।

— "নিতাইকাকা! তোর কি মাথাখানা পুরাই গেসে?"

— "আমার কাছে আর কোনও উপায় নেই।"

— "তুই কী বলতেসিস..."

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



একটা হাত দিয়ে নিতাইকে ঠেলে দেয় নিবারণ। অস্ফুট আর্তনাদে ছিটকে পড়ে বৃদ্ধ। তারপর নিজেও লাফ মারে নিবারণ...

* * * * * * * *

— "এই... তুমি ঘুমিয়ে পড়লে?" অশ্বিনীর গায়ে ঠেলা দেবার চেষ্টা করে হৈমন্তী। তার গলা দিয়ে এখন প্রায় শব্দ বের হয় না। দীর্ঘ, প্রলম্বিত নিঃশ্বাসের শব্দ মিটারখানেক দূর থেকেও শোনা যায়।

চটক ভাঙে অশ্বিনীর। ঘুরে তাকায় হৈমন্তীর দিকে, "ঘুমাইনি হৈম, বলো কী বলবে..."

— "তুমি এভাবে ঘুমিয়ে পড়লে আমার ভীষণ ভয় লাগে।"

— "কীসের ভয়?"

হৈমন্তী উত্তর দেয় না। ঢিবির ঢালের উপর অশ্বিনীর হাতে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে থাকে। রাত ক'টা বাজে খেয়াল নেই। চাঁদ দূরের কথা, আজ তারাগুলোও ঢেকে গেছে মেঘের আড়ালে। সেদিনের মতো আজ আর আলেয়া দেখা যাচ্ছে না। শুধু কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে সেখানে।

— "গনশাটার জন্য চিন্তা হচ্ছে খুব..." বিড়বিড় করে হৈমন্তী। বড় হয়ে কী যে করবে... "আচ্ছা তোমার কথা যদি বলে ফেলে কাউকে?"

— "বলবে না। ও আমার কথা জানে না সেভাবে। আর জানলেও সবটুকু বোঝেনি।"

— "আর নিবারণকাকা, নিতাইকাকা..."

হৈমন্তীর চুলে হাত বুলিয়ে দেয় অশ্বিনী, "চিন্তা করো না। ওরাও বলবে না অন্য কাউকে..."

অশ্বিনীর আঙুলের ফাঁকে নিজের সব ক'টা আঙুলকে গচ্ছিত রাখে হৈমন্তী, বলে, "মানে আমরা এখান থেকে চলে গেলে আর কেউ জানবে না আমাদের কথা? তোমার কথা?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



অশ্বিনী ঘাড় নাড়ে, "না। কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না। শুধু আপনি আর আমি জানব।"

— "আমি চলে গেলে তুমি আর থাকবে না এখানে, তাই না?" অশ্বিনীর চোখের দিকে চায় হৈমন্তী।

— "না, আমার আর কী আছে এখানে?"

— "কোথায় থাকবে?"

এবার সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে অশ্বিনী। একটা আঙুল আকাশের দিকে তুলে কালপুরুষের তীরের পাশটা দেখিয়ে বলে, "এতকাল যেখানে ছিলাম, অপেক্ষা করব আপনার জন্য..."

কেশে ওঠে হৈমন্তী। রক্তে ঠোঁট ভিজে যায় তার। উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বলে, "বাড়ি নিয়ে যাবে?"

— "চলুন।" দু'হাতে তাকে কোলে তুলে নেয় অশ্বিনী। তারপর হাঁটতে থাকে জলাজমিটার উপর দিয়ে। ভেজা ঘাসে ওর পা ভিজে যায়। হৈমন্তীর চোখ দুটো বুজে যায়। আধো ঘুমে শুধু এটুকু বুঝতে পারে অশ্বিনীর বুকের কাছে ওর মুখটা আছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ কানে আসছে। অশ্বিনীর বেঁচে থাকতে এ শব্দের দরকার পড়ে না। তাও কী ভীষণ শান্তি দেয় ওকে শব্দটা।

— "আমি ভীষণ ভালোবাসি তোমাকে..." হাত দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে বলে হৈমন্তী। কথাগুলো রাতের হাওয়ায় ভেসে যায় কিছুদূর।

— "তাই! কী করে বুঝলেন?"

— "তোমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা করছে খুব, আর পাঁচটা মানুষের মতো। ঝগড়াঝাটি করব, মান-অভিমান হবে, মারপিট হবে...

— "কী যে বলেন, আমি ঝগড়া করতে পারি না।"

— "বেশ তো, আমি শিখিয়ে দিতাম। তারপর করতাম দু'জন মিলে।"

— "শিখিয়ে দিন। চেষ্টা করি।"

হৈমন্তী কী ভেবে একটু ঘাবড়ে যায়, বলে, "এই ভালো ঝগড়া করার টেকনিকটা মেয়েদের সিক্রেট, জানো? জোরে জোরে বললে ফাঁস হয়ে যাবে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



কানটা এদিকে আনো।"

হৈমন্তীর শরীরটা আর একটু উপরে তুলে মাথা হেলিয়ে কান'টা নিচে করে অশ্বিনী। হৈমন্তী কানের কাছে আনে ঠোঁট দুটো। আলতো করে ছুঁইয়ে দেয় গালে। ফিসফিসিয়ে বলে, "এভাবে ঝগড়া করব সারাজীবন।"

অশ্বিনীর মুখ থমথমে হয়ে গেছিল। গালের লালচে রঙ কমে আসে কয়েক সেকেন্ড পরে। আগের মতোই হাঁটতে-হাঁটতে বলে, "এটা ঝগড়া হলে আপনার মান-অভিমান আর মারপিট কেমন হবে কে জানে..."

— "আনরোম্যান্টিক শালা।" একটা হাত দিয়ে অশ্বিনীর বুকে একটা ধাক্কা দেয় হৈমন্তী।

— "এটা অভিমান?"

রেগে যায় হৈমন্তী, "অস্মিতা ঠিকই বলেছিল এ গ্রামে দু'ধরনের মানুষ আছে, পার্ভাট আর চুতিয়া।"

— "ওর মধ্যে আমি কোনটা?"

— "তুমি খুব ভালো..." চোখ বুকে অশ্বিনীর হাতে মাথা রাখে হৈমন্তী, "আর আমি ভীষণ ভালোবাসি তোমাকে।"

ভাসানবাড়ির সামনে এসে একবার দরজার কাছে তাকায় অশ্বিনী। দুটো মানুষের দেহ পড়ে আছে। খানিকটা রক্তও ছড়িয়ে আছে তাদের চারপাশে। সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে হৈমন্তীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে আসে সে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।

হৈমন্তীর ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় বুকের কাছ থেকে একটা শব্দ শুনতে পায়, "উঁহু, ঘরে না... ছাদে যাব।"

— "এই তো বাইরে থেকে এলেন, এক্ষুনি আবার ছাদে?"

দাঁতের ফাঁকে হাসে হৈমন্তী, "নিজের পায়ে হাঁটতে না হলে ওরকম ইচ্ছা হয় মানুষের। চলো, চলো।"

আবার সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে আসে অশ্বিনী। মেঝেতে একটা মাদুর পাতা ছিল আগে থেকে। তার উপরে শুইয়ে দেয় হৈমন্তীকে। পাশে বসে পড়ে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



একটা হাত আঁকড়ে ধরে দু'হাতে।

একটু আগে মেঘে ঢেকে ছিল আকাশ, এখন ধীরে ধীরে তারা ফুটতে শুরু করেছে তাতে। এই তিনমাসে কত তারার নাম জেনেছে হৈমন্তী, একমনে চুপ করে বসে শুনেছে অশ্বিনীর কথা। ওদের ফেলে আসা জীবনের কথা। কয়েক লক্ষকোটি বছরের জমানো কথা যেন এই তিনমাসের জন্য জমিয়ে রেখেছিল অশ্বিনী। হৈমন্তী চুপ করে শুনে গেছে কেবল।

গল্প শুনতে শুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে যায় হৈমন্তী। সব গল্প শোনা হয় না। মাঝরাতে ঠান্ডায় ঘুম ভেঙে গেলে তাকিয়ে দেখে অশ্বিনী ওর হাতটা ধরে বসে আছে পাশে। আপন মনে কী যেন ভেবে চলেছে ছেলেটা।

আজ অন্যদিনের থেকে একটু বেশি চুপচাপ অশ্বিনী। হাওয়ার দমকে পাঞ্জাবির বুকের বোতামটা খুলে গেছে। শালটা খসে পড়েছে গা থেকে। খেয়াল করছে না ছেলেটা। দূরের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু দেখতে দেখতে হারিয়ে গেছে চোখ।

— "আমার না... গনশাকে দেখতে ইচ্ছা করছে খুব... অনেকদিন তো আসেনি এখানে, ডেকে আনবে একবার?" হৈমন্তী জড়ান কণ্ঠে বলে।

অশ্বিনী হাসে, "ও ব্যাটা এখন পড়ছে। সময় হবে না।"

— "উঁহু প্লিজ, একবার। দেখতে ইচ্ছা করছে।"

— "বললাম যে, সময় নেই ওর।" অশ্বিনী ঘোলাটে স্বরে বলে।

অশ্বিনীর দু'হাতে ধরা হাতটা নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে আনে হৈমন্তী, তারপর বলে, "ওর না, আমার সময় নেই। তাই না?"

অশ্বিনী কিছু উত্তর দেয় না। স্থির হয়ে বসে থাকে।

— "আমার একটা কাজ করে দেবে?"

— "বলুন।"

— "তোমাকে যে পাঞ্জাবিটা দিয়েছিলাম ওটা পরে আসবে?"

— "এক্ষুনি আসছি।"

— "আর আসার সময় আমার ল্যাপটপটা নিয়ে এসো।"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



অশ্বিনী দ্রুত নিচে গিয়ে বদলে নেয় পাঞ্জাবিটা। ল্যাপটপটা হাতে নিয়ে এনে রাখে তার সামনে। হৈমন্তীর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাও ভালো করে তাকায় অশ্বিনীর দিকে। মুখে একটা ক্লান্ত হাসি খেলে যায়।

ল্যাপটপে একটা ফাইল খুলে সেটা অশ্বিনীর সামনে তুলে ধরে হৈমন্তী। বিড়বিড় করে বলে, "এইটা পড়ে শোনাবে একটু?" অশ্বিনী দেখে একটা কবিতা লেখা আছে সেখানে। ল্যাপটপটা নামিয়ে রাখে সে,

— "আমি জানি এটা। দেখতে হবে না।"

*তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি,*
*শত রূপে শত বার...*
*জনমে জনমে, যুগে যুগে অনির্বার।*

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে কাঁপাকাঁপা হাতে সেটা ধরায় হৈমন্তী। তারপর কনুইতে ভর দিয়ে শরীর কিছুটা উপরে তুলে মাথা রাখে অশ্বিনীর বুকে। দূরে, কালপুরুষের তীর ঘেঁসে কিছুটা দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। অশ্বিনীর দুটো হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

*যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,*
*প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,*
*অতি পুরাতন বিরহমিলনকথা,*
*অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে*
*দেখা দেয় অবশেষে*
*কালের তিমিরজনী ভেদিয়া*
*তোমারি মুরতি এসে,*
*চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।*

— "আঃ..." সিগারেটে লম্বা করে একটা টান দেয় হৈমন্তী। সেটা খসে পড়ে তার হাত থেকে।

কবিতার শেষ ক'টা লাইন তার মুখ থেকেই বেরিয়ে আসে,

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



*আমরা দু'জনে করিয়াছি খেলা*
*কোটি প্রেমিকের মাঝে*
*বিরহবিধুর নয়নসলিলে,*
*মিলনমধুর লাজে—*
*পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।*
*আজি সেই চিরদিবসের প্রেম*
*অবসান লভিয়াছে*
*রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।*

— "আবার দেখা হবে, বলো?"

খুব মৃদু একটা দুলুনি উঠে আসছে হৈমন্তীর পা বেয়ে। অশ্বিনীর গলা শুনতে পায় সে, "হবে তো। মহাবিশ্বের অন্য কোনও প্রান্তে..."

— "আমি যদি চিনতে না পারি তোমাকে?"

— "এবারও তো চিনতে পারেননি আমাকে।"

মৃদু হাসে হৈমন্তী, "পরের বার আর একটু সুস্থ হব, বুঝলে। আর একটু বেশিদিন থাকতে পারব তোমার সঙ্গে।" ঘনঘন নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে কথাগুলো, "আর তুমি একটু বুদ্ধিমান হয়ো বাপু..."

— "বুদ্ধিমান! আমি বোকা নাকি?"

— "নও? আমি মরার আগে একটা চুমু পর্যন্ত খেতে পারলে না।"

— "আমি! মানে... কোনও মেয়েকে আগে..."

— "শাট আপ..." ধমক দিয়ে চুপ করে হৈমন্তী। বড় নিঃশ্বাস নেয় একবার। কাশির দমক চুপ করিয়ে দেয় তাকে।

— "আচ্ছা হৈম..." অশ্বিনীর মুখে একটা হাসি খেলে যায়। হৈমন্তীর মাথায় হালকা ঝাঁকা দেয় সে, "শুনছো?"

হৈমন্তীর বাঁ হাতটা গড়িয়ে পড়েছে অশ্বিনীর বুক বেয়ে, চোখ দুটো নিপুণ হাতে বন্ধ করে গেছে কেউ। মাথাটা ঢলে পড়েছে অশ্বিনীর হাতের উপরে।

— "চলে গেছো হৈম?"

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



আর উত্তর আসে না কোনও। অশ্বিনী সেভাবেই কিছুক্ষণ বসে থাকে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে হৈমন্তীর প্রাণহীন মুখের উপরে। তার চোখে এক ফোঁটাও জলের রেখা দেখা যায় না। মাদুরে হৈমন্তীর ঠিক পাশটায় শুয়ে পড়ে সে। একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঠান্ডা শরীরটাকে। তারপর চোখ বুজে ফেলে। ঘুমিয়ে পড়ে ছেলেটা।

হু হু করে হাওয়া বইতে থাকে ওদের ঘিরে। অচেনা ছন্দে মাথা দোলাতে থাকে দূরের গাছগুলো। যেন খেলনা নিয়ে খেলতে-খেলতে ক্লান্ত দুই শিশুকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে তারা। অখণ্ড নীরবতার মাঝে মৃতদেহের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ভাসানবাড়ি। তার পায়ের তলায় ঘুমিয়ে পড়া পুকুরে আবার ঢেউ খেলছে। শেষবারের মতো...

কয়েক ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙে অশ্বিনীর। মাদুরের উপরে উঠে বসে সে। তারপর দু'হাতে তুলে নেয় হৈমন্তীর দেহটা। সেটাকে বয়ে এনে রাখে একতলার ঘরে আয়নাটার সামনে। বাইরের বাগান থেকে দুটো দেহ তুলে এনে হৈমন্তীর ঘরে শুইয়ে দেয়।

দুই বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে বলে, "আমরা চললাম। আপনাদের কথা মনে থাকবে সবসময়।"

ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে আসে অশ্বিনী। রান্নাঘর থেকে সিঁড়ির কাছে দুটো সিলিন্ডার টেনে আনে। পকেট থেকে বের করে আনে হৈমন্তীর লাইটারটা। সেটা জ্বেলে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে লকলকে শিখাটার দিকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের এককোণে।

মুহূর্তে জ্বলে ওঠে ভাসানবাড়ি। দাউদাউ করে সশব্দ আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে তার কোণায় কোণায়। এই বাড়ি, যেখানে তার দীর্ঘ দুশো বছর ধরে যাওয়া আসা। যে উদ্দেশ্যে বারবার ফিরে আসত, আজ তা ফুরিয়ে গেছে। আজ তার শেষ প্রতিমা বুকে নিয়ে বাড়িটাও মিশে যাবে বিসর্জনে।

আয়নার সামনে থেকে হৈমন্তীর দেহটা তুলতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায় অশ্বিনী। জ্বলন্ত আয়নায় তার নিজের ছায়া পড়েছে। আগুন এসে বারবার

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



ঢেকে ফেলছে অশ্বিনীর দেহটা। এ আয়নার দিকে দীর্ঘদিন চেয়ে থেকেছে। তাও নিজেকে এই প্রথম দেখল, হৈমন্তীর দেওয়া লাল পাঞ্জাবিটায়...

হৈমন্তীর দেহটা কোলে নিয়ে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অশ্বিনী। এতক্ষণে ছাদ অবধি পৌঁছেছে আগুন। দুশো বছরের পুরনো কড়িকাঠগুলো ভেঙে পড়ছে একটা-একটা করে। আজ সত্যি যেন এক আলোকিত ভাসানযাত্রায় মেতেছে বৃদ্ধবাড়িটা। এতগুলো মানুষের স্মৃতি ডুবে যাচ্ছে লকলকে শিখায়।

সেদিকে ফিরেই দাঁড়িয়ে ছিল অশ্বিনী। কোলে রাখা হৈমন্তীর মুখের দিকে চেয়ে বলে, "দেখো, পুড়ে গেল সব।"

ধীরে ধীরে সামনের পথ বেয়ে হাঁটতে থাকে অশ্বিনী। তার মুখের উপর আগুনের হলদে রঙ প্রতিফলিত হচ্ছে বারবার।

কিছুক্ষণ হেঁটে আবার সেই ঢিবিটার কাছে পৌঁছে যায় অশ্বিনী। জলের ধারে পড়ে থাকা লাঠিটা তুলে নেয়। ছুঁড়ে ফেলে দেয় জলের উপরে। আর এই পুকুরে ফিরে আসবে না ও কোনওদিন।

উলটোদিকে মুখ করে অশ্বিনী হেঁটে আসে মাঠের একেবারে মাঝামাঝি। আবার জমাট বেঁধে জোনাকির সার জ্বলতে শুরু করেছে আঁধারে ঢাকা ঝোপঝাড়ের উপরে। মৃদু হাওয়ার দোলায় মাথা নাড়ছে গাছগুলো। কীসের যেন একটা সুর ভেসে আসছে থেকে থেকে।

নরম ঘাসের উপরে হৈমন্তীকে শুইয়ে দেয় অশ্বিনী। তারপর দু'পাশের জমির উপর থেকে কিছু শুকনো কাঠ তুলে আনে। হৈমন্তীর দেহের পাশে সেগুলো জড় করতে থাকে।

সাজানো শেষ হতে হৈমন্তীর পাশে বসে একটু জিরিয়ে নেয় সে। কপালে আর একবার হাত রাখে। এখন আগের থেকে আরও ঠান্ডা হয়ে গেছে দেহ।

নিজের দুটো হাত জড় করে মুখ ঢাকে অশ্বিনী। কয়েক সেকেন্ড সেইভাবে থেকে একটু একটু করে উঠে দাঁড়ায়। হৈমন্তীর দেহটা কোলে তুলে নিয়ে শুইয়ে দেয় সাজানো কাঠের উপরে।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



— "ভয় পেয়ো না, হৈম। আমি অপেক্ষা করব... আবার দেখা হবে... কেমন?"

একটু পিছিয়ে এসে একটা লাঠির মাথায় আগুন ধরায় অশ্বিনী। তারপর সেটা এগিয়ে ধরে শুকনো কাঠের সারের ভিতরে। মুহূর্তে জ্বলে ওঠে কাঠ। আগুন ছড়িয়ে পড়ে হৈমন্তীর জামাকাপড়ে। শান্ত হয়ে শুয়ে আছে সে। আগুনের শিখায় তার মুখটা বিসর্জনের পর জলে ডুবতে থাকা প্রতিমার মতো দেখায়।

সেই ছোটবেলার হৈমন্তী, মায়ের বকুনি খাওয়া হৈমন্তী, স্কুলফেরত কাঁচা আমড়া খাওয়া হৈমন্তী, নাচের ক্লাসে সেকেন্ড হওয়া হৈমন্তী, মাঝরাতে কেঁদে বালিশ ভেজানো হৈমন্তী, সবাই যেন এক সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে অতল গঙ্গার গভীরে...

সেদিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অশ্বিনী।

Join Telegram: https://t.me/amargranthagar



# শেষ অধ্যায়

সৌরজগতের কোনও এক প্রান্তে চিরস্থির শূন্যের মধ্যে মিহি আলোড়ন দেখা দেয়। অন্ধকারের বুকে একটা কিছু বায়বীয় পদার্থ নড়ে ওঠে।

এখানে বায়ুমণ্ডল নেই। শব্দের অস্তিত্ব নেই। কেবল অনন্ত নীরবতা। বহু দূরে একদানা কাচভাঙা ধুলোর মতো নীলচে পৃথিবী চোখে পড়ে। তার গা পেরিয়ে ছড়িয়ে আছে আর কিছু বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র। এরা স্থির, এরা শাশ্বত, এখানে সচরাচর কিছু বদলায় না।

অনন্ত মহাশূন্যের মধ্যে একটা ছোট্ট অংশে মিহি আলোড়ন বেড়ে চলেছে। বড়ো হচ্ছে সেটা। ধোঁয়ার মতো কিছু একটা ছড়িয়ে পড়ছে। কোনও আকৃতি নিচ্ছে কি?

ছড়িয়ে পড়তে পড়তে স্থির হয়ে যায় ধোঁয়াটা। এবার যেন একটু ঘন হতে শুরু করেছে। জমাট বাঁধছে। একটু একটু করে কোনও অবয়ব ফুটে উঠছে। নিকশ কালো মেঘের মতো গম্ভীর, অথচ বোঝা যায় তাতে স্পন্দন আছে, প্রাণ আছে।

ক্রমশ সেই অবয়বে একটা মুখমণ্ডল ফুটে উঠতে থাকে। বুকের দুপাশ থেকে দুটো হাত বের হয়ে আসে। একটা হাত সামনে এগিয়ে ধরে সে। তারপর মুঠো খুলে দেয়।

ছোট বাক্সজাতীয় কিছু ধরা আছে হাতের মুঠোয়। হাত থেকে বেরিয়ে এসেই খুলে যায় বাক্সের ডালাটা। তার ভিতর থেকে হাওয়ায় ভেসে বেরিয়ে আসে কিছুটা পোড়া ধুলো আর ছাই।

এখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই, তাই হাওয়ার ভেসে উপরের দিকে এগিয়ে যায় ছাইটা। একে অপরের থেকে দূরে, আরও দূরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সেই অন্ধকার মেঘের মতো প্রাণীটা দুটো স্থির চোখে চেয়ে থাকে সেই

উড়ন্ত ছাইটার দিকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহাশূন্যে মিশে না যায় ততক্ষণ চেয়ে থাকে একটানা।

ছাইটা মিলিয়ে আসতে মেঘটাও ঝাপসা হয়ে আসে। একটু একটু করে সেও যেন মিশে যায় মহাশূন্যের বুকে। মহাবিশ্বের এইটুকু অংশ আবার আগের মতো স্পন্দনহীন হয়ে যায়।

কয়েক লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ পার করে এই অন্তহীন, চিরস্থির, চিররহস্যাবৃত মহাবিশ্ব — গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু আর ধূলিকণা বুকে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কোনও বিশেষ সময়ের... ভাসানবাড়ির মতো...